বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 582. February, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮২ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৮। | ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজার জন্মদিন—আগামী ৩রা জুন ভারতবর্ষে সম্রাটের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে।

রাণীর দান—ভারত সম্রাজ্ঞী যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি লেডী ডফারিন ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালে দশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গের সীমা নির্দ্ধারণ—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, লর্ড ক্রু বলিয়াছেন, আপাততঃ বঙ্গ ও বিহারের সীমা নির্দ্ধারণ করা হইবে না। প্রমানাদি সংগৃহীত হইলে কোন্ জেলা কোন্ প্রদেশে থাকিবে, তাহার নির্দ্ধারণ করা হইবে।

বোম্বাইয়ের তুলা--এবারও বোম্বাইয়ে তুলা ভাল জন্মে নাই। গত বৎসরের তিন চতুর্থাংশ ভূমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসরের অর্দ্ধেক তুলাও হয় নাই।

সিবিল সার্জ্জন পরীক্ষা—এবার ভারতীয় সিবিল সার্জ্জন পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ বার জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন মাত্র বাঙ্গালী ও দুইজন পার্শী। বাঙ্গালী ছাত্রের নাম জ্যোতিষ চন্দ্র দে। ভারতীয় ছাত্রগণ পরীক্ষায় ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

নারীর অধিকার—এলাহাবাদের ব্যারিষ্টার পণ্ডিত মোহনলাল নেহারুর পত্নী মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদপ্রার্থিনী হইয়াছেন। নারীগণ দেশের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিলে দেশের দুর্গতি দূর হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সিনেট সভাকে লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডি, সি কিসটকে পি এইচ, ডি ও ডাক্তার জে, সি বসু ও মিঃ ক্রুলকে ডি, এস সি উপাধি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নূতন দীল্লি—শুনা যাইতেছে, নূতন দীল্লি নির্ম্মাণ করিবার জন্য লিবারপুলের

সিটি ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রাডির আসিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কার্য্যালয় ও আবাসগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের সিবিলিয়ান মিঃ এইচ, কে, ব্রিস্কো ও যুক্ত প্রদেশের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ, এম্, রুস নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেরোসিন তৈল—ইদানীং এদেশে কেরোসিন তৈল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে রেড়ি প্রভৃতি যে সমুদায় তৈল দীপাদি প্রজ্বলিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত, কেরোসিন তৈল এক্ষণে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাতে আলোকের উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু বহু অনিষ্টেরও উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার দুর্গন্ধ ও তীব্র উত্তাপ গৃহস্থকে সহ্য করিতে হয়। সময় সময়ে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে রাত্রিতে গৃহের মধ্যে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহস্থ নিদ্রিত হইয়াছেন এবং প্রাতঃকালে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার বিষাক্ত গ্যাসে গৃহস্থের ও পরিবারবর্গের প্রাণবায়ু বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে মোট ৭,৯২,৩৫,০০০ (সাত কোটী বিরানব্বই লক্ষ পঁইত্রিশ সহস্র) গ্যালন কেরোসিন তৈল আমদানী হইয়াছে।

লর্ড কারমাইকেল—মান্দ্রাজবাসিগণ লর্ড কারমাইকেলকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তিনি স্বকীয় উদারতায় মান্দ্রাজবাসীদিগের চিত্ত অধিকার করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, লর্ড কারমাইকেলকে যাহাতে মান্দ্রাজে রাখা হয়, তজ্জন্য মান্দ্রাজবাসিগণ সম্রাট ও ভারত সচিবের নিকট একখানি আবেদনপত্র পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

দ্বিতীয় মানসিক কাজ। পুস্তক রচনায় শিক্ষকতা অপেক্ষা অধিক বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক। আবার বর্ত্তমান অবস্থায় উহাতে বিশেষ উপার্জ্জনেরও আশা নাই। তথাপি শিক্ষিতা নারীমাদেরই ঐ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। পুরুষেরা কিসে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কিরূপ গভীর চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা এতাধিক জ্ঞানী হইয়াছেন? কি প্রকার পুস্তক লিখিয়া তাঁহারা আমাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন? এই সংসার কিরূপে ও কোন্ নিয়মে চলিতেছে? মানবপ্রকৃতি এ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কেন? পশু পক্ষী ও অন্যান্য বাহ্য জগতের সঙ্গে মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি গুরুতর বিষয়গুলি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তাহার চিন্তা ও আলোচনা করিলে মন প্রশস্ত হইবে এবং মন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইলেই উহাতে নূতন নূতন ভাব প্রবেশের সম্ভাবনা। সেই সকল

নূতন ভাব ধরিয়া কাগজে লিপিবদ্ধ করিলেই প্রবন্ধ বা পুস্তক হয়। সুতরাং ভাবসঞ্চারের পূর্ব্বে শুধু কাগজ কলম লইয়া আমরা যদি পুস্তক লিখিতে বসি, তাহা হইলে আমাদের লেখনী হইতে নিজের মৌলিক ভাব বাহির না হইয়া অপরের গ্রন্থ হইতে অপহৃত ভাব, কিংবা অতি অসংলগ্ন ভাবহীন লেখা বাহির হইয়া পড়িবে। আর ঐরূপ অনাবশ্যক পুস্তকের জন্য আমাদিগকে নিজের ও পরের কাছে সর্ব্বত্রই উপহাস সহিতে হইবে। সে জন্য ভাল পুস্তক লিখিয়া সফল হইবার ইচ্ছা করিলে বয়স একটু প্রবীণ ও বুদ্ধি সুপক্ক হইলেই ভাল হয়। তথাপি যৌবনকাল হইতে উহার চেষ্টা করাতে কোন ক্ষতি নাই। উত্তম সারগর্ভ গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতকার্য্য হইবার জন্য যথাসাধ্য ভাল ও গভীর জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ পাঠের ন্যায় সদুপকরণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের সম্মুখস্থ বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে যিনি অক্ষম, তাঁহার পক্ষে পুস্তক লেখা কার্য্যে হাত না দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু যে নারীর চিন্তা ও কল্পনাশক্তি প্রবল, সদ্‌গ্রন্থ পাঠে তাঁহার মনে নানা নব নব ভাবের আবির্ভাব হইবে আর সেইরূপ বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশীলা রমণীরই সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণমনোরথ হইবার সম্ভাবনা। অন্য দিকে পাঠ্য পুস্তক লিখিতে বা অনুবাদ করিতে হইলে সারগর্ভ গ্রন্থ রচনার ন্যায় তত গভীর চিন্তা ও কল্পনার আবশ্যক হয় না। স্বাভাবিক বিচারশক্তি, মনোভাব প্রকাশের শক্তি, ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা থাকিলেই, উহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সেই জন্য, বালিকা ও শিশুদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লেখার কাজ যে আজকাল দুইচার জন সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারেন, এ কথা বড় অসঙ্গত বোধ হয় না। শিশুদিগের সঙ্গে নারী জাতির অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বলিয়া পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগের অভাবাদি বুঝিতে অধিকতর সক্ষম কাজে কাজেই, উহাতে প্রয়াস পাইলে ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্রীদিগের ন্যায় হিন্দু মহিলারাও যে সফল হইবেন, এইরূপ আশা হয়। অবশ্য, তাঁহারা কিরূপ পুস্তক লিখিবেন, বা কি প্রকারে লিখিতে আরম্ভ করিবেন, তাহা বলা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু তাঁহাদের উপার্জ্জন গ্রন্থের ভাল মন্দ গুণের উপর নির্ভর করিবে। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকেরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি চালাইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে উহাতে সফল হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। শিক্ষয়িত্রী ও গ্রন্থকর্ত্রীর কার্য্য ব্যতীত ডাক্তার ও ধাত্রীর প্রভৃতি আরো দুই চারটী মানসিক কার্য্যে প্রবেশের অধিকার এখন মহিলাদিগের আয়ত্তাধীন। আমাদের দেশে অন্তঃপুর-প্রথার ব্যবস্থা বশতঃ আর আমার মতে, (জেনানা রীতি না থাকিলেও) নারীজাতির পীড়ার জন্য সকল দেশেই মহিলা

ডাক্তারের একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ভদ্রবংশীয় হিন্দু মহিলাদিগের নিমিত্ত স্ত্রী-ডাক্তারের যে কত প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। এখন আমাদের দেশে অনেক ইংরেজ ও আমেরিকান স্ত্রী ডাক্তার আসিয়া নারী-দিগের চিকিৎসা দ্বারা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। তবে এরূপ গৌরবজনক ও উপ-কারী কাজে হিন্দু মহিলারাই বা উদাসীন থাকিবেন কেন? সুখের বিষয়, কয়েক জন ভারতনারী এক্ষণে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু দশ বার কোটী স্ত্রীলোকের মধ্যে অল্প কয়েক জন স্ত্রী-ডাক্তারে কি করিবেন? স্ত্রী-ডাক্তার দ্বারা আমাদের দেশীয় মহিলাদিগের প্রকৃতরূপে চিকিৎসা করাইতে হইলে আরও কত স্ত্রী-ডাক্তারের আবশ্যক। সুতরাং যে নারীর শিখিবার অবসর ও সঙ্গতি আছে, তিনি যেন বৃথা লজ্জার বশবর্ত্তী হইয়া উহাতে বিমুখ না থাকেন, এই আমার প্রার্থনা। আর তাঁহারা যদি ভদ্রভাবে ও সদাচারে থাকিয়া এই মহৎ কার্য্যে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে হিন্দু অভিভাবকগণ আর কখনও উহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ আজ কাল অনেক স্থানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য হাঁসপাতাল হইয়াছে, অতএব পুরুষদিগের সম্মুখে বা সাধারণ স্থানে বাহির না হইয়া ও স্বচ্ছন্দে স্ত্রীলোকের মাঝে থাকিয়া স্ত্রী ও শিশুদিগের উপযোগী চিকিৎসায় পারদর্শিনী হইতে পারা যায়। এক্ষণে ধাত্রীবিদ্যাও ভদ্র নারীদিগের পক্ষে লাভজনক হইয়াছে। আর উহার জন্য শিক্ষা ও আপেক্ষিক ব্যয় সহজ ও অল্প বলিয়া উহা অনেকেরই সাধ্যায়ত্ত। ভাল ধাত্রীর অভাবে ভারতবর্ষে যে কত জননী ও শিশু অকালে কাল-কবলে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

গৃহ-শিক্ষা।

বাল্যাবস্থায় গৃহই বালকবালিকাদিগের একমাত্র শিক্ষাস্থল। শৈশবে স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখর থাকে, ঐ সময়ে পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে মানুষের যাহা শিক্ষা হয়, সমস্ত জীবনেও তাহা কেহ বিস্মৃত হইতে পারে না।

গর্ভ সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি জনক জননীর কঠোর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব চিরদিনই আছে। অপরিণতবয়স্ক সন্তানের প্রতি যেরূপ পিতামাতার সমধিক স্নেহ ও বাৎসল্য থাকে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের প্রতিও তদ্রূপ। তবে বয়োভেদে ইহার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইয়া থাকে মাত্র। সে তারতম্য এই যে, বাল্যে সন্তানগণ পিতা মাতার আয়ত্তাধীন থাকে এবং পরিণত বয়সে তাঁহাদিগের আয়ত্তের বাহিরে পদার্পণ করে। এই জন্য ঐ সময়ের

শিক্ষাও তেমন ফলপ্রদ হয় না। এই কারণেই বোধ হয় জ্ঞানী মহাত্মাগণ বাল্য কালকেই শিক্ষার উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু সেই শিক্ষা কাহাকে বলে? অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, কেবল মাত্র বিদ্যাশিক্ষাকেই আমরা শিক্ষা বলিতেছি, তাহা নহে; কেবল মাত্র বিদ্যা শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায় না। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির মধ্যে ঐরূপ শিক্ষা কোন ক্রমেই মঙ্গলদায়ক নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কোন শ্রেণীর মধ্যেই কোন কালে এবং কোন অবস্থাতেই শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যায় মনুষ্যসমাজের ও জগতের কোন উপকারই সাধিত হয় নাই। যে সকল মহাপুরুষ এবং অসাধারণ-গুণসম্পন্না পুণ্যবতী নারী স্ব স্ব মহীয়সী শক্তি দ্বারা এ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জনহিত ও বিশ্বহিত কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন নাই?

শৈশবে ধর্ম্মশিক্ষা ও সদৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগের চরিত্র গঠন করা জনক জননীর প্রধান কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে চরিত্র গঠিত না হইলে আর কোন কালে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতিহাস আবহমান কাল ধরিয়া উজ্জ্বলরূপে তাহার সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে। এক দিকে বিদ্যার্ণব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাঁহার যথেচ্ছ-চারিতা ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের বিষয় চিন্তা কর; পক্ষান্তরে দেখ, বর্ণজ্ঞানহীন সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহচ্চরিত্র ও উজ্জ্বল ধর্ম্মপ্রভায় আজি জগৎ উদ্ভাসিত এবং ভারত গৌরবান্বিত। সুতরাং ধর্ম্ম-শিক্ষাকে কোন ক্রমেই অবহেলা করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। শৈশবে মানবহৃদয়ে যে সকল বীজের প্রথম অঙ্কুর হয়, পরিণতাবস্থায় তাহার বিকাশ হয় মাত্র। বস্তুতঃ বাল্যে যাহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব, কর্ত্তব্যজ্ঞান, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, ঔদার্য্য, নিঃস্বার্থ-পরতা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহের উদ্দীপনা না হয়, উত্তরকালে তাহাদিগের ঐ সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া জনসমাজে প্রাধান্য লাভ করা কদাচ সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই সকল শিক্ষা ও সদ্ভাবসমূহের ভিত্তি-স্থল যে একমাত্র শিশুগণের গৃহ ও জনক জননী, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। একটী সদৃষ্টান্ত দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয়, চিরজীবন ধরিয়া অজস্র মৌখিক উপদেশে তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই। গৃহে আমরা পুত্রকন্যাগণকে প্রতিনিয়ত অসৎ দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি অথচ মুখে তাহা-দিগকে সৎ হইতে উপদেশ দিতেছি, ইহা অপেক্ষা অবিমৃশ্যকারিতা ও হাস্যাস্পদ বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ, আমড়া বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমরা যেমন তাহাতে সুমিষ্ট আম্রফলের আশা করিতে পারি না, তদ্রূপ কোপনস্বভাব দাম্ভিক, চরিত্রহীন পিতা মাতার সন্তান-গণকেও আমরা মনুষ্যোচিত উৎকৃষ্ট

গুণসমূহে ভূষিত দেখিতে কদাচ আশা করিতে পারি না। যে সেরূপ আশা করে, তাহাকে উন্মাদরোগগ্রস্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অনেক পিতা মাতা এরূপ আছেন যে, বালকবালিকাগণ ছুটা-ছুটি করিয়া খেলা ধূলা করিবে, স্ফূর্ত্তির সহিত স্বাধীনভাবে বাক্যালাপ ও গমনা-গমন করিবে, কিম্বা দয়াপরবশ হইয়া কাহারও কোন সাহায্যে অগ্রসর হইবে, ইহা তাঁহাদিগের নিকট একবারেই অসহনীয়। কেহ কেহ ঐ সকলকে নিতান্তই দূষ্য মনে করেন এবং ক্রোধ-পরবশ হইয়া প্রহার ও নানারূপ নির্য্যাতন দ্বারা শিশুগণকে সর্ব্বদা উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিতে প্রয়াস পান। ইহা যে তাঁহাদিগের কতদূর ভ্রম ও ইহাতে যে তাঁহারা শিশুদিগের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না। শিশুগণ বিবেকের অধীন হইয়া যে সকল কার্য্য করিতে যায়, তাহাতে কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার ন্যায় অর্ব্বাচীনের কার্য্য আর নাই। সহসা তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করিতে নাই এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা সর্ব্বদা তাহাদের শাসন করিতে নাই। এরূপ করিলে তাহাদের উদ্যমশীল কোমল অন্তঃকরণে জড়তা জন্মে এবং ক্রমশঃ তাহারা স্ফূর্ত্তিহীন উদ্যমশূন্য নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা হইতেই ক্রমশঃ তাহারা দোষগোপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং মিথ্যা কথা কহিতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ শিশুগণকে ক্রোধান্ধ হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করাপেক্ষা যাহাতে তাহাদিগের দোষ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তদনুরূপ মিষ্টবাক্যে তাহা প্রদর্শন করিলেই অধিক ফল দর্শিয়া থাকে। ক্রোধশীল উগ্রস্বভাব পিতা মাতার সন্তান কদাচ সহিষ্ণু হইতে সক্ষম হয় না।

যে গৃহ সুদৃঢ় ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে পরিবারে প্রেম, প্রীতি, দয়া, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে, সে পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কি দাসদাসী কি প্রতিবেশিমণ্ডলী, এমন কি একদিনের নিমিত্তও সে গৃহে যিনি পদার্পণ করিয়াছেন ও সে পরিবারের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলেই তাহার মধুর সৌরভে বিমোহিত, পবিত্র ও ধন্য হইয়া যান। ধর্ম্ম ও সদাচার আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায় এবং অধর্ম্ম ও অসদাচার আমাদিগকে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে শিক্ষা দেয়। ধর্ম্ম-জীবনে আমরা এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্যময় বিশ্বসংসারের শত কশাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিতে সক্ষম হই, কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবনে আমরা অতি সামান্য একটী কুশাঙ্কুরাঘাতও সহিতে অক্ষম হই। অধিকন্তু অধার্ম্মিক সম্রাটের পদ অপেক্ষা ধার্ম্মিকভিখারী জীবনই আমাদিগের অধিক বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রত্যেক সদ্বিবেচক ও ধর্ম্মপরায়ণ জনক জননীরই যে স্ব স্ব

সন্তানবর্গকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সদৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য করিয়া তোলা উচিত, এই চির পুরাতন কথাটি বোধ হয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

মঙ্গলময় ভগবান্ পিতামাতার স্কন্ধে সন্তানের ভার, পতির স্কন্ধে পত্নীর ভার, উপযুক্ত পুত্রের স্কন্ধে বৃদ্ধ জনকজননীর ভার, রাজার স্কন্ধে রাজ্যভার, এবং গৃহিণীর স্কন্ধে গৃহের দাসদাসী ও যাবতীয় পরিজন পরিবারবর্গের ভার ন্যস্ত করিয়া আমাদিগের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। অতএব গৃহে যদ্যপি আমরা তাহা হইতে বিরত থাকি অথবা উহাতে অবহেলা করি, তাহা হইলে কি আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অবহেলাজনিত মহাপাপে পাপী হইয়া ভগবানের নিকট কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযুক্ত হইব না?

পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি মাতার অধিক দায়িত্ব। কারণ কন্যাগণের শিক্ষা দীক্ষা যাহা কিছু, তৎসমুদায়ই মাতৃহস্তে। পুত্রগণকে অধিকাংশ সময়ই বাটীর বাহিরে অতিবাহিত করিতে হয়, কিন্তু কন্যাগণ সতত মাতৃসন্নিধানে অবস্থান এবং নিয়ত মাতৃচরিত্র পরিদর্শন করে বলিয়া অধিকাংশ স্থলে তাহারা মাতৃস্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে আর কিছু না হউক অন্ততঃ প্রাণাধিকা কন্যার কেবল ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থেই মাতার সৎপথাবলম্বন করা এবং সতত তাহার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহারা সুমাতা হইতে ইচ্ছা করেন, ভরসা করি তাঁহারা এই সমুদায়ের প্রতি কখনও উদাসীন থাকিবেন না। আধুনিক নব্যদলের মাতাদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। (১) যাঁহারা কেবল মাত্র কন্যাদিগকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন। তদ্ব্যতীত যে তাহাদিগের অপর কোনও শিক্ষণীয় বিষয় থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় না। (২) যাঁহারা কন্যাদিগকে কি লেখা পড়া, কি গৃহকর্ম্ম, কি বিনয়, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি স্ত্রীজাতির উচিত কোন রীতি নীতি শিক্ষাই দেন না। বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাঁরা লজ্জাহীনতা, বিলাসিতা, কলহপ্রিয়তা, নাস্তিকতা, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা ইত্যাদি যতকিছু কুশিক্ষা হইতে পারে তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে অদ্ভুত প্রকারের জীব করিয়া তুলেন। (৩) যাঁহারা কন্যাগণকে কতকগুলি কুসংস্কার ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, এই শিক্ষাত্রয়ের মধ্যে কোন প্রকারের শিক্ষা যে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের উপযোগী নহে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও আর নূতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

পুত্রের ন্যায় কন্যাগণকেও সৎশিক্ষা দিয়া তাহাদিগের হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ সাধন করা প্রত্যেক পিতা মাতারই অবশ্য

কর্ত্তব্য। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বহুব্যয়সাপেক্ষ, দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে তাহা প্রায় পোনের আনা লোকেরই অবস্থার অনুরূপ নহে, এবং ঐ শিক্ষা আমাদের গৃহ ও সমাজেরও তত উপযোগী নহে। অধিকন্তু, আমাদের অজ্ঞতা বশতই হউক অথবা যে কারণেই হউক, আমরা কন্যাগণকে বি, এ. এম এ, পাশ করাইয়া তাহাদের লজ্জাশীলতা, হৃদয়ের কোমলতা প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত মাধুর্য্যসমূহ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে পরুষভাষিণী দেখিতে, ও তাহাদের মাতৃত্ববিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পুত্রগণের সমকক্ষ দেখিতে আদৌ ইচ্ছা করি না।

আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রসূতিগণ আবহমান কাল ধরিয়াই সন্তানের লালন পালনের ভার স্ব স্ব স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ জননী পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমাদিগের সেই কল্যাণজনক প্রথা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জীর্ণ দরিদ্র হিন্দুসমাজকে আরও অধিকতর দরিদ্রতার পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহাতে ক্রমশঃ আমাদের সমাজে যে নিত্য কত নব নব অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। যে স্থলে জননীগণ স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সামান্য বেতনভোগী কাণ্ডজ্ঞানহীন দাস দাসীর হস্তে সন্তানপালন ও বেতনভোগী শিক্ষকের হস্তে সন্তানবর্গের নীতিশিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে দ্বিধা বোধ করেন না, সেখানে সন্তানের উন্নতির আশা কোথায়? যে মাতা আপনি কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল পড়িয়া, তাশ খেলিয়া, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, গল্প গুজব ও আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় যাপন করিয়া থাকেন ও আশৈশব সন্তানবর্গকে সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাতে অভ্যস্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহাদের সন্তানসন্ততির সুস্থ সবল দেহ ও উন্নত চরিত্রের আশা কোথায়? বস্তুতঃ যে পরিবারে সত্যে অনুরাগ ও পাপে ঘৃণা নাই, সে পরিবারের সন্তানবর্গের মনুষ্যত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত দুরাশামাত্র। শিক্ষায় মানুষ দেবত্ব ও শিক্ষার অভাবে মানব পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আদিম কালের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অসভ্য বর্ব্বরজাতীয় মনুষ্যগণই কি তাহার উদাহরণ নহে? এখনও উক্ত প্রকার মনুষ্যের অভাব নাই, তবে বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জাতির অধিকারপ্রভাবে তাহাদের সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ আরও ন্যূন হইয়া আসিবে, এরূপ আশা করা যায়।

আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী এক সম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। প্রাচীন কালে যে এদেশে নারীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, এবং বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষার নামেও

তাঁহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তৎকালে নারীজাতির মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল কি না, নিম্নলিখিত প্রতিভাশালিনী বিদুষী রমণীগণই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অতি প্রাচীনকালে অত্রিবংশীয়া বিশ্ববারা-নাম্নী রমণী ঋগ্বেদের একটী সূক্তের রচয়িত্রী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা, শকুন্তলা, দ্রুপদ-রাজকন্যা দ্রৌপদী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত বর্ত্তমানকালের লক্ষ্মণ সেনের পত্নী, জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শিনী খনা, অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা লীলাবতী, রাণী ভবানী, হটি বিদ্যালঙ্কার, প্রভৃতি নারীগণ দেশের চির-গৌরবের স্থল হইয়া রহিয়াছেন। এতগুলি মনস্বিনী বিদুষী রমণীরত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়া যে ভারতকে পবিত্র ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতে যে পূর্ব্বকালে নারীদিগের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা প্রচলন ছিল না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিকন্তু কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মধ্যেই তৎকালীন শিক্ষায় যেরূপ শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হইত, বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। সে উদার বিশ্বজনীন প্রেম, সে গভীর জীবন্ত ধর্ম্মভাব, সে দেববাঞ্ছিত স্বর্গীয় আত্মত্যাগ, সে অগাধ পিতৃমাতৃভক্তি, নারীসমাজের সে দুর্লভ ঐকান্তিক পতি-ভক্তি, সে অকৃত্রিম সেবাপরায়ণতা, সে মধুর সন্তানবাৎসল্য, সে অবিচলিত গুরু-ভক্তি, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার ন্যায় সে অটল সহিষ্ণুতা, সে সরলতা, ভক্তি, বিশ্বাস, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, জানি না, আজ কাল কোন্ অতল গর্ভে চির-নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে? হায়! আজ আমরা সেই ভারতনারী ভক্তিবিশ্বাসহীনা, সঙ্কীর্ণহৃদয়া, স্বার্থপরায়ণা, পুরুষের বিলাসের সামগ্রী ও ক্রীড়ার পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছি। অনেকে এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ দেন। স্বীকার করি, এই শিক্ষা আমাদের নৈতিক জীবনের অবনতির অন্যতম কারণ হইতে পারে, কিন্তু কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের আত্মসম্মান প্রভৃতি সদ্গুণ ভুলিয়া প্রত্যেক বিষয়েই বিদেশীদিগের অনুকরণই বা করিতে যাই কেন? আর যদি অনুকরণই করিতে হয়, কালপ্রভাবে যদি তাহাদের কিছু লইতেই হয়, তবে তাহাদের ভাল অংশটুকু না লইয়া মন্দ অংশটুকুই বা গ্রহণ করি কেন? এ দোষ আমাদের, না তাহাদের? ইহাতে আমাদের কি অকারণ গৃহের জঞ্জাল বৃদ্ধি করা হইতেছে না? ইহাতে দেশ ও সমাজকে ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জোর করিয়া কি অধঃপতনের পথে টানিয়া আনা হইতেছে না? পাশ্চাত্য জাতির সদ্গুণরাশির অভাব নাই। তাহাদের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমপটুতা, কার্য্য-কুশলতা, সাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের স্বজাতিপ্রেম জগতে অতুলনীয়। হংসরাজের ক্ষীরগ্রহণের

ন্যায় তাহাদের চরিত্রের মন্দ অংশটুকু বর্জ্জন করিয়া যদ্যপি উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে আমাদের জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের সম্ভাবনা, নতুবা এই অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালি জাতির আর মঙ্গল কোথায়?

এক্ষণে নারীজাতির শিক্ষার কথা হইতেছে। যে শিক্ষায় আমাদের রমণীগণের মাতৃত্ব-বিকাশের পথ অটুট থাকে, আমাদের স্ত্রীজাতির পক্ষে সেই প্রকারের শিক্ষাই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকরী বলিয়া অনুমান হয়। প্রকৃত পক্ষে নারীজাতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া অপেক্ষা যাহাতে তাঁহারা বিশ্বজনীন প্রেম, ভগবানে নির্ভর, এবং মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা উপলব্ধি করিয়া তৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হন, তদনুরূপ শিক্ষাই তাঁহাদিগের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে মাতা কন্যাকে সদ্বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তান পালন, পরোপকার, মিতব্যয়িতা, লজ্জাশীলতা, সেবা, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া তাহার চরিত্র গঠনপূর্ব্বক তাহার সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ভবিষ্যতে তাহার সুমাতা ও সুগৃহিণী হইবার পথ সুগম করিয়া দেন, তিনিই সন্তানের প্রকৃত শুভানুধ্যায়িনী আদর্শ জননী, তিনি আমাদিগের নমস্য এবং সর্ব্বথা পূজা পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু বলিতে কি, আমাদের মধ্যে সেরূপ সুমাতার নিতান্তই অভাব, এমন কি নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যে দিন আমাদের গৃহে গৃহে উক্তরূপ মাতৃরূপিণী দেবী বিরাজ করিবেন, সে দিন আমাদের দুঃখের সংসার সুখের হইবে, সত্য সত্যই জীবের সংস্কার হইবে, এবং এই কঙ্কর ও কণ্টকময় ভীতিসঙ্কুল দুর্গম গৃহারণ্য স্বর্গের নন্দনকাননে পরিণত হইবে। কিন্তু হায় কে বলিতে পারে যে, আমাদিগের সে সুদিন ভবিষ্যতের কোন অন্ধকারময় গুহায় চিরনিদ্রিত রহিয়াছে?

বঙ্গবিধবা রচয়িত্রী।

ভূত না মানুষ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মৃত ব্যক্তির বক্তৃতা।

রজনী যখন দ্বিপ্রহর, তখন চণ্ডদেবের গৃহের দরজায় আঘাতের উপর আঘাত হইতে লাগিল। সেই আঘাতের শব্দে চণ্ডদেবের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ভয়ে

এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার চাকর চাকরাণীকে ডাকিবারও শক্তি রহিল না। বাহির হইতে স্পষ্ট স্বরে কে কহিল, "চণ্ডদেব দরজা খোল"! চণ্ডদেব সেই স্বরের মধ্যে এমন কি একটা শুনিলেন যে, তাঁহার ভয় দ্বিগুণ বাড়িল। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বায়ুতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। বাহির হইতে সেই স্বর আবার কহিল "ঘরে কে আছিস্, শীঘ্র দরজা খোল্, নচেৎ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিব"। চণ্ডদেব কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। কে একজন যেন ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চণ্ডদেব আপনার শয্যাপার্শ্বে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না, কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

আগন্তুক গর্জ্জন করিয়া কহিলেন "আমার দিকে তাকা"। আগন্তুকের নেত্র হইতে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল তাঁহার ক্রোধাগ্নি যেন নেত্রপথ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। চণ্ডদেব মৃত ব্যক্তির ন্যায় অসাড়দৃষ্টিতে আগন্তুকের চক্ষুর দিকে তাকাইলেন। আগন্তুক একজন স্ত্রীলোক। তিনি কহিলেন "আমাকে চিনিতে পারিস্"?

চণ্ডদেব কথা কহিলেন না।

স্ত্রীলোকটী কহিলেন "কণ্ঠস্বর শুনিয়াও কি বুঝিতে পারিতেছিস্ না আমি কে"?

চণ্ডদেব তথাপি কথা কহিলেন না।

স্ত্রীলোকটি কহিলেন "চিনিতে পারিতেছিস না? পারিবি কেন? শুনবি আমি কে, এক পক্ষে আমি তোর যম, অপর পক্ষে তোর পালিতা চন্দনীর মাতা। চণ্ডদেব! এখন তুই রাজরাজেশ্বর বিগ্রহের প্রতি বাহ্যিক মনোনিবেশ করিয়াছিস্ বটে, কিন্তু যখন তুই রাজপুতানায় ছিলি, তখনকার কথা মনে করিয়া দেখ্ দেখি। তোরা গ্রহদেবের দুই পুত্র, মালদেব ও চণ্ডদেব। মালদেব অতি শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিল। গ্রহদেব মালদেবের মাতৃস্বসাকে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও দুর্ভাগ্যক্রমে তোকে শৈশবেই মাতৃহীন করিয়া স্বর্গবাসে গমন করিয়াছিলেন। মালদেব কেন যে শৈশব হইতেই পিতা গ্রহদেবের অপ্রিয়-পাত্র হইয়াছিল, এ কথা আমি বলিতে পারি না।

গ্রহদেবের অনেক বিষয় ছিল। তিনি তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য তোকেই প্রায় মফস্বলে পাঠাইতেন।

মালদেব পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। তুই পাপিষ্ঠ, চণ্ডদেব, মফস্বলে যাওয়ার ছলে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গভীর রজনী-যোগে উপস্থিত হইয়া গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করিতিস্। রাজপুতানার মধ্যে আমার স্বামী একজন ধনী গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন;

আমি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলাম। তুই, চণ্ডদেব! তু-ই, তু-ই, তু-ই, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। মনে করিয়া দেখ্, এক অন্ধকারাবৃত ঘোর রজনীযোগে তুই চুরি করিবার জন্য, আমার রাজপুতানার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলি, কিন্তু আমার স্বামী তোকে ধরিয়া খুব উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়াছিলেন। সেদিনের মত তুই পলাইয়াছিলি। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে মনে হয় কি, চণ্ডদেব! ওঃ জীবন্ত নরক তুই, তোকে দেখিলেও পাপ হয়!! তুই চোরের মত দ্বার কাটিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি। আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, তোর সঙ্গে পারিবেন কেন? তুই তাঁহার মুখ ও হস্তপদাদি দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া যে ভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলি, তাহা দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। তাহা দেখিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই অবস্থায় আমার কথা কহিবার বা চেঁচাইবার শক্তি ছিল না। দেখিলাম তুই আমাদের যত ধন ছিল, তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইয়া পলাইলি। পর দিন প্রতিবেশিগণ আসিয়া আমার এই দশা দেখিল এবং স্বামীর সংকার করিল, কিন্তু আমি মৃতবৎ হইয়া রহিলাম, বলিবার বা চলিবার শক্তি আমার তখনও হয় নাই। তারপর জানি না তুই তোর পিতার নিকট হত্যাবিবরণ বিবৃত করিয়াছিলি কি না, কেন না, গ্রহদেব অতি যত্ন সহকারে আমাকে আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। তিনি চিকিৎসক দ্বারা আমাকে চিকিৎসা করাইলে আমি আরোগ্য হইলাম। তিনি আমাকে অনেক ধন রত্ন প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃকই যে আমার স্বামিহত্যা হইয়াছিল, এ কথা আমাকে জনসমাজে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে তাঁহার গৃহেই রাখিলেন। এ অভাগিনীও ক্রমশ স্বামীর আত্মার নিকট অবিশ্বাসিনী হইয়া গ্রহদেবর হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু তিনি কখনও আমার অপমান করেন নাই। সে গৃহে তুই ব্যতীত অন্য কোন মানুষ কর্ত্তৃকই আমি অপমানিতা হই নাই। আমি জানি না কেন সেই হইতেই মালদেব গ্রহদেবের অধিক অপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। খুন লইয়া কোন গোলযোগ হইবার পূর্ব্বেই তিনি মালদেবকে চিরবর্জ্জনপূর্ব্বক, তোকে ও আমার পুত্র নন্দক ও কন্যা চন্দনীকে সঙ্গে লইয়া, রাজপুতানা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিলেন। তোর সঙ্গে একত্র হইয়া এখানে আসিতে আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখনও তিনি তোর দোষ ক্ষালনপূর্ব্বক কহিলেন 'তোমার ভয় নাই, একাজ চণ্ডদেবের নহে'।

আমি কহিলাম 'আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি', তিনি কহিলেন 'তুমি ভুল দেখিয়াছিলে।'

আমি কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। সে যাহাহউক

এখানে আসিয়া তুই কয়েক দিন বেশ শান্ত ও ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলি।

কিন্তু গ্রহদেবের মৃত্যুর পর আবার জ্বালাতন করিতেছিলি। আমার স্বামীকে তুই হত্যা করিয়াছিস্, আমার যত ধন সম্পত্তি তুই হরণ করিয়াছিস্। তোর পিতা তোর হত্যা ও চুরীর অপরাধ গোপন রাখিবার জন্য আমাকে অনেক ধনের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ধনও অপহরণের নিমিত্ত তুই বহু চেষ্টা করিয়াছিস্। তুই খুনি আসামী এবং তোর সেই খুন করার বিবরণ প্রকাশ করিবার মানুষ আমি একজনমাত্র আছি, তাহা তুই বেশ বুঝিয়াছিলি। মনে করিয়া দেখ্, এইখানে এই গৃহে তুই আমাকে হত্যা করিয়াছিলি। এক দিন রজনী দ্বিপ্রহরে যখন জগতের সমুদায় প্রাণীই ঘুমাইতেছিল, তখন চণ্ডদেব! তুই একটী মাদকহস্তে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলি। আমাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া সেই মাদক পান করাইয়াছিলি। তুই পুরুষ, আমি স্ত্রীলোক, তোর সঙ্গে আমি পারিব কেন? কোন কৌশলে তুই আমার কণ্ঠনালী রোধ করিয়াছিলি। আমি চীৎকার করিতে অথবা কথা কহিতে পারিতেছিলাম না, বাধ্য হইয়াই আমাকে তোর দত্ত মাদক পান করিতে হইয়াছিল। ঐ মাদক পানের পর আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার ৯ বৎসরের কন্যা চন্দনী আমার পার্শ্বেই ছিল, তাহাকে তুই বালিকা বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলি, তুই ভাবিয়াছিলি সে শীঘ্রই সমস্ত কথা ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু সে সমুদায় কথাই মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। আমার বেশ বোধ হয় বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই, প্রতিধ্বনির সঙ্গে চন্দনীর আলাপ প্রলাপে তুই তাহার আভাস পাইয়াছিলি, এবং তজ্জন্যই বিষাক্ত সূঁচ দ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিস্। কিন্তু সে কথা তোকে পরে স্মরণ করাইয়া দিব। অগ্রে গত কথা আমি বিস্মৃত হইয়াছি কি না, তাহারই প্রমাণ দেখ্। চণ্ডদেব, আমি তোকে ভূতের ভয় হইতে মুক্তি দান করিয়া কহিতেছি যে, আমি আত্মা অথবা ভূত নহি। জানিস্ চণ্ডদেব, যিনি অন্তর্যামী তিনি সূক্ষ্ম বিচারক এবং তাঁহার প্রভাবেই আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। কিরূপে জীবিত হইয়াছিলাম তাহা শ্রবণ কর্, যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন রজনী প্রভাত হয় নাই। আমি চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম আমি একটি নির্জ্জন প্রান্তরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছি, সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র ছিল না। একটি উৎকট গন্ধ আসিয়া আমাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, গন্ধটি আমার শরীর হইতেই বাহির হইতেছে। তৎপরেই দেখিতে পাইলাম বমনে আমার সকল শরীর সিক্ত হইয়া গিয়াছে ও সেই বমন হইতেই ঐ উৎকট গন্ধ বহির্গত হইতেছে। সেই গন্ধ যতই আমার নাসিকায় আসিতে লাগিল, আমি ততই বমন করিতে আরম্ভ করিলাম। তুই

আমাকে যে মাদক খাওয়াছিলি, তখনও বমনের সঙ্গে তাহাই নির্গত হইতে ছিল। এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, এই বমনই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। সেই বমনরূপ মহৌষধ আমার উদর হইতে প্রাণঘাতক মাদক বাহির করিয়া ফেলিয়াছে এবং রজনীর শৈত্য দ্বারা মস্তিষ্ক শীতল হওয়ায় আমি এত শীঘ্র চৈতন্য লাভ করিতে পারিয়াছি। বিষাক্ত মাদক আমার শরীরের উপরে কোন কাজ করার অগ্রেই বমন হইয়া সমস্ত উঠিয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই আমি পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। দেখ্ চণ্ডদেব! প্রাণ ভরিয়া দেখ্, বিধাতার কি প্রচণ্ড প্রতাপ!! তিনি কেমন কৌশলে মরা মানুষকে বাঁচাইলেন। কেন তাহা জানিস্? পাপীর পাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার জন্য। দেখ্, দেখিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হ"। চণ্ডদেব কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার কথা কহিবার শক্তি রহিত হইয়াছিল। ভয় ও বিস্ময় তাঁহাকে বাক্‌শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছিল। আগন্তুক আরও কহিলেন "তার পর কি হইল শোন্, আমি তথা হইতে উঠিয়া গিয়া নদীর জলে অবগাহন করিলাম। আমার শরীর শীতল হইল। তখন কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। দৈবাৎ এক জন বেদিয়া স্ত্রীলোকের সহিত আমার দেখা হইল, তাহার আগ্রহাতিশয্যে তাহার নিকট আমার সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলাম। প্রতিহিংসার ইচ্ছায় আমার শরীর জ্বলিতেছিল। বেদিনী কহিল 'আমার সঙ্গে এস, তোমাকে নানা রকম বিদ্যা শিখাইব। সেই সব বিদ্যাবলে তুমি শত্রু দমন করিতে পারিবে'। তখন আমার সন্তান নন্দক বালক ছিল এবং সে তোরই নিতান্ত বাধ্য ছিল। বেদিনীর পরামর্শ ব্যতীত শত্রুদমনের অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। বেদিনীর সঙ্গেই চলিলাম। নন্দক ও চন্দনীর জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। কিন্তু আমি বেশ জানিতাম, তুই নন্দক ও চন্দনীকে অতি যত্নেই প্রতিপালন করিবি। কারণ তুই তাহাদিগকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় স্নেহ করতিস্। স্নেহ করার আর এক কারণ ছিল যে, তুই ভাবতিস্ তাহারা শিশু, তাহাদিগের দ্বারা তোর গুপ্ত কথা ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমার কোমরে সোণার একটী রেড্ ছিল, তাহার সাহায্যে রাজপুতানায় গেলাম এবং প্রথমে ছদ্মবেশে থাকিয়া আমার মৃত্যু সম্বাদ সর্ব্বত্র প্রচার করিলাম। তৎপরে নানা উপায়ে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই বেদিনীর সঙ্গে বাহির হইলাম। পরে দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি নানা উপায়ে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিলাম। কালা মানুষকে ধলা, ধলা মানুষকে কালা করিতে শিখিলাম। বাক্‌পটুকে বোবা এবং বোবাকে কথা কহাইতে আমার অধিক সময় লাগিত না। অনেক দিন পরে আবার পুরমণ্ডলে আসিলাম।

নন্দককে বেশ সুস্থ এবং সুখী বলিয়াই বোধ হইল। চন্দনীকেও সুস্থ দেখিলাম, কিন্তু সুখী বলিয়া বোধ হইল না। বুঝিলাম তুই তাহাকে সুখে রাখিস্ নাই। কি করিব, তোকে জব্দ করিবার জন্য নন্দকের সাহায্য পাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, নন্দক, প্রতারক চণ্ডদেব! তোর মায়ায় একেবারে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, সে কখনই তোর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণে সহায়তা করিবে না, আর তোর বিরুদ্ধে তখন ভালরূপ সাক্ষীরও যোগাড় ছিল না। নানা কারণে প্রকাশ্য আদালতে তোর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বিরত হইয়াছিলাম। তখন বরাহপুর যাওয়ার পথে ভীষণ বনের ধারে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম। এদেশে আসার পরই ভূতের বনের বিবরণ সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিলাম। এই সব বিষয়ে তোর উপরেই আমার কতক সন্দেহ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ভূত প্রপীড়িত মানুষ অথবা ক্লান্ত পথিকবর্গের কোন উপকার করিবার ইচ্ছায় আমি এইরূপ করিলাম। তোর উপর প্রতিহিংসা তুলিতে না পারিয়া ঘোর অশান্তিতে কাল অতিপাত করিতে লাগিলাম। পাপিষ্ঠ! তোর প্রতিমূর্ত্তি গঠনপূর্ব্বক তাহা ভূমধ্যস্থিত একটী গুপ্ত ঘরে লুকাইয়া রাখিলাম। প্রতিদিন সেই মূর্ত্তির মুখে পাঁচবার করিয়া ঝাঁটা মারিতাম এবং সম্মার্জ্জনীটি তাহার মুখের উপরেই রাখিয়া দিতাম। মধ্যে মধ্যে কুটীরের দ্বার বন্ধ রাখিয়া আমাকে পুরমণ্ডলে থাকিতে হইত। অনেক চেষ্টার পর বুঝিতে পারিলাম, ভূতের বনের সমুদয় কাণ্ডই তোর। বুঝিলাম, কি কি কৌশলে তুই ভূতের বল প্রাপ্ত হইয়াছিস্। আমিও যে উপায়ে ও যে কৌশলে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, তুইও সেই উপায়েই এ সব অদ্ভুত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিস্। তোর শক্তি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি নাজে নাবিকবেশে চণ্ডদেব! তোকে তিন দিনের রাস্তায় রাখিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তুই দেশের মধ্যেই রহিয়াছিস্ ও রজনীযোগে লোকের অনিষ্ট করিতেছিস্। তোর অসাধ্য কোন কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম। তোর মধ্যে দুই ভাব আছে, এক ভাব দানবত্ব, অপর দেবত্ব। দেবত্ব দ্বারা তুই সকলের নিকট জয় ও মান্য প্রাপ্ত হইতিস্, আর দানবত্ব দ্বারা তুই সকলকে পরাজয় করিতিস্।

অনেক অনুসন্ধানের পর তোর বাসস্থানের সন্ধান পাইলাম। তারপরে শোন্ একদিন রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম কতকগুলি লোক নিঃশব্দে নীরবে একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতেছে। আমিও অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর উঠিলাম। দেখিলাম, পাহাড়ের পশ্চাৎ দেশ এত গভীর যে তথা হইতে নিম্ন দিকে দেখিলে সে স্থানটিকে পুরাণোক্ত পাতালভূমি বলিয়াই

বিবেচিত হয়। কিন্তু সেই গভীর গর্ত্তের মধ্যে উচ্চ অনুচ্চ বালুকাস্তূপের অভাব ছিল না। আরও দেখিলাম সেই উচ্চ পাহাড়ের কোটীদেশ স্পর্শ করিয়া একটি অতি উচ্চ বালুকাস্তূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলাম ঐ লোকগুলি সকলে একত্র হইয়া উচ্চ পাহাড় হইতে সেই বালুকাস্তূপের উপর লাফাইয়া পড়িল। একটু পরে আমিও সেখানে লাফাইয়া পড়িলাম। প্রথমে আমার দক্ষিণ অঙ্গ বালির মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল এবং আমি অতি কষ্টে আপনাকে আপনি উদ্ধার করিলাম। বুঝিলাম সকলেরই এইরূপ অবস্থা হয়। ভাবিলাম ইহার পর বারে অতি সতর্ক হইয়া অর্থাৎ যাহাতে পদ ব্যতীত অন্য অঙ্গ প্রোথিত হইতে না পারে লাফাইয়া সেইরূপে পড়িতে হইবে। সে যাহা হউক, দেখিলাম পাহাড়ের একদিক অত্যন্ত ঢালু এবং সেই সব লোক একত্র হইয়া সেই ঢালু স্থানের উপর বসিল ও সর, সর করিয়া অল্প কালের মধ্যেই পাহাড়ের নিম্নদেশে চলিয়া গেল। ঐ উপায়ে আমিও নীচে নামিয়া পড়িলাম। আত্মরক্ষার জন্য কিছু ধুনা ও কিছু সরিষা মন্ত্রপূত করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম। বলিতে কি আমার সঙ্গেই উহা প্রায় থাকিত। ঐ ধুনা যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফেলিতাম, ক্ষণেকের জন্য তাহারাই মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইত। আর ঐ সরিষা নিক্ষেপ করিলে মানুষকে ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হইত। তাহাদের সঙ্গে নীচে আসিয়া তথায় লতাপত্রনির্ম্মিত একটী সুন্দর গৃহ দেখিলাম। ঘরের মধ্যে কতকগুলি লোক বাস করিতেছিল। আমি একটী উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি সকলকে দেখিতে লাগিলাম। তাহাদের সকলের মুখে তোর নাম অনেক বার শুনিতে পাইলাম। ইহারা মালদেবের নাম এবং গ্রহদেবের নামও সময় সময় উচ্চারণ করিল এবং ইহারা যে তোরই লোক তাহা বুঝিতে আমার বাকি রহিল না। অবশেষে কেহ কেহ গুপ্ত দরজা খুলিয়া চলিয়া গেল, তাহাও আমি দেখিলাম। সেই ভাবে সেইখানে অনাহারে অনিদ্রায় তিন দিন তিন রাত্রি আমাকে কাটাইতে হইয়াছিল। চতুর্থ দিনে দেখিলাম অনেক গুলি লোক চলিয়া গেল, অল্প লোকই ঘুমাইয়া রহিল। আমি তখন ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া নিদ্রিত লোকগুলির উপর ধুনা নিক্ষেপপূর্ব্বক গুপ্ত দরজা খুলিয়া চলিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একটী সুড়ঙ্গ কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। সুড়ঙ্গের উপর নবদূর্ব্বাদলাবৃত একখণ্ড বৃহৎ মাটী। না দেখিলে সে গুপ্ত দরজা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা মানুষের পক্ষে একরূপ অসাধ্য। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হওয়ার পথটীর উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষের একটী প্রকাণ্ড শাখা আসিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অতি সতর্কভাবে এবং কৌশলের সহিত সেই শাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর উঠিতে

হয়। বৃক্ষ হইতে ভূমিতে নামিবার কোন উপায় ছিল না। ঘোর কণ্টাকাকীর্ণ বন এবং ঘন ঘন গহ্বর ও উচ্চ ভূমি সে বনটীকে এমনি দুর্গম করিয়াছিল যে, জীবনের আশা ত্যাগ না করিলে মানুষ সেখানে যাইতে পারিত না। ঘনসন্নিবিষ্ট উচ্চ বৃক্ষে চারি দিক্ পরিপূর্ণ। এক বৃক্ষ হইতে আর এক বৃক্ষে লাফাইয়া পড়িতে হয়। অতি কৌশলে ও সতর্কভাবে শাখা পল্লব ধরিয়া এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে যাওয়া যায়। এইভাবে প্রায় কুড়ি মাইল পথ যাইতে হয়। তাহার পর একটী নির্জ্জন পার্ব্বত্য ভূমি। একটী বৃক্ষ একটী উচ্চ পাহাড়ের সঙ্গে সংলগ্ন, প্রথমে সেই বৃক্ষ হইতে উচ্চ পাহাড়ের উপর নামিতে হয়, তৎপরে সেই পাহাড় হইতে ভূমিতলে অবতরণপূর্ব্বক একটী নির্জ্জন মাঠ পার হইয়া জনসমাজে আসিতে হয়। আমিও ঐরূপে জনসমাজে আসিলাম। এইরূপে কয়েক বার গহ্বরে গেলাম। গহ্বরের মধ্যস্থিত বৃক্ষের উপর অলক্ষ্যে বাসকালে সেই স্থান হইতে অনেক বার চন্দনী, নন্দক, চণ্ডদেব ও আমার নাম শুনিতে পাইয়াছিলাম। প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর নাম ও দুইটী বালিকার কথাও তাহারা কহিত। এই ঘটনার পর আমি মধ্যে মধ্যে বন ও নির্জ্জন স্থান ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে জনসমাজে বাহির হইতাম। চণ্ডদেব! তুই বহুরূপী, তুই সকল সময় দানবের বেশে থাকিস্ না, অনেক সময় দেবতার বেশও ধরিস্। কোন কোন সময় (তাহাও সকলের উপর নহে, কেবল আমাদের উপর অথবা কোন সুন্দরী স্ত্রীলোকের উপর) অত্যাচার করিস্। তোর এত টাকা থাকিতেও তুই টাকার কাঙ্গাল হইয়া ফিরিস্। টাকার জন্য তুই সব অন্যায় কাজ করিতে পারিস্। একদিন তুই বহুদূরে গিয়াছিস্ জানিয়া নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছিলাম, হঠাৎ তোকে সম্মুখে দেখিলাম এবং ছদ্মবেশী বলিয়া তোর একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেও পড়িয়া গেলাম। তদবধি আর এ দিকে আসিতাম না, সেই ভূতের বনের সন্নিকটস্থ বনের ধারের কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম। একদিন আমি মনের যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য অনেক মদ পান করিয়াছিলাম, সেই দিন নন্দক চন্দনীর মৃত দেহ লইয়া আমার কাছে গিয়াছিল, কিন্তু আমি মদের ঝোঁকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই। তৎপরে চন্দনীকে চিনিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ি। নন্দক চলিয়া গেলে ভাল করিয়া চন্দনীকে দেখিয়া তখনও দেহে প্রাণ আছে জানিতে পারি। তীব্র বিষ তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি বিপরীত চিকিৎসায় তাহাকে আরোগ্য করিলাম। চন্দনী আরোগ্য লাভ করিয়া তাহার জীবনের সমুদায় ঘটনা আমার কাছে কহিল। সে তোর পাশবিক আচরণে কুমারীধর্ম্মে বঞ্চিতা হইয়াছিল। প্রতিধ্বনির অপহরণের কথাও সমুদয় শুনিলাম। তখন আমি সব বুঝিলাম। তোর উপর

ভীষণ ক্রোধ নিবারণের জন্য চন্দনীকে লইয়া পলাইলাম। তোকে পৃথিবী হইতে বিদায় করার জন্য কোন উপায় না পাইয়া চন্দনীকে ভূত সাজাইলাম এবং নানারূপ হাব ভাব চলন চরিত্র শিখাইয়া তোকে মারিতে পাঠাইলাম। ভূতে মারিলে আদালতে প্রকাশ হইবে না, এইজন্য এইরূপ করিলাম। চন্দনি তাহার ধর্ম্ম-হন্তাকে বধ করিবার জন্য মহা উৎসাহে যাত্রা করিল। সে অল্প পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। কিন্তু নন্দকের সাহায্যে তখন তুই রক্ষা পাইয়াছিলি। (ক্রমশঃ)

শাক্য সিংহ বা বুদ্ধদেব।

(১)

বিরলে বসিয়া চিন্তায় মগন,
রাজার তনয় তেজেতে তপন,
মেঘাবৃত কেন দেখিতে পাই ?
একি হেরি শিশু ভাবে মাতোয়ারা,
আপনার ভাবে আপনিই হারা,
জনকহৃদয়ে অসুখ তাই!

(২)

ভাবেনজনক কি হইবে হায়,
সতত তনয়ে হেরি ভাবনায়,
কি ক'রে ইহার ফিরাই মন ?
সংসার-কামনা ইহার অন্তরে
কি ক'রে উপজে কে বলে আমারে ?
এক মাত্র পুত্র সর্ব্বস্ব ধন।

(৩)

এই কথা শুনে একজন কহে,
"রাজন্, কহেন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
পুত্র আপনার রবে না ঘরে,
পরিণয়পাশে বাঁধহ ইহারে,
তবে ত হৃদয় বসিবে সংসারে,
নতুবা রাখিবে কেমন করে?"

(৪)

ডাক দিয়া কহে রাজা শুদ্ধোদন,
"ওহে পাত্র মিত্র! যে আছ এখন,
সত্বরে কুমারী করহ স্থির;
পুত্রের বিবাহ দিব শুভক্ষণে
ইহার অন্যথা করিব না মনে,
হৃদয় আমার বড় অধীর।"

(৫)

বিবাহ হইবে, পুরবাসিগণ,
মঙ্গল আচারে রত অনুক্ষণ,
বিবিধ বাজনা বাজিছে তাই,
নর্ত্তকী নাচিছে গায়ক গাইছে,
মধুর সঙ্গীত বিমানে ছুটিছে,
আনন্দের আর অবধি নাই।

(৬)

বিবাহ হইল, কিছু দিন পরে,
পুত্র মুখশশী অবনী উপরে
রাজার ভবন করিল আলো,
সংসার-সম্ভোগ, বিলাস-বাসনা,
শিশুর সুস্বর, পবিত্র ললনা,
কিছুই কুমারে লাগে না ভাল।

(৭)

একদা গভীর　নিশীথসময়,
সুষুপ্ত ধরণী　জনক ঘুমায়,
সহসা স্বপনে　উঠিয়া জেগে,
'কোথা পুত্র মম কুমার আমার'
বলিয়া জনক　করি হাহাকার,
অন্তঃপুরভাগে　আসিল বেগে।

(৮)

আসিয়া কঞ্চুকী　কহিল তখন,
নাহিক ভাবনা　নিদ্রায় মগন,
আছেন কুমার　পালঙ্ক পরে,
শুন নরপতি　পুত্র আপনার
মনের বাসনা　করেন প্রচার,
প্রমোদ-উদ্যানে　ভ্রমণ তরে।

(৯)

প্রভাত যামিনী, হাসে দিবাকর,
পাত্র মিত্র সবে　আনন্দ অন্তর,
কহেন নরেশ　সভার মাঝে,
"তনয় আমার　করেন মনন,
কুসুম উদ্যানে　করিতে ভ্রমণ,
সাজাও নগর　বিবিধ সাজে।

(১০)

বাজিল বাজনা　নর্ত্তকী নাচিল,
সঙ্গীতলহরী　গগন পূরিল,
ছত্রধ্বজা শোভে পথের পরে;
পুরবাসিগণ,　আনন্দে মগন,
আসিল কুমারে করিতে দর্শন,
হেরিল কুমারে　নয়নভরে।

(১১)

পূর্ব্ব দ্বারে হেরে নৃপের নন্দন,
জরা ভার-গ্রস্ত　বৃদ্ধ একজন
যাইছে যষ্টিতে　নির্ভর করে,
নাহি দন্ত তার　বদন বাহার,
শুষ্ক রক্ত মাংস,　অস্থিমাত্র সার,
অনাহারে নাহি　বচন সরে।

(১২)

জ্যোতিহীন আঁখি শুভ্রবর্ণ কেশ,
দেহে নাহি বল　জীবনের শেষ,
যৌবন তাহার　গিয়াছে চলে,
নিস্তেজ ইন্দ্রিয়　বুদ্ধির বিনাশ,
দেহের সৌন্দর্য্য　না পায় প্রকাশ,
ঢেকেছে সর্ব্বাঙ্গ　ধূলির দলে।

(১৩)

ডাকিয়া কহেন　কুমার তখন,
একি হে সারথি　করি বিলোকন,
বুঝায়ে আমায়　দাও হে বলে।
কহিল সারথি,　"জরাগ্রস্ত নর,
এ দশা ইহার　অবনী উপর,
দেহের শকতি　গিয়াছে চলে।"

(১৪)

ফিরাও সারথি　রথ ঘর পানে,
আজকে যাব না　প্রমোদকাননে,
কহেন কুমার　কুণ্ঠিত অতি,
এই ত লোকের　গর্ব্বিত যৌবন,
কালের দশনে　হয়েছে পেষণ,
ধিক্ মানবের　সংসারে মতি!

(১৫)

দক্ষিণ তোরণে　আজকে আবার,
উদ্যানভ্রমণে　আসেন কুমার,
হেরেন পীড়িত　মানবে হায়!
বহুরোগগ্রস্ত　শীর্ণ-কলেবর,

বিকট-আকার যাতনা-কাতর,
আপন পুরিষে শুইয়া রয়।

(১৬)

দীর্ঘশ্বাস তার বহে ঘনে ঘন,
ফেলিয়া গিয়াছে বান্ধব স্বজন,
বিকল ইন্দ্রিয় চেতনা নাই।
হেরি তাহে কহে নৃপের নন্দন,
ফিরাও সারথি রথ এইক্ষণ
যাব না উদ্যানে ঘরেতে যাই।

(১৭)

আজিকে ভেদিয়া পশ্চিম তোরণ,
করেন কুমার কাননে গমন,
পথের উপরে হেরিতে পান,
বস্ত্রাবৃত দেহ খাটের উপরে,
নাহিক জীবন তাহার ভিতরে,
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর গিয়াছে প্রাণ।

(১৮)

আত্মীয় স্বজন করে হাহাকার,
বক্ষে করাঘাত করে অনিবার,
ঘোর আর্ত্তনাদে গগন পূরে,
অনিত্য মানব, অনিত্য শরীর,
সকলি অনিত্য সংসারে দেহীর
হায়রে কেবাল প্রকাশ করে!

(১৯)

সারথিরে ডাকি কহেন কুমার,
ঘর পানে রথ ফিরাও আমার,
উদ্যানবিহারে বাসনা নাই,
জীবের দুর্দ্দশা হেরিয়া আমার,
হৃদয়ে উথলে শোকপারাবার,
কিসে নিবারিব বলহে তাই।

(২০)

উত্তর তোরণে আজ্ঞায় রাজার,
চালাইল রথ সারথি এবার,
হেরেন কুমার ভিক্ষুক নরে,
শান্ত দান্ত অতি প্রশান্তহৃদয়,
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে মুষ্টি মাত্র লয়,
তাহাতে জীবন ধারণ করে।

(২১)

পুণ্যালোকে দেহ উজ্জ্বল তাঁহার
কষায় কাপড় পরিধান সার,
ঊর্দ্ধেতে নয়ন নাহিক তুলে,
জিতেন্দ্রিয় নর বিনয়ভূষণ,
সর্ব্বজীবে সম করেন দর্শন,
চিত্ত স্থির সদা ধরম মূলে।

(২২)

কহরে সারথি ইনি কোন্ জন,
সত্য সুখী এঁরে করি বিলোকন,
বিমল আনন্দে প্রফুল্ল অতি।
কহিল সারথি ভিক্ষুক এ জন,
প্রব্রজ্যা-সুখেতে সদাই মগন,
হিংসা রাগ দ্বেষে নাহিক মতি।

(২৩)

শুনহে সারথি জীবন ইহার
কে যেন আঁকিল হৃদয়ে আমার,
ইহাই আমার লাগিল ভাল,
আত্মপরহিত হইবে ইহাতে,
ইহার সমান কি আছে মহীতে,
ঘুচিবে অজ্ঞান তিমিরজাল।

(২৪)

জরা ব্যাধি মৃত্যু হেরিয়ে তাঁহার,
ঘটিল বিষম মনেতে বিকার,
সংসারলালসা ঘুচিল তাই;
অজ্ঞান যাহারা, বিষয়-কাননে,

ঘুরে বিষময়　　ফল আস্বাদনে,
চরমে যাহাতে　　নিস্তার নাই!!

(২৫)

হায়রে মানব　　অবোধ মতন,
অজ্ঞানতিমিরে　　ঘুর অকারণ,
জ্ঞান যদি চাও　　এসরে চলে,
যৌবন-গৌরব　　বিলুপ্ত জরায়,
ব্যাধিতে শরীর　　সতত পুড়ায়,
সকলি ফুরায়　　মরণ হলে।

(২৬)

কেন তবে বল　　সংসারে আবার,
এই পুত্র মম　　এই পরিবার,
এই গৃহ সার　　বৈভব ভবে ;
ত্যাজ অহঙ্কার　　শিখরে বিনয়।
মাটির মানুষে　　উচিত যা হয়,
ধুম ধাম ভবে　　কদিন রবে ?

(২৭)

জ্ঞানার্থী কুমার　　নানা স্থানে গিয়া,
জ্ঞান লাভ করি　　তপস্যা শিখিয়া,
বারাণসী ধামে　　আসিল চলে,
জ্ঞানের প্রচার　　করিতে লাগিল,
ধর্ম্মের পিপাসা　　মিটাইয়া দিল,
দয়াতে তরিল　　মানবকুলে।

(২৮)

একি কোলাহল　　করিরে শ্রবণ,
প্রতিধ্বনি ঘোর　　করিল নিক্কণ,
পুরিল সমস্ত　　ভারত দেশ ;
আনন্দলহরী　　ছুটিতে লাগিল,
নর নারী সবে　　সুখেতে ভাসিল,
দুখের যামিনী　　হইল শেষ।

(২৯)

কে এল কে এল　　দেখরে চাহিয়া,
প্রভাত অরুণ　　লাবণ্য মাখিয়া,
ধর্ম্মের আকাশে　　উদয় হ'ল ;
কিরণ তাহার　　চৌদিকে ছুটিল,
জীবের হৃদয়　　আলোকে পূরিল,
অজ্ঞানতিমির　　দূরেতে গেল।

(৩০)

শিখান গৌতম　　মনের আবেগে,
"আলস্য ত্যজিয়া　　উঠ সবে জেগে,
"জীবের উন্নতি　　কররে ধ্যান,
"অসার জীবন　　বল কতক্ষণ
"হিংসা দ্বেষ সদা　　কররে বর্জ্জন,
"পরমার্থ তরে　　লভরে জ্ঞান।

(৩১)

"প্রেমরাজ্য ভবে　　কররে বিস্তার,
কাহারও প্রাণে　　দিও না ব্যথা,
"হৃদয়ে সৃজরে　　স্নেহের সাগর,
"ডুবাও তাহাতে　　বিশ্ব-চরাচর,
"বুঝিতে পারিবে　　বুদ্ধ ধর্ম্মকথা।

(৩২)

"রণপ্রিয় যত　　ক্ষত্রিয়তনয়,
"ত্যজ রণবেশ　　ত্যজ সমুদায়,
"কোটির কৃপাণ　　দেহরে ফেলে,
"জ্ঞানের কৃপাণ　　কররে ধারণ,
"মায়া মোহ রিপু　　কররে ছেদন,
"ধর্ম্মের পথেতে　　এসরে চলে।

(৩৩)

"এস ভববাসী　　যে আছ যথায়,
"অমৃতের নদী　　বহিছে হেথায়,
"মনের সুখেতে　　কর রে পান,

"বৌদ্ধধর্ম্ম সার করহ আশ্রয়,
"দূরে যাবে তব ঘোর ভবভয়
"সংসারবন্ধনে পাইবে ত্রাণ।"

(৩৪)

পঞ্চাশত কোটি মানবে মিলিয়া
ধন্য-বুদ্ধ তুমি বলিল উঠিয়া,
ধন্য হে জনম তোমার ভবে,
ধন্য মায়াবতী তোমার জননী,
যাহার পুণ্যেতে তরিল অবনী,
জয় জয় বুদ্ধ বলিল সবে।

(৩৫)

পুনর্জ্জন্ম আর নাহি জীবকুলে,
শিখান গৌতম জয়ডঙ্কা তুলে,
নির্ব্বাণ প্রচার করেন সবে ;
লঙ্কা চীন দেশ তিব্বত আগার,
যে যথায় আছ এস রে এবার,
ভাই ভাই সবে মিলিব ভবে।

(৩৬)

সুদৃঢ় বন্ধনে মিলিব সবাই,
জাতিভেদে আর কোন কাজ নাই,
যবন হিন্দুতে এসরে চলে ;
সাম্যের নিশান তুলিয়া হেথায়,
দাঁড়াইয়া আছি লইতে সবায়,
আসিয়া দাঁড়াও তাহার তলে।

(৩৭)

পরস্পরে হৃদি দেহরে খুলিয়া,
অহিংসার ধর্ম্ম যাওরে শিখিয়া,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভবে বিস্তার কর,
জাতিভেদ সব যাওরে ভুলিয়া,
শান্তিসুধা সবে দাওরে বাঁটিয়া,
জীবের মঙ্গল হৃদয়ে ধর।

(৩৮)

জয় জয় দেব বুদ্ধ মহামতি,
গাও ভক্তবৃন্দ উল্লাসেতে মাতি,
জয় তব নাম উদ্ধার তরে,
ভব পারাবার, তুমি কর্ণধার,
তব ধর্ম্মতরী রক্ষা সবাকার,
তোমার মিলনে তরিল নরে।

(৩৯)

কপিলবাস্তুতে জনম লভিয়া,
জগত উদ্ধারে বৈভব ত্যজিয়া,
ধরমের তরে আইলে চলে,
সংসারসঙ্গিনী গোপারে ভুলিলে,
নিশীথে সবারে ফেলিয়া আসিলে
মায়ারজ্জু সব কাটিয়া দিলে।

(৪০)

অসার সংসার মায়ার আগার,
কেহ নহে কার ভাবিলে কুমার,
জ্ঞানমাত্র সার নিস্তার করে,
ধর্ম্মের অনল হৃদয়ে জ্বলিল,
নিবাতে তাহারে কেহ না পারিল,
চলিয়া আসিলে পাপীর তরে।

(৪১)

কে পারে এ হেন সংসারমাঝারে ?
সামান্য মানব কে বলে তোমারে ?
মহত্ত্ব তোমাতে বিরাজ করে ;
তুমি হে মানব মানব ত নও,
দেব অবতার আশ্চর্য্য দেখাও,
জগত তরিল তোমার তরে।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জমিদারেরা এইরূপ নির্য্যাতন করায় জয়নগর স্কুলের কর্ম্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইল।

ট্রেণিং আকাডামিতে কিছুদিন এক্‌টিনী করা যায়। পরে হিন্দু স্কুলের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষক হই। মেডিকেল কলেজে পাঠের সময় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময়ে বিহারী ভাদুড়ী, R. L. Dutt প্রভৃতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ, বিজয় বাবু এবং ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত একত্র যোগ হয়। হিন্দু স্কুলে চাকরীর সময় দেবেন্দ্র বাবু ও কেশব বাবুর যোগে ব্রাহ্মসমাজের আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখি। এই সময় কতকগুলি ধর্ম্মবন্ধুর সহিত মিলন হয় ও বামাবোধিনী পত্রিকা প্রচার করা যায়। ১৮৬৪-৬৫ নিবোধই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করা যায়। স্বাধীন ভাবে শিক্ষকতা ও ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য করিয়া যথেষ্ট লাভ হয়, এই Inspiration (প্রত্যাদেশ) পাওয়া গিয়াছিল।

১৮৬৬ সালে নিবোধই হইতে রাজপুর স্কুলের ২য় শিক্ষক হইয়া আসি। তখন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত স্কুলের অন্যতর সম্পাদক এবং সকল কার্য্যের ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি শিবনাথের (শাস্ত্রী মহাশয়ের) মাতুল এবং তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস ছাপাই, এজন্য তাঁহার সহিত পরিচয় ছিল। তিনি আশ্বাস দিলেন শীঘ্রই হেডমাষ্টার করিয়া দিবেন। তিনি তখন সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মেরও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। প্রথমে তাঁহার বাটীতে কিছুকাল ছিলাম। সেই সময় তাঁহার ভগিনীপতি ভুবন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্ম হইবার জন্য ব্যগ্র হন এবং কিছুদিন উপবীত পরিত্যাগ করেন।

হেডমাষ্টার লইয়া স্কুলের অন্যতর সম্পাদক গোলক বাবুর সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মনান্তর হওয়াতে তিনি স্কুলের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং আমিও কার্য্য ত্যাগ করি। পরে বিদ্যাভূষণ মহাশয় হরিনাভি ইং-সং বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং আমি হেডমাষ্টার নিযুক্ত হই। এই সময় হরিনাভি-স্কুলগৃহেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বে ভুবনবাবুর সহিত সময় সময় উপাসনা, সঙ্গীত ও কাহারও কাহারও বাটীতে গিয়া ধর্ম্মকথা হইত। হরিনাভিতে অনেকগুলি উৎসাহী বন্ধু মিলিল, তন্মধ্যে কেদারনাথ দে সর্ব্বপ্রধান। তিনি অনেক দিন হইতে আদি সমাজে যোগ দিয়া আসিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতেন। তিনি কলিকাতায় আফিসে কাজ করিতেন, বাটী হইতে যাতায়াত চলিত। হরিনাভির বন্ধুগণের মধ্যে হলধর

বাবু মহর্ষির পক্ষপাতী ছিলেন। উমাচরণ, পূর্ণ, মহেন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতাদির খুব চর্চ্চা হইত। কেদার বাবু একদিন আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি কিছু সাহায্য করিলে আমি বাটীতে একটী ব্রাহ্মসমাজঘর নির্ম্মাণ করি। আমি কিছু দিলাম এবং তিনি নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করেন। প্রতাপ বাবু আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। স্কুলের ছেলেরা আমার প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিল। তাহারা ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইল। অবিনাশ, কালীকৃষ্ণ, প্রিয়, চন্দ্র, কেদার প্রভৃতি প্রতি শনিবার আমার সহিত কলিকাতায় যাইত, কালীনাথের বাসায় শিবকৃষ্ণ দত্তের আগ্রহে বেশ সেবা হইত। রবিবার ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিয়া আবার হরিনাভিতে আসা হইত।

হরিনাভির বালকেরা আমার ইচ্ছামত সব করিতে প্রস্তুত। ইহাদিগের সহায়তায় হরিনাভি সমাজ বেশ জমাট হইয়া উঠিল। উপাসনাস্থলে লোক ধরিত না, আমাকেই অধিকাংশ দিন উপাসনা করিতে হইত। ছাত্রেরা বেশ সঙ্গীত করিত। ইহারা আমার এতদূর অনুগত হয় যে, কেদার বাবু এক সময় ইহাদের কয়েকটীকে লইয়া বারাসত, নিবোধই প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। অবিনাশ ও কালীকৃষ্ণ লব কুশ আখ্যা পান। ছেলেরা জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিল—পিতা মাতাদের ক্লেশ হইবে বলিয়া উপবীত ত্যাগ করে নাই, কিন্তু অনেকে তাহাও করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের অভিভাবকেরা এই সকল দেখিয়া বিরক্ত হইলেও আমার প্রতি ভালবাসা এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আমার প্রতি সহানুভূতিবশতঃ বাহ্যে কেহ কিছু বলিতেন না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্রাহ্মদের প্রতি এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে, রাজপুর স্কুলের সম্পাদক হরিনাভি স্কুলের সহিত তাঁহার স্কুল এক করিবার সময় কয়েকটী নিয়ম করেন, তাহার মধ্যে একটী এই যে, স্কুলে কোন ব্রাহ্ম শিক্ষক থাকিবে না। এতদুপলক্ষে গ্রামস্থ লোকদিগের একটি সভা হয়, তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ব্রাহ্মশিক্ষক পাইলে অন্য শিক্ষক রাখা হইবে না। চিনু খুড় নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সঙ্গীতপটু ছিলেন, তিনি সমাজে এবং আমার বাসায় আসিয়া সঙ্গীত করিতেন। প্রায় ৪ বৎসর কাল এইরূপে অবাধে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও কার্য্য হইতে লাগিল। গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে আসিতেন।

১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকগুলি গুণবান্ যুবকের সহিত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি মজিলপুরনিবাসী, ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় জানিবার জন্য সময় সময় আমার নিকট আসিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক

লইয়া বাটীতে গিয়া পড়িতেন। ইনি অতি সরল স্বভাবের বালক ছিলেন। আমি যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাটীতে থাকি, ইনি আসিয়া এক এক শনিবার আমার সহিত যাপন করিতেন ও অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং বামাবোধিনীর জন্য মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন। তখন তিনি যে ব্রাহ্মসমাজে আসিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার পিতা "রাগী ঠাকুর" বলিয়া খ্যাত এবং দেশের একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। শিবনাথ পিতাকে যমের মত ভয় করিতেন এবং তাঁহার আজ্ঞা বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন করিতে সাহস করিতেন না। এক সময় পিতার আজ্ঞায় তিনি ধর্ম্ম-পত্নীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও তাঁহার মাতা এই হতভাগিনী রমণীকে তাঁহাদের বাটীতে আনিয়া রাখেন এবং শিবনাথ আসিলে তাঁহার সহিত পুন-র্মিলিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শিবনাথ পিতার অসন্তোষের ভয়ে তাহাতে সম্মত হন নাই। কিছু দিন পরে পিতা তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া তাঁহাকে বর সাজাইয়া বিদ্যা-ভূষণের বাটীতে আসিলেন। তথা হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার মাতা ও পরিজনবর্গ বিশেষরূপে বিবাহ বন্ধের চেষ্টা করিলেন। আমরাও শিবনাথকে অনেক বুঝাইলাম। তিনিও প্রস্তাবিত বিবাহের অবৈধতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন "কিরূপে পিতার হাত এড়ান যায়।" আমরা বলিলাম "তুমি পলাইয়া যাও"। তিনি বলিলেন "আচ্ছা তাহারই চেষ্টা করিব।" কিন্তু তাঁহার পিতা বড়ই চতুর ও সতর্ক ছিলেন, তিনি রাত্রি না পোহাইতে পোহাইতে ছেলেকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। শিব-নাথের অনিচ্ছা সত্ত্বে বিবাহ হইয়া গেল।

ইহার পর শিবনাথ ভবানীপুরে থাকেন। তথায় মহর্ষি ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিয়া নূতন তেজ ও উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতেন। শিবনাথ তথায় গিয়া ধরা পড়িলেন। তাঁহার নির্ব্বাপিত ধর্ম্মভাব শতগুণ প্রজ্বলিত হইল এবং তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময় যখন তিনি আমার বাটীতে আসিতেন, আমার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন ও তাঁহার মনের কথা সকল খুলিয়া বলিতেন। সময় সময় পত্রালাপও করিতেন। এই সময় তাঁহার যে অনুতাপ হয়, তাহা আশ্চর্য্য ও স্বর্গীয়। তিনি আমাকে জানাইতেন যে, তাহার এক এক রাত্রি অশ্রুপাত করিতে করিতে অবসান হইয়াছে। এই সময় তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ ও কুসংস্কার পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের কথা না শুনিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মারসী মারভীল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিন মাডাম লিগের দোকানে প্রথম দর্শনেই মারসীর প্রতি লর্ড মারভীলের অন্তঃকরণে স্বতঃই কেমন একটি কোমল করুণার ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। বাস্তবিক মারসীর দীর্ঘ ভায়োলেট বর্ণের নয়ন দুটিতে ও তাহার ঈষৎ ম্লান সকরুণ আননে এরূপ ভাব ব্যক্ত হইত যে, তাহা প্রথম দর্শনেই দর্শকের মনে ঝটিকাগ্রস্ত, ভূপতিত, অথচ অম্লান-সৌন্দর্য্য গোলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একটি করুণ সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিত। লর্ড মারভীল তৎপরে যখন মারসীর সহিত আলাপ করিয়া জগতে তাহার পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় অধিকতর দয়ার্দ্র ও সহানুভূতির ভাবব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন হইতে যে কোন বিষয়ে মারসীকে সুখী ও সাহায্য করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি মারসীর কথাবার্ত্তায় বুঝিয়াছিলেন যে, এই দীনা নিঃসহায়া বালিকার জীবনের এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষ, যে কোন ব্যক্তির স্নেহ-পক্ষপুট-ছায়া তাহার অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মারসী মারভীল কার্য্যের অবসানে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে যখন বাটী গমন উদ্দেশ্যে মাডাম লিগের বিপণি পরিত্যাগ করিত, ঠিক সেই সময়ে লর্ড মারভীল প্রথম দিনের সন্ধ্যাকালের ন্যায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন, এবং প্রথম পরিচয়ের সন্ধ্যাকালের ন্যায় প্রতি সন্ধ্যাকালেই কোন সাধারণ ভোজনাগারে তাহাকে নৈশাহারের জন্য লইয়া যাইতে লাগিলেন। লর্ড মারভীলের সযত্ন ও করুণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ন্যায় এরূপ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবা পুরুষের সহিত স্বাধীনভাবে মিলিত হওয়া যে সম্পূর্ণ দুষণীয় ও সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য, তাহা মারসী সে সময় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে যতদিন যাইতে লাগিল, এবং যতই লর্ড মারভীলের সহিত তাহার পরিচয় গভীরতর হইতে লাগিল, ততই লর্ড মারভীলকে তাহার একজন পরম আত্মীয়ের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

ক্রমে সে লর্ড মারভীলের নিকট তাহার আশৈশব সমস্ত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। উত্তর মেরু প্রদেশে ইনভেস্টিগেটর নামক জাহাজের সহিত সমাধিস্থ তাহাদের বংশের ইতিবৃত্তমূলক] কাগজপত্র অন্বেষণার্থ জীবিতকালে তাহার পিতা যে তথায় গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া

উঠিয়াছিলেন, কথায় কথায় সে কথাও সে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল। তাহাদের ইতিবৃত্তমূলক কাগজপত্র অন্বেষণ উদ্দেশে তাহার পিতা উত্তর মেরু প্রদেশে গমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন ইহা শ্রবণ করিয়া, এবং উভয়ের বংশ পদবীর সাদৃশ্য দর্শন করিয়া লর্ড মারভীল সর্ব্বদা রহস্যচ্ছলে বলিতেন "যদি উত্তর মেরু প্রদেশে সমাধিস্থ আমাদের বংশের ইতিবৃত্তমূলক কাগজ পত্র তোমার পিতা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা উভয় মারভীল পরস্পর যে পিতৃব্য ভ্রাতা ভগিনী তাহা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িত এবং নিশ্চয়ই একটা মহা কৌতুককর ব্যাপার সংঘটিত হইত।"

প্রথম পরিচয়ের একমাস পরে একদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড মারভীল মারসীকে একটি কনসার্ট পার্টিতে লইয়া যাইলেন। সেখানে তিনি তাঁহার বিবাহের দিন যে সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে, সে সংবাদ মারসীর নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। অদ্য হইতে আমাদের মধুর বন্ধুতার শেষ হইল। আমার বিবাহের পর আপনার সহিত আর আমার সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকিবে না, ইহাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। আজ হইতে আমাদের সুখময় সন্ধ্যা যাপন শেষ হইল।

সহসা লর্ড মারভীলের নিকট তাঁহার বিবাহের এই সংবাদ শ্রবণে মারসীর আনন শ্বেত প্রস্তরের ন্যায় রক্তহীন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"কোন্ সপ্তাহে আপনার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে"? লর্ড মারভীল তাহার কথার উত্তরে বলিলেন—

"আগামী সপ্তাহে আমাদের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে।" লর্ড মারভীলের বিবাহ-সংবাদে মারসীর বদন এরূপ ম্লান হইল যে, তাহা দর্শন করা লর্ড মারভীলের অসহ্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মারসীকে লইয়া বাহিরে আগমন করিলেন। যখন তাঁহারা মে মাসের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকদীপ্ত লণ্ডনের রাজপথে বাহির হইলেন, তখন পথের জনতা অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছিল। মেঘ ও কুয়াসাশূন্য আকাশে চন্দ্রের মধুর কিরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। বাহিরে আসিয়া লর্ড মারভীল মারসীকে তাহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"আজ শেষ দিন, আপনাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিবার আনন্দ প্রদান করিবেন কি?"

মারসী সম্মতি জানাইল। লর্ড মারভীল মারসীকে লইয়া তাহার বাটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে মারসী সাধারণ আবহাওয়া সম্বন্ধে দু একটি কথা ব্যতীত আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। তাঁহাদের মধুর বন্ধুতার ইহাই শেষ দিন, এই চিন্তা করিয়া লর্ড মারভীল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনিও পথে কোন কথা

বলিলেন না। নীরবে মারসীকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লণ্ডন নগরী হইতে কিয়ৎ দূরে সহরতলীর একটী ক্ষুদ্র ভবনে মারসী বাস করিত। সেখানে উপস্থিত হইয়া লর্ড মারভীল দ্বার উদ্ঘাটন করিলে, মারসী বলিল "আপনাকে চা পানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। অধিকন্তু আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে।" লর্ড মারভীল বিস্মিত হইলেন, কারণ তিনি পূর্ব্বে অনেক বার মারসীকে তাহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু মারসী তাঁহাকে কখন চা পানের জন্য আমন্ত্রণ করে নাই। তিনি মারসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করুন"। মারসী তাঁহার কথার উত্তরে বলিল—"তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। আমার প্রতি আপনার করুণার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া আপনাকে বিদায় দিতে পারি না"। লর্ড মারভীল বলিলেন "আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার কিছুই নাই। আপনি জানেন যে, যে কয়দিন আমি আপনার সহিত যাপন করিয়াছি, সেই কয় দিন আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন রূপে আমার হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে"। লর্ড মারভীল এই কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে মারসী মারভীলের করুণ অনুরোধ একেবারে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হইল। অগত্যা তিনি মারসীর চা পানের নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বৈটকখানা গৃহে গমন করিলেন। মারসী তাহার বৈটকখানা গৃহের গ্যাস প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। উজ্জ্বল গ্যাসালোক তাহার সুন্দর বদনে প্রতিফলিত হওয়াতে তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখাইতেছিল। লর্ড মারভিল নীরবে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে মারসীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মারসী বলিল "আপনি এতদিন পর্য্যন্ত আমার প্রতি যেরূপ করুণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। ভবিষ্যতে যতই দুঃখ কষ্টে আমি দিন যাপন করি না কেন, আমি জীবনে যে একবার সুখী হইয়াছিলাম, ইহা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। আমি বুঝিয়াছি যে, আমাদের এই চির বিদায়ের জন্য আপনারও অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আপনার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও করুণাপূর্ণ।

আপনার নয়নেই আপনার অন্তরের কথা আমি পাঠ করিতেছি। আপনার মনে এই ভয় হইতেছে যে, হয়ত আপনি আমার প্রতি এইরূপ দয়া প্রকাশ করিয়া আমার ইষ্ট করা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন। কেননা, আপনি জানেন যে, এরূপ সকরুণ ব্যবহারে আপনি

আমার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন। আপনি যখন আমাকে বলিলেন যে, আমাদের উভয়কে এক্ষণে পরস্পরের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, সেইক্ষণেই আপনার অন্তরের কথা জানিতে পারিলাম। আপনি আমার প্রাণে আঘাত প্রদান করিবার ভয় করিয়াছিলেন। আপনার চিরবিদায় গ্রহণ আমার পক্ষে কি নিদারুণ ঘটনা! তাহা এক্ষণে আর আপনার অজ্ঞাত নাই। আমার অন্তরের কাহিনী গুপ্ত রাখিয়া কেন আমি আপনাকে প্রবঞ্চিত করিব। যাহাহউক আপনি আমার জন্ম এই কারণে দুঃখিত হইবেন না। আমার প্রতি আপনার এই কৃপা আমার জীবনের একটি মহত্তম সুখের কাহিনী স্বরূপ চির-দিন স্মরণ রাখিব।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দান—এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ মিঃ কেরামৎহোসেন মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষার জন্ম এক লক্ষ আশী হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। কুচবিহারের মহারাজকুমারীর বিবাহ—কুচবিহারের মহারাজার মধ্যমা কন্যা কুমারী প্রতিভাসুন্দরীর সহিত মিঃ লায়নেল হেন্‌রী ম্যাণ্ডারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেন আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

৩। বার্লিন নগরে ময়রার দোকান—জর্ম্মণীর রাজধানী বার্লিন নগরে এক বাঙ্গালী যুবক গমন করিয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, প্রভৃতি মিষ্টান্নের দোকান খুলিয়াছেন। জর্ম্মণেরা নাকি ঐ সকল দ্রব্য পরম উপাদেয় বলিয়া ক্রয় করিতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ময়রাগণ যদি পৃথিবীর নানা দেশে গমন করিয়া এইরূপ মিষ্টান্নের দোকান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থ স্বদেশে লইয়া আসিতে পারেন।

৪। রমণী উকীল—রুষ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রুষ রমণীগণ অতঃপর আদালতে ওকালতী করিতে পারিবেন।

৫। লণ্ডনের "ষ্টাণ্ডার্ড" নামক পত্রে প্রকাশ যে তুলসি বহুরোগনাশক। তুলসী পাতার রস ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক।

৬। মহম্মদের চুল—মেসিডোনিয়া প্রদেশের এক নগরের নাম ভালকেট্রিন। এই নগরের মসজিদে সুলতান ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের দাড়ির একগাছি চুল দান করিয়াছেন।

৭। ভারতীয় ছাত্র—ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যার্থে লণ্ডন নগরে এক কমিটি আছে। সম্প্রতি এই

কমিটির প্রথম বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডে সতের শত ভারতবর্ষীয় ছাত্র অবস্থান করিতেছে। এক লণ্ডন নগরেই এক হাজার ছাত্র আছে। অন্ততঃপক্ষে যাঁহারা দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিবেন, তাঁহারা যেন ইংলণ্ডে আর ছাত্র না পাঠান। অতঃপর এই কমিটি বলিতেছেন যে, এখানে অনেক ছাত্রই সংস্বভাব বটে, কিন্তু আবার কতক ছাত্র এমন যে, তাহাদিগকে এখানে না পাঠাইলেই ভাল হইত।

৮। সিগারেট বন্ধ—আমেরিকর পেন-সিলভেনিয়া প্রদেশে সিগারেট এক রূপ উঠিয়াই যাইতেছে। তথাকার স্ত্রীলোকেরা ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

৯। অশোকের চিত্র—সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই সময় সম্রাজ্ঞী কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন তথায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত সম্রাট অশোক, মহিষী সহ সিংহাসনে বসিয়া, সমগ্র সম্পত্তি মুক্তহস্তে দরিদ্রদিগকে দান করিতেছেন, এই চিত্রখানি দেখিয়া মহিষী যারপর নাই প্রীত হইয়াছিলেন। চিত্রখানি তাঁহাকে সাদরে উপহার দেওয়া হইয়াছে।

নারীশিক্ষার উপায়—শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতীয় নারীদিগের শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যাকে শিক্ষাদান প্রণালী শিখাইবার জন্য ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। তিন হাজার টাকা বৃত্তি দিয়া এক একটী শিক্ষিতা নারীকে এই কার্য্য শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা তাঁহার লক্ষ্য। এই কার্য্যের জন্য ৭৫ হাজার টাকা মূলধনের প্রয়োজন। এই টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত বিলাতে শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের কতিপয় দৃশ্য প্রদর্শন করা হইবে।

১২। ল্যাম্পের পলিতা ২৪ ঘণ্টা ভিনিগারে ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলে নাকি ল্যাম্প জ্বালাইলে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা নিবারিত হয়।

১৩। পুরাতন সংবাদপত্র কোন পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া গোলকের ন্যায় করিলে উহা দ্বারা আগুন জ্বালাইয়া রাখা যায়। (২) চারাগাছের উপর কাগজ ঢাকা দিয়া রাখিলে উহা তুষার ও শীত হইতে রক্ষা পায়। (৩) কাগজ ভিজাইয়া কাঁচ পরিষ্কার করা যায়। (৪) কাগজ ভিজাইয়া কার্পেট মুছিলে ধুলা বালি অপসারিত হয়। (৫) কাগজ ভাঁজ করিয়া কার্পেটের নীচে রাখিলে কার্পেট ভাল থাকে। পুরাতন সংবাদপত্র এইরূপ অনেক কাজেই লাগান যায়।

১৪। পুরাতন পিত্তলপাত্র পরিষ্কার

করিতে হইলে তাহাতে কতক পরিমাণে তীব্র এমোনিয়া ঢালিয়া দিয়া ব্রুস দিয়া ঘর্ষণ করিয়া জলে ধৌত করিলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

বামারচনা।

রাজ-অভ্যর্থনা।

সুনীল সুন্দর ওই ভারতের ভালে
উদিল গো রাঙ্গা রবি রাঙ্গিয়া গগন।
শিশিরের শুভ্র বিন্দু গোলাপের দলে
পড়েছে যেন গো আহা মুক্তা মতন।
পাখীর কাকলি ওই সুললিত তানে
গাহিল সবার আগে আগমনি গীতি।
জাগিল বিমল হর্ষ সবাকার মনে।
উছলি উঠিছে আজি সবাকার প্রীতি।
সুদূর জলধি পারে তব বাসস্থান,
মহারাণী সনে আজি ওহে মহারাজ!
ভারতভূমিতে হলো শুভ আগমন,
বরিতে এসেছি তাই বঙ্গবালা আজ।

ভারত-প্রজার আজি মহাপুণ্য দিন,
হয় নাই বহু দন এ শুভ ঘটন।
মধুর ঝঙ্কারে ওই বাজিতেছে বীণ,
ভারতের প্রজা করে রাজদরশন।
এসহে সম্রাট্! এস এ পবিত্র ভূমে,
রামরাজ্য হইয়াছে একদা যেথায়,
জ্ঞান ধর্ম্ম বিভূষিত ছিল যেই ধামে,
আর্য্যপদরণু মিশি আছে যে ধূলায়।
মঙ্গল কামনা করি মোরা হেথা সবে।
চিরপূজ্য হও তুমি ওহে ভারতের,
অক্ষয় অমর কীর্ত্তি হোক তব ভবে।
গাহি মোরা জয়গান সুমধুর রবে।

কুমারী অমলা সান্যাল।

আকিঞ্চন।

(১)

আমি　রহিব অটল বুকে।
নিরাশ-পাথারে হলেও মগন
না হব আকুল দুখে।
হে চিরসহায়! হে চির-আশ্রয়!
তুমি সাথী যার কিবা তার ভয়?
না থাকুক পাশে আপনার জন
তুমি ত রয়েছ বুকে,
আমি　রব সদা হাসি মুখে।

(২)

আমি　করিব তোমারে ধ্যান।
গোপনে বিজনে, উষায় সন্ধ্যায়
খুলিয়া উদাস প্রাণ।
তব পদতলে এ ছার, জীবন,
চির তরে দেব! করিনু অর্পণ,
সুখ, দুখ, দুই তোমারি ত দান
কেনবা হইব ম্লান?
আমি　করিব তোমারে ধ্যান।

(৩)

আমি ভুলিব অতীত স্মৃতি
যাহা স্মরি আজো কাঁদে মোর হিয়া।
কিবা সে করুণগীতি!
ভুলিব আমার সুখের শৈশব,
আদর, যতন, প্রিয়জন সব,
জীবন-উষায় লভেছিনু যাহা
কত না গৌরবে নিতি।
আমি ভুলিব অতীত স্মৃতি।

(৪)

আমি বাঁধিব নবীনে প্রাণ,
দূরে রেখে যত যাতনা বেদনা,
ক্রোধ, হিংসা, অভিমান।
ভবের আঘাত নীরবেতে সয়ে,
নবীন উদ্যমে নব আশা লয়ে,
বাঁধিব আমার হৃদয়তন্ত্রী
বাজাব নূতন তান।
আমি বাঁধিব নবীনে প্রাণ।

(৫)

আমি হাসিব কুসুম সনে।
ঝরিবে নয়ন নীরবে গোপনে
হেরিয়া ব্যথিত জনে।
লহরের তানে নাচিবে এ প্রাণ,
বিহগের সনে গাব তব গান,
কল্পনার সনে ভ্রমিব হরষে,
খেলিব আপন মনে।
আমি হাসিব কুসুম সনে।
আমি না চাহি কিছুই আর।
চাহিবার আগে দিয়েছ সকলি,
ধন্য দয়া-পারাবার!
এ মিনতি শুধু প্রভু হে আমার,
চিরতরে কর আমারে তোমার,
বিষাদে, হরষে না যেও ত্যজিয়া
কৃপা করি কৃপাধার!
আমি না চাহি কিছুই আর।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

নারীশিক্ষা ১ম ভাগ (৪র্থ সংস্করণ) ৷৹	স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৵১০
ঐ ২য় ভাগ ৸৹	Christ's Sermon on the Mount (বাঙ্গালা অনুবাদ সহ) ⁄৹
কাম কুসুমিকা (নীতিগর্ভ ঐতিহাসিক উপন্যাস) ।৶৹	Theistic Compilations ।৹
বেদিয়া বালিকা (২য় সংস্করণ) ঐ ৶৹	বামারচনাবলী (কাপড়ে বাঁধা) ৸৹
কৃষকবালা (পদ্য) ॥৹	ঐ (কাগজে বাঁধা) ॥৹
বামাবোধিনী পত্রিকা (বাঁধান) ১৩০০ হইতে প্রত্যেক বর্ষের ২॥৹	নিত্যকৃত্য ১ম ভাগ ৵১০
আর্য্য মহিলা—শৈব্যা ৵১০	ঐ ২য় ভাগ ⁄৹
ধর্ম্মসাধন ১ম ভাগ ।৹	বনবাসিনী ⁄১০
ঐ ২য় ভাগ ।৶৹	সুকন্যা বিধুবালা ৶৹
	সরলা (কয়েকখানি অবশিষ্ট বিনামূল্যে)

* * ৫৲ বা তদধিক টাকার পুস্তক লইলে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপনের হার।

১। কভার, কভারের সম্মুখস্থ পেজ, বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকারের পেজের ও নিয়মাবলীর সম্মুখস্থ পেজ, এবং পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading Matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেক পেজ মাসিক " " " " " " " ৫৲

২। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ " " " " " " " ৩৲

অর্দ্ধ পেজ " " " " " " " ২৲

পেজের চতুর্থাংশ " " " " " " " ১॥৵

বিজ্ঞাপন এক বৎসরের অধিক কালের জন্য স্থায়ী হইলে মূল্য নিরূপণ জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম ও নগদ দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

৯ নং আন্টনীবাগান লেন. কলিকাতা।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵৹, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১।৵৹, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৲; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।৹ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে কিম্বা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণ কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন, নতুবা পত্রিকা না পাইলে আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে এজেণ্টের নিকট কেহ মূল্যাদি দিবেন না, দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিটি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৯ নং আণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। আমরা নিয়মমত বামাবোধিনীতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া থাকি। যদি কাহারও নাম প্রকাশিত না হয়, অবিলম্বে আমাদিগকে জানাইবেন।

৯। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরি-উক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোন প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৯ নং আণ্টনিবাগান লেন,
কলিকাতা।
১লা পৌষ, ১৩১৮।

নিবেদক
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সূচীপত্র।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

অগ্রিম।

ডাঃ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, কলিকাতা ২৸
শ্রীমতী বিধুমুখী সেনগুপ্তা, ঢাকা ২॥৵০
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব, দেরাদুন ২॥৵০
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত, কলিকাতা ২॥৵০
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর ২॥৵০
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভবানীপুর ২॥৵০
বাগবাজার রিডিং রুম্, কলিকাতা ১।৵০
শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া ২॥৵০
শ্রীযুক্ত প্রিয়ভূষণ রায়, কুচবিহার ২॥৵০
শ্রীমতী বধূরাণী কুসুমকুমারী, খণ্ডরুইগড় রাজবাটী ২।৵০
শ্রীমতী সৌদামিনী চৌধুরাণী, দিনাজপুর ২॥৵০
শ্রীযুক্ত বরদাদাস বসু, কার্ম্মাটার ॥৵০
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্ত, কলিকাতা ২।৵০
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর, দিনাজপুর ১।৵০
শ্রীযুক্ত মতিলাল আস, কলিকাতা ২।৵০
শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায়, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্ত মদনমোহন বসু, বলরামপুর ২॥৵০
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ২॥৵০

সাবেক।

শ্রীমতী বিধুমুখী সেনগুপ্তা, ঢাকা ২।০
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব, দেরাদুন ২॥৵০
শ্রীমতী কুসুমমালা দত্ত, কুমিল্লা ২॥৵০
শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গৌরীঘাট ২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য, রাজসাহী ২।৵০
শ্রীমতী অতুলকুমারী গুপ্তা, শিলচর ২॥৵০
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত, বানরীপাড়া ২॥৵০
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ কুণ্ডু, হাবড়া ৩৲
M. Hafez. Exy, Jessore ॥৵০
শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, এম্. এ, বি, এল্, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্ত প্রিয়ভূষণ রায়, কুচবিহার ২॥৵০
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, চট্টগ্রাম ২৸৵০
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর, দিনাজপুর ১।৵০
শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী আইচ, নোয়াখালী ৫৲
শ্রীমতী হেমকুসুম রায়, ভবানীপুর ২।৵০

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকার উপহার।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 581. January, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ. কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

৪৯ বর্ষ। ৫৮১ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩১৮। | ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—অযোধ্যার খাজুরগাঁওএর রাজা রাণা সার শিওরাজ সিং, কে, সি, এস, আই, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ পঁচিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই দান অতীব প্রশংসনীয়।

মৃত্যু—মহীশূর (Mysore) রাজ্যের দেওয়ান সার কৃষ্ণমূর্ত্তি পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। শাসনকার্য্যে ইনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

মাদক বিষয়ক প্রশ্ন—শুনা যায়, বিলাতে পার্লামেণ্ট সভার গত অধিবেশন-কালে অন্যতম মাননীয় সদস্য সার জন্ রবার্টস্ না কি ভারতে মাদক দ্রব্যের অতিশয় প্রচলন ও তৎপ্রতিবিধানমূলক কতিপয় প্রশ্ন করেন। ইহার উত্তরে সহকারী ভারত সচিব মণ্টেগু বাহাদুর না কি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ ইহার সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছেন। ছোট লাট ও গবর্ণর এ সম্বন্ধে যিনি যাহা ভাল বুঝিবেন, সেইরূপ করিবেন। এ বিষয়ে ভারত সচিব কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। জন সাধারণের হিতকল্পে যাহাতে মাদক দ্রব্য-সমূহ অনায়াসলভ্য না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

স্ত্রীলোকের কাজ।

কোন হিন্দু মহিলা যদি বাল্যকালে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিখেন, তাহা হইলে ত 'সোনায় সোহাগা' হইবে। উহাদ্বারা তাঁহার শিক্ষাশক্তি ও উপার্জ্জন অপেক্ষাকৃত অধিক হইবারই সম্ভাবনা।

আজ কাল আমাদের দেশের সহর, মফস্বল, সর্ব্বত্রই স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক দেখা যায়। কলিকাতার কলেজে পড়া নব্য যুবকেরা নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগিনীদিগকে শিক্ষিতা দেখিতে যেমন ব্যগ্র, পল্লীগ্রামের জমিদার বাবুরাও তাঁহাদের কন্যা, বধূ প্রভৃতিকে লেখা পড়া শিখাইতে তেমনি উৎসুক। সেই জন্য, হিন্দু মহিলা শিক্ষয়িত্রী হওয়ার উপযুক্ত বিদ্যাবতী ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইলে তাঁহাদের কার্য্যের অভাব থাকিবে না। অবশ্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরে কাজের বেশী সচ্ছলতা, আর উপার্জ্জনও অধিক।

কলিকাতায় কোন গৃহস্থের কন্যা ও বধূকে এক সঙ্গে সপ্তাহে দু ঘণ্টা পড়াইলে, মাহিনা মাসে ২৲ দুই টাকা, ছয় ঘণ্টা ৪৲ চারি টাকা, বার ঘণ্টা ৮৲ আট টাকা। তিন চারি জন একত্র পড়িলে দুই ঘণ্টা ৩৲ তিন টাকা, চারি ঘণ্টা ৫৲ পাঁচ টাকা এবং আট ঘণ্টা ১০৲ দশ টাকা। অবশ্য, লেখাপড়ার সঙ্গে সেলাই, বোনা ইত্যাদি শিখাইলে মাহিনা কিছু বেশী হয়। একজন শিক্ষয়িত্রী রোজ স্বচ্ছন্দে তিনটী পরিবারে ছয় ঘণ্টা শিক্ষা দিতে পারেন। আর তাঁহার যদি ঘর আটেক ছাত্রী থাকে ও সপ্তাহে গড়ে ত্রিশ ঘণ্টা খাটিতে হয়, তাহা হইলে তিনি মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। উহা হইতে পাল্কী-খরচ ১০৲ দশ টাকা বাদ দিলেও তাঁর আসল আয় ৩০৲ টাকা রহিল। বর্ত্তমান হিন্দু মহিলাদিগের পক্ষে মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা উপার্জ্জনই যথেষ্ট বোধ হইবে। কিন্তু শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে ছাত্রীদের বয়স ও বিদ্যা বুঝিয়া নিজ জ্ঞান ও বিদ্যার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

যদি তুমি উহাতে সক্ষম না হও, তাহা হইলে ঐ গুরু কার্য্যের দায়িত্ব লইও না। কিছু দিনের পর উহাতে অক্ষম বলিয়া লজ্জিত ও কার্য্যচ্যুত হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রথম হইতেই নিজ সাধ্যাতীত কাজে না যাওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ। বিশেষ, দুএকটী পরিবারে প্রথমে মনের মত শিক্ষা দিতে পারিলে তাঁহাদের অনুরোধে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কাজ পাইবারও অনেক সম্ভাবনা আছে।

স্ত্রীলোকেরা উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইলে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যেও তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারেন। অবশ্য উহার জন্য প্রথমে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিক শিক্ষা ও পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা সকলের মনে রাখা উচিত যে বিনা জ্ঞান-

লাভ ও পরিশ্রমে এ জগতে কোন ভাল কাজই সাধন করিবার শক্তি হয় না। সুতরাং কেবল অতি বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী ও শ্রমরতা নারীরাই উচ্চ শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে, ইচ্ছা ও সুবিধা থাকিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী হইতে পারেন। আমরা বাল্যকাল হইতে নিজেকে যে ভাবে প্রস্তুত করি, বয়সকালে সেইরূপই হই। শৈশবে ও বাল্যে যদি আমরা একাগ্রচিত্তে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জনে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে পরিণত বয়সে আমরা নিশ্চয়ই জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা নারী হইব। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের বাল্য-জীবন যদি কেবল পুতুলখেলা ও নানা-রূপ কুসংস্কারের মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে যৌবনে আমরা এক এক জন অলস, নিদ্রাপ্রিয় ও অজ্ঞ স্ত্রীলোক হইয়া উঠিব।

স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। উহার জন্য জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বলেরও একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় উহাতে এত খাটিতে হয় ও বকিয়া বকিয়া এত বিরক্তি ধরে যে, এই-রূপে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জন অতি কষ্টকর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, উহাতে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক। কিন্তু একদিক দিয়া দেখিলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ যেমন অতিশয় বিরক্তিজনক, আমোদ-আহ্লাদ-শূন্য, এবং মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের বলনাশক বলিয়া বোধ হয়, অন্য দিক দিয়া দেখিলে উহা তেমনি একটী মহৎ কাজ বলিয়া প্রতীয়-মান হয়। উহা দ্বারা আমরা কি কাটাবন, কি মরুভূমি, কি কঙ্করময় প্রদেশ, সর্ব্বত্রই বীজ বপন করি।

তবে ঐ বীজ হইতে কখন কি প্রকার ফল ফলিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিশেষতঃ, অন্যকে জ্ঞান ধর্ম্মের প্রভাব বুঝাইবার সুযোগ শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শিক্ষয়িত্রী যদি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত নিজের কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষা দ্বারা কত সুপ্রবৃত্তি উৎপাদিত ও চরিত্র উন্নত হইয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার উপর তিনি নিজ জ্ঞানবলে ঐ জীবিকার উপায়কে যখন উচ্চ কর্ত্তব্য কাজ করিয়া তুলিতে পারিবেন, তখন ঐ সাধন তাঁহার স্বর্গের সোপান স্বরূপ হইয়া ক্রমে তাঁহাকে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিবে।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণ।

("পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের আরও কয়েকটী উন্নতির জন্য ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমরা বিশেষরূপে ঋণী। এখানে সংক্ষেপে সেই গুলির উল্লেখ করিব।

স্ত্রীশিক্ষা—ইহার স্বপক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ স্ত্রীজাতির প্রতি জনসাধারণের অধিক আদর ছিল না এবং এখনও নাই। স্ত্রীলোকদের যে লেখা পড়া শিখা আবশ্যক, এ কথা সকল শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পক্ষে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, সকলেরই যতদূর সম্ভব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নিতান্ত আবশ্যক. ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম অগ্রসর হন। সমাজ ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের পথ অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা দূরে রহিয়াছে। বিশিষ্ট স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচারের এখনও অনেক বিলম্ব। যাহা কিছু হইতেছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মদের দেখাদেখি। দেশে যে কয়টী খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত সম্পর্কহীন উচ্চতর বালিকা-বিদ্যালয় আছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

অবরোধ-প্রথা—ইহা দেশের পল্লীগ্রামে কখনও পূর্ণ মাত্রায় ছিল না। সহর অঞ্চলেই উহার প্রচলন সচরাচর অধিক। আজ কাল উহার যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা যায়, তাহার পথপ্রদর্শক ব্রাহ্মসমাজ। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেক মর্য্যাদাপন্ন গৃহস্থের বাটীর মহিলাদের মধ্যে ঘোড়ার গাড়ী চড়ার পদ্ধতি পর্য্যন্ত ভাল প্রচলিত ছিল না। এখন সেই সকল বাটীর স্ত্রীলোকেরা গাড়ী চড়িয়া যাদুঘর, পশুশালা প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এবং সার্কস ও নাট্যমন্দিরেও যাইতেছেন। পুরীতে এখন তাহাদিগকে দলে দলে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে দেখা যায়। মধুপুর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে রাস্তা ঘাট, পাহাড় ও পর্ব্বতে এখন পুরুষাপেক্ষা মহিলাদিগেরই বেশী সমাগম, এমন কি ইংরাজবহুল দার্জ্জিলিংএর পাহাড়েও তাঁহারা নিতান্ত বিরল নহেন। অল্পে অল্পে সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে যে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার প্রতি অনেকের লক্ষ্য নাই। এই সব সামাজিক বিষয়ের প্রতি যাঁহারা একটু মনোযোগ দেন, তাঁহারা ৫০ বৎসর পরে অবরোধ-প্রথার কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারেন। নীরবে এই যে পরিবর্ত্তন চলিতেছে ইহার মূলে ব্রাহ্মসমাজ।

বাল্যবিবাহ সমাজের উচ্চতম স্তরে অতি অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ প্রথা অল্পে অল্পে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোন ভদ্রঘরে দশ বৎসরের বালিকা অবিবাহিত থাকিলে নানা দিক হইতে নিন্দাবাদ ধ্বনিত হইত। এখন যেখানে সহরের ঢেউ পৌঁছিতে অনেক সময় লাগে, এমন সুদূর পল্লীগ্রামেও ১২।১৩ বৎসরের অবিবাহিত কন্যা নিতান্ত বিরল নহে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সব বংশ কুলমর্য্যাদার গৌরব করেন, তাঁহাদের মধ্যেও ১৩।১৪, এমন কি কখন কখন ১৫ বৎসরের অবিবাহিতা বালিকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইবার নানা কারণ। তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন এখানে নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে কন্যা একটু বেশী বয়সে বিবাহিতা হইলে যে কিছুই ক্ষতি হয় না, এবং ইহা যে ঊর্দ্ধতন পুরুষদের নিরয়গমনের অন্যতম কারণ নহে, তাহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এখন বুঝিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ক্রমে সমাজের নিম্ন স্তরে অনুসৃত হইবে। বালিকার বিবাহের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে বালকের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকার সহিত ১৭।১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ যে অসঙ্গত, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে অনেক যুবক ২০।২১ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে আর বিবাহ সুখ অনুভব করিতে পারেন না। এই যে আস্তে আস্তে পুত্র কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি, ইহার জন্য আমরা কি কিয়ৎ পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের কাছে ঋণী নই? ব্রাহ্মসমাজ ইহার পথ দেখান এবং নানা কারণে হিন্দুসমাজ সেই পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহ—ইহা যে হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে সমাজের কতক লোক ইহার প্রতি কিছু অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে না, ইহা জোর করিয়া আর বলা যায় না। বিধবা-বিবাহ যে কোনরূপে অন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ নহে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিশিষ্টরূপে হইয়াছে। বাহিরে স্বীকার করুন আর নাই করুন, যে সকল হিন্দু এখন ইহার প্রতিকূল নন, তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষা ও কার্য্য দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্ররোচিত হন নাই, এ কথা কোন নিরপেক্ষ লোক বলিতে পারেন না।

বহুবিবাহ হ্রাস—ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুসমাজে ইহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। একেবারে ইহা আজও উঠিয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের

ভিতর ইহা ঘৃণার চক্ষে লক্ষিত হইতেছে। বিবাহের প্রতি, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতি এখন আমরা নূতন ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়েও কতকটা আমাদের পথপ্রদর্শক। বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বহুবিবাহ ব্রাহ্ম-সমাজের বিবাহের আইনবিরুদ্ধ।

সার্ব্বজনিক ভাব আমাদের মধ্যে অতি অল্পে অল্পে একটা সার্ব্বজনিক ভাব আসিয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। হিন্দু হউন বা মুসলমান কি খ্রীষ্টান হউন, ব্রাহ্মণ হউন বা নমঃ-শুদ্র হউন, আমরা সকলে বাঙ্গালী এবং সেই জন্য এক মাতার সন্তান, সকলেই ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, এইরূপ ভাব দেশের কতকগুলি লোকের মনে উদয় হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা করা যায় যে, দেশবৎসলতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের দল ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য দেশের যে কখনও কোন উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুসমাজ জাতি-ভেদ প্রথারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহাতে "বার রাজপুত তের হাঁড়ী।" ফল দাঁড়াইয়াছে আমাদের মধ্যে পৃথক্ ভাব বড়ই প্রবল। একজন নিম্ন শ্রেণীর লোক একজন উচ্চ শ্রেণীর লোকের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে, ইহা অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোক কল্পনাতেও আনিতে অক্ষম। বৌদ্ধ-যুগে এই পৃথক্ ভাবের, এই অনুদার ভাবের অপনয়নের চেষ্টা হয়। চৈতন্যদেব যখন তাঁহার প্রেমময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখনও এইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ফল কতদূর হইয়াছে সকলেই জানেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই চেষ্টা আবার হইতেছে। দেশের কতকগুলি লোকের মনে এই সার্ব্বজনিক ভাবের উদয় হইয়াছে। এক মাতৃভূমির সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জন্মান একান্ত আবশ্যক, নতুবা তাহাদের উন্নতি অসম্ভব। এই ভাবের জন্য ইংরাজী শিক্ষার নিকট আমরা যে বিশেষরূপে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে ইহার বিস্তৃতির জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতেও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কাল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে উত্তোলন করিবার কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে; যাহাতে তাহারা সমাজ হইতে চলিয়া না যায়, এরূপ ইচ্ছা অনেকের মনে উদয় হইতেছে। এই ইচ্ছা এবং এই চেষ্টার মূলে যে ব্রাহ্মসমাজ রহি-য়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। দেশের মধ্যে ভ্রাতৃভাববিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

বাঙ্গালা সাহিত্য—ইহা কি ব্রাহ্মসমাজের নিকট কোন বিষয়ে ঋণী নহে? অনেকে বলিবেন এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? রাজা রামমোহন রায় প্রথমে বাঙ্গলা ব্যাকরণ লিখিতে চেষ্টা করেন।

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উচ্চ সাহিত্য দেশোন্নতির প্রধান সহায়। তিনিই বাঙ্গালা গদ্য লিখনপদ্ধতির প্রবর্ত্তক। তাঁহার গদ্যে ও আজকালকার গদ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু রাজা যখন গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল ইহা যদি একবার ভাবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে তাঁহার পথে কিরূপ বাধা বিঘ্ন ছিল। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ছিল বলিয়াই তিনি সে সকল বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের কিছুদিন পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের এক অক্ষয়কীর্ত্তি। বঙ্গের সাহিত্য জগতে উহা এক নবযুগ আনয়ন করে। উহার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত কিরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা বর্ণনা করা এখানে অনাবশ্যক। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তিনি উহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। তার পর কতকগুলি অতি উচ্চ-ভাবপূর্ণ সুললিত বা গম্ভীর ধর্ম্মসঙ্গীত যে বঙ্গভাষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে পাইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। উচ্চ অঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীতে দেশ প্লাবিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আর এক কথা—বাঙ্গালা ভাষায় যে সুন্দররূপে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া এবং ওজস্বিনী বক্তৃতা করা যায় ইহাও আমরা প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের নিকট শিক্ষা করি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকেরা উহা প্রবর্ত্তিত করেন, সন্দেহ নাই। বিদেশীয় বলিয়া তাঁহারা উহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালায় ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা জীবনশূন্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ উহাকে জীবনী শক্তি প্রদান করেন। হিন্দুসমাজ এখন বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ ও বক্তৃতা দেওয়া পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

(৬)

আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আমার যে আর অধিক কিছু বলিবার আছে তাহাও মনে হয় না। অতএব প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক ব্রাহ্ম-সমাজ আমাদের কি করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার ফল, এ কথা সকলেই জানেন এবং উপরেও ইহা বলা হইয়াছে। কাজে কাজেই যে সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা নিদানপরম্পরা সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলা যাইতে পারে। অনেকে ইংরাজি শিক্ষার নানা প্রকার দোষ দেন বটে, কিন্তু উহা হইতে আমাদের যে বহুল উপকার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত নাই, এবং কোন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহা অস্বীকার করিবেন না। এক কথায় বলিতে

গেলে ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি আমাদের সমাজের বর্ত্তমান উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ইংরাজী শিক্ষাই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আর কি করিবার ছিল? উত্তরে এই-মাত্র বলা যাইতে পারে—ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ—সব পরিবর্ত্তন ও উন্নতিকে দেশী ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করা। কোন কোন পরিবর্ত্তন দেশী ছাঁচে ঢালা না হইলে দেশগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অতি অল্পই ছিল। ঐ সময়ে শিক্ষিত সমাজ কোন্ দিকে পরিচালিত হইতেছিলেন তাহার আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় না হইলে প্রাগুক্ত সমাজ কোন দিকে ভাসিয়া যাইত, তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় অনেকগুলি উন্নতি ও পরিবর্ত্তন বিদেশীয় গন্ধে দূষিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের বহুল চেষ্টার ফলেই সেই গন্ধের দূরীকরণ সংসাধিত হয়, এবং এখন যে সেগুলি অনেকটা দেশীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহার মূল ব্রাহ্মসমাজ। উন্নতি দেশীয় ছাঁচে ঢালা না হইলে বিফল হইবে, এবং জনসাধারণ উহা গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন। দেশের লোকের মন আকর্ষণ করিতে না পারিলে সকল উন্নতির চেষ্টা পণ্ডশ্রম হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবস্থায় লোকে ইহা বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। ইংরাজী শিক্ষিত দল বোধ হয় সাধারণ সমাজের কথা ভাবিতেনই না, কিম্বা মনে করিতেন ক্রমে তাঁহারা উহা হইতে পৃথক্ হইয়া না বিলাতী না দেশী এক অভিনব দল হইবেন। তাঁহাদের মন হইতে এই হাস্যোৎপাদক ভ্রম দূর করিবার মূল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ ইংরাজী শিক্ষার সুফলগুলিকে যতদূর সম্ভব দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করেন। সব সময় উহা যে জ্ঞানতঃ করা হইয়াছিল এরূপ মনে হয় না। সব সময় যে ঠিক প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাও মনে হয় না। তবে অনেক পরিমাণে যে সে চেষ্টা করা-হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের যে কোন ভুল হয় নাই, বা কোনরূপ দোষ নাই, এ কথা বলি না। সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা কি উপকার পাইয়াছি তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সকল চিন্তাশীল লোকেই স্বীকার করিবেন যে, অতীতে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, বর্ত্তমানেও হইতেছে। ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারি না।

দে

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হরিশপুরে অদ্য মহাধুম। জমিদার নবকিশোর বাবুর পৌত্রী নীরজার বিবাহ। উৎসবের আলোকে গ্রামের বৃক্ষগুলি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। অনবরত বাদ্য ও জনকোলাহলে কাহারও ভাষা বুঝা যাইতেছে না, কেবল একটা কর্ণ-বধিরকারী তুমুল শব্দ, আলোক, এবং জনসমূহের চাঞ্চল্য একটা মহা সমারোহের ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

যথাসময়ে বাদ্য ও কোলাহল দ্বিগুণ হইল। চতুর্দ্দোলে চড়িয়া একটি অজাতশ্মশ্রু বরবেশী বালক আসিয়া সভায় বসিল। নবকিশোর বাবু নবজামাতার চাঁদমুখখানি দেখিয়া আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিমলাচরণের একেবারে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি একটী নিভৃত কক্ষে একজন প্রিয়তম বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বন্ধু বলিলেন "কিহে বিমলা, এই বুঝি এডুকেশন? একটা অপগণ্ড বালকের সঙ্গে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার এইরূপে বিবাহ দিয়া বুঝি সমাজসংস্কার করিতেছ? ভারতের সর্ব্বনাশকারী বাল্যবিবাহ রোধ ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়াছিলে, সে সব দীর্ঘ ছন্দে বক্তৃতা, দীর্ঘশ্বাস, সমাজের দুঃখে অশ্রু-বিসর্জ্জন সব বুঝি (Messএর teapot) মেসের চা-দানীর ধোঁয়ার মেঘে জমিয়াছিল?" বিমলাচরণ চশমাটা নিষ্কারণে খুলিয়া, মুছিয়া, গোঁপ দাড়ীটা চুমরাইয়া আবার তাহা পরিয়া বলিলেন "কি করি বল ভাই? তাঁহাদের মতে নীরজার বিবাহ দেব না, এই কথা বলাতে বাবা একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন 'তাহা হইলে তোকে ত্যাজ্যপুত্র করিব জেনে রাখিস্।' বাবার যে কথা সেই কাজ, জান তো ভাই, কাজেই চুপ করিতে হইল। বাবা বর্ত্তমানে আমার কোন আশাই পুরিবে না।" বন্ধু বলিলেন "হাঁ, ত্যাগ করা অমনি মুখের কথা।" বিমলাচরণ বলিলেন "সে কথা পরে হবে, বাবা হয়তো এখনি ডাক্‌বেন। অমন বিবাহ আমি দিতে পারিব না; চল একটু রাস্তায় গিয়া বেড়াই।" বন্ধু বলিলেন "সে ভয় করিও না, সাত বছরের গৌরীদানের ফলে তোমার বাবা তোমাকে ভাগ বসাতে ডাকিবেন না।" "তা না হলেও হয়তো দেখ্‌তে ডাক্‌বেন, চল একটু ও দিকে যাই।" দুই জনে বাটী হইতে বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। কর্ত্তা নবকিশোর বাবু শুনিয়া বলিলেন "ওটা উচ্ছন্ন গেছে।"

বিবাহ আরম্ভ হইল। নীরজার শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া আর একখানি শুভ্র কোমল হস্তে বাঁধিয়া দিবার সময় নব-

কিশোর বাবুর চক্ষে অনাহূত এক ফোঁটা অশ্রু আসিয়া পড়িল, তাঁহার আদরের গৌরী আজ পরের হইল বলিয়া না কি?

বিবাহের পরে বর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নবকিশোর বাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন। নীরজা তখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিনের উপবাসে ও একটা অজ্ঞাত আনন্দ ও শ্রমে তাহার শুভ্র সুন্দর কচি মুখখানিতে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের পাতার উপর একটা ম্লান ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর বাবু সস্নেহে তাহার স্বেদসিক্ত ক্ষুদ্র ললাটে চুম্বন করিলেন। অস্ফুট আশীর্ব্বাদ তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে পুরোহিত-প্রমুখ সকলের চীৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্না বালিকা চমকিয়া উঠিল। নবকিশোর বাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, বরণডালার প্রদীপের উপরে নীরজার বস্ত্রের স্বর্ণাঞ্চল পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

অন্য কেহ তাহাদের নিকটে না আসিতে আসিতেই বর নীরজার অঞ্চল টানিয়া লইয়া হস্তস্থ দর্পণের আঘাতে ও ফুৎকার দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। নীরজা দেখিল তাহার বরটাতো বেশ সাহসী। বরও সেই সময়ে একবার সভয় ও চকিত দৃষ্টিতে তাহার বধূর মুখখানি দেখিয়া লইল। অগ্নি-নির্ব্বাণের পরেও সে দুই তিন বার চোখ তুলিয়া কন্যার দিকে চাহিয়াছিল।

অগ্নি নিভিল, কিন্তু নবকিশোর বাবুর মনের ধূমরাশি মিলাইল না। একি অলক্ষণ!

তাহার পরে নীরজা শ্বশুরবাড়ী যাইল। তিন চারি দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া নবকিশোর বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে, আমার বাবার জন্যে কত কান্না পেত, দাদার জন্যে কান্না আস্‌ত, সব চেয়ে তোমার জন্যে কাঁদতাম, আর মন কেমন কর্‌ত। আর আমায় সেখানে পাঠিও না, দাদা বাবু"। নবকিশোর বাবু কাতর হইয়া বলিলেন "ছি দিদি, ও কথা বলো না, কেমন সুন্দর শাঁখা পরেছ, সিঁদুর পরেছ! আরে তারা আমার দিদিকে যে একেবারে মেয়ে মানুষ সাজিয়ে দিয়েছে! দেখি দেখি!" লজ্জায় নীরজা দাদা বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

চারি মাস পরে সপ্তমী পূজার দিন নবকিশোর বাবু পূজান্তে নীরজাকে কোলে লইয়া নিকটে নবমবর্ষীয় পৌত্র সুরেন্দ্রকেও লইয়া বসিয়া আগমনীর শানাইয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন এবং ভক্তির উচ্ছ্বাসে এক একবার কাঁদিয়া ফেলিতেছিলেন। কারণ না বুঝিয়াও দাদাবাবুর চোখে জল দেখিয়া নীরজার চোখেও জল আসিয়াছিল। চারি দিকে আনন্দ-কোলাহল। সহসা একখানি পত্র আসিল, সংবাদ "—জামাতা ব্রজনাথ মারা গিয়াছে।" নবকিশোর বাবু কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরজাকে ক্রোড়ে করিয়া একটা কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বাহিরের ক্রন্দন-কোলাহল শুনিয়া নীরজা কারণ জানিতে যাইতে চাহিলে তাহাকে বক্ষে

চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "দিদি তুই এই-খানে থাক্, বাহিরে যাস্‌নে।" প্রতিমার সেই সপ্তমী পূজার দিন ভিন্ন আর পূজা হইল না। জমিদারবাড়ীর দুর্গোৎসব সেই হইতে বন্ধ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে বিমলাচরণ শোকাকুল হইয়া নবকিশোর বাবুকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। নবকিশোর বাবু একটীও উত্তর না দিয়া নীরবে সুধু অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। শেষে বিমলাচরণ বলিলেন "আমি আপনার নিকট হইতে চলিলাম, উপার্জ্জনক্ষম হইলে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যাইব। আপনি অল্প বয়স হইতে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বালক-বয়সে আমার বিবাহ দিয়া আমার সমস্ত জীবন অসার করিয়া দিয়াছেন, তাহা না হইলে এত অল্প বয়সে আমাকে এরূপ সাধারণ বঙ্গবাসীর মত জীবনের সূত্রপাত দেখিতে হইত না। আমি কি আশা করিয়াছিলাম, আমি কি হইতাম তাহা আপনাকে আর কি বলিব, আপনার অদৃষ্টে সেইরূপ পুত্র নাই, তাই আমার সর্ব্বনাশ করিলেন। যাক্ আমি চলিলাম, আপনি জাতিকুল লইয়া থাকুন।" মর্ম্মাহত নবকিশোর পুত্রের হাত ধরিলেন। পুত্র শুনিল না, যাইবার সময় বলিয়া যাইল "নীরজাকে তাহার বৈধব্যের কথা বলিবেন না, আমি আপনার ন্যায় নির্ম্মম নই, আমি তাহার পিতা, তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব। বিমলাচরণ উপার্জ্জনেচ্ছায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। নবকিশোর বাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন। পৌত্র সুরেন্দ্রের অপেক্ষা নীরজাকে তিনি অধিক ভাল বাসিতেন।

বিমলাচরণ বলিয়া গিয়াছে "নীরজাকে বৈধব্যের কথা জানাইও না"। নবকিশোর বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিলেন ইহা না জানাই ভাল, যতদিন না বুঝে সুখে থাকিবে। তবে বিমলাচরণের শেষের কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না।

প্রথমে যখন নীরজার সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া ও নোওয়া খুলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। কান্না-কাটীতেও সে ততোধিক বিস্মিত হইল। তাহার মাতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বেশী কাঁদিয়া উঠিলেন, সেইজন্য আর নীরজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। একদিন ভয়ে ভয়ে তাহার দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যখন দেখিল দাদাবাবুও মুখ ঢাকিল, তখন সে তাহার কৌতুহলবৃত্তি প্রশমিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সে সব ভুলিয়া গেল। সুন্দর বরটীর কথা বিবাহের পর প্রথম প্রথম কয়েক দিন মনে পড়িয়াছিল, তারপরে একটী খেলানা পাইলে শিশু যেমন হারান খেলানাটী ভুলিয়া যায়, নীরজাও তেমনি বরটীর মুখ-খানি বিস্মৃত হইয়াছিল। তবে যখন তাহার বরের কথা সকলে বলিত, তখন সে জানিত তাহার বর বলিয়া কিছু ছিল।

তাহার পরে সে সব কথা আর কেহ বলিত না, কাজেই সেও তাহাকে ভুলিয়া গেল। মনে করিয়া দিবারও কেহ ছিল না, কেননা নবকিশোর বাবু কোনও বালক বালিকার সহিত তাহাকে খেলিতে বা মিশিতে দিতেন না। নীরজার জ্ঞানের উন্মেষ হইলে ভ্রাতা সুরেন্দ্র ও দাদাবাবু তাহার খেলার, গল্পের, আমোদের ও হাসির সঙ্গী, এখনও তাহাই।

নবকিশোর বাবু পূর্ব্বে তাহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন, এখনও তিনি একাগ্রচিত্তে নীরজার শিক্ষার দিকে যত্ন করিতে লাগিলেন। যেমন পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন, সেই সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, সীতার বনবাস, রামবনবাস প্রভৃতি পড়াইতেন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে বাগানে গঙ্গার সোপানে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে দুই দিকে বসাইয়া আপনি মধ্যে উপবেশন করিয়া কত নীতিপূর্ণ পৌরাণিক গল্প বলিতেন। কেমন করিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুব পদ্মপলাশলোচনকে আকুলপ্রাণে ডাকিতে ডাকিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দুঃখিনী মাতার করুণ বিলাপ শুনিয়া কেমন করিয়া গাছের পাখীগুলাও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমার প্রহ্লাদ হরির নামে সর্ব্বত্যাগী হইয়া কত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। রাজকন্যা সীতা ও সাবিত্রীর কথা, তাঁহারা কেমন করিয়া পিতা, মাতা, শ্বশুর, শশ্রূ, পতি ও আত্মীয় স্বজনকে প্রীত করিয়াছিলেন। রাজকন্যা হইয়া তাঁহারা কত কষ্ট সহিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সাবিত্রী যমের নিকট হইতে মৃত পতিকে বাঁচাইয়াছিলেন, ইত্যাদি বহু নীতি ও ভাবপূর্ণ কথা নবকিশোর বাবু গম্ভীরকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিতেন। কখন কখন নবকিশোর বাবু রামবনবাসের ও সীতাবিসর্জ্জনের ছবি আনিয়া সেই শোকাবহ ঘটনার গল্প বলিতেন। তখন নীরজা শোকাভিভূত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া সত্য সত্যই কাঁপিয়া উঠিত। আবার রামের বন হইতে পুনরাগমন, রাজ্যপ্রাপ্তি, সীতা উদ্ধার শুনিয়া শান্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিত। রাত্রিকালে সেই সকলই স্বপ্নে যেন প্রত্যক্ষ দেখিত।

প্রভাতে নবকিশোর বাবুর সহিত পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া নীরজা তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। নবকিশোর বাবু চন্দনের কৌটা পরিয়া তাহাকে একটী পরাইয়া দিতেন। তখন নীরজা পড়িতে বসিত। নবকিশোর বাবুর পত্নী বর্ত্তমান ছিলেন না, সুতরাং নীরজার মাতাই গৃহিণী।

বাহিরে ভিক্ষার্থী আসিলে নবকিশোর বাবু তাহাকে অন্দরে ডাকিয়া আনিতেন। নীরজা মহানন্দে তাহাকে নিজে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইত। পরে তাহার প্রার্থিত দ্রব্য নীরজার হাত দিয়া তাহাকে দান করাইয়া নবকিশোর বাবু তাহাকে বিদায় দিতেন। নীরজার আনন্দে নবকিশোর বাবু ক্রমশঃ সব দুঃখ ভুলিতে

লাগিলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিসে এই কোমল কলিকাটির গায়ে সংশয়ের একটুও রৌদ্র না লাগিতে পারে। তাই নিজের বিশ্বাস, চেষ্টা ও পবিত্রতার দ্বারা নীরজার মুকুলসদৃশ জীবনটি ধীরে ধীরে প্রস্ফুট করিতে লাগিলেন। হায় নির্ব্বোধ মানব! কার্য্য-কারণপরম্পরাগ্রথিত নিয়তির যে গতি, তোমার কি সাধ্য তাহা রোধ কর! বৃথা আকুল চেষ্টায় ব্যাকুলপ্রাণে নিয়মের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছ।

এমনি করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রকে বিমলাচরণ এক বৎসর পরেই কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। সেখানে বিমলাচরণ ওকালতি করেন, এখন বেশ পসার হইয়াছে। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পাঠাইবার জন্য পিতাকে লিখিয়াছিলেন। নবকিশোর বাবু কোন উত্তর না দেওয়ায় পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে, আমি পূজার বন্ধে গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিব, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

প্রার্থনা।

হৃদয়মন্দির মম তোমারি নিলয়ভূমি,
কোথায় খুজিনু বৃথা আমারি অন্তরে তুমি।
এস নাথ প্রকাশিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ,
জীবনের ভুল ভ্রান্তি হয়ে যাক অবসান।
যখন তোমারে খুঁজে ভ্রমিলাম বিশ্বমাঝ
অন্তরে নীরবে বসে দেখেছিলে বিশ্বরাজ।
হৃদয় ভকতি পুষ্পে সযতনে মালা গাঁথি
কাহারে পরাব ভেবে কাটায়েছি
সারা রাতি।
ফিরেছি মন্দিরদ্বারে হাতে লয়ে গাঁথা মালা
রুদ্ধদ্বার খোলেনি ত বৃথা চলে গেছে বেলা।

এখন শুকাল ফুল নাহিক সুরভি আর
কি দিব কি আছে মম আছে মাত্র ভক্তি হার।
লহ নাথ লও তুলি দাও ও চরণে স্থান,
দীনের এ তুচ্ছ দানে করিও না প্রত্যাখ্যান।
যখন খুলেছ দ্বার তখন দিয়েছ দেখা,
রোধিও না দ্বার পুনঃ আঁধারে রেখ না
একা।
তোমারি মন্দিরে বসি তোমারে পূজিব
আমি।
সে পূজা অন্তরে তুলে নিও তুমি অন্ত-
র্য্যামি!

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

ভ্রমণ-কাহিনী।

(একজন বন্ধুর কথা।)

আমার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখন আমি পুরীতে ছিলাম। প্রায়ই প্রত্যহ জগন্নাথদর্শন হইত। বিমলা দেবীর রাঙ্গা পা দুখানিতে রাঙ্গা জবার অঞ্জলী দিতে কি ভালই লাগিত। আর কি সুন্দর সমুদ্র, তাহার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কত সুন্দর সুন্দর ঝিনুক কুড়াইতাম। সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে কত লুটাপুটি খাইতে হইত। স্নানের সময় তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইত। এক দিন আমি ও আমার বন্ধু রমেশ খণ্ডগিরি দেখিতে গিয়া, তাহার অদূরস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। ইহা যে দেবস্থান, দেবস্থানের মধ্যে হিংসা অনুচিত, সে কথা যেন কে ভুলাইয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল এমনি সময় আমরা একটী হরিণ দেখিতে পাইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া হরিণটী প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। দুই দিক হইতে দুইজনে তাহাকে তাড়া করিলাম। আমাদের দুই জনেরই হাতে দুইটি বন্দুক ছিল। দুই জনেই একসঙ্গে গুলি করিলাম। আহত হইয়া একবার মাত্র সে আমাদের দিকে চাহিয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল। তাহার বড় বড় চোখ দুইটীতে কষ্টের চিহ্ন মিলাইয়া গেল। এমন সময় একটী গর্জ্জনশব্দ শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখি "এক প্রকাণ্ড ভাল্লুক"। ভয়ে আমাদের তো শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। আমি রমেশকে বলিলাম "এখনই আমরা নির্দ্দোষ হরিণটিকে মারিলাম তাহারই ফল পাইতেছি, যাহা হউক সাহসে বুক বাঁধ"। আমি সাহসে ভর করিয়া বন্দুক উঠাইলাম। রমেশও উঠাইল, কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাল্লুকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলাম। আমার গুলি মস্তকে না লাগিয়া পৃষ্ঠে লাগিল, কিন্তু রমেশের গুলি ভাল্লুকের মাথায় লাগিল। তখন ভাল্লুক চিৎকারে বন কাঁপাইয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। আমরা আবার গুলি করিলাম, ভাল্লুক মরিয়া গেল। আমরা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, আমরা রক্ষার অযোগ্য হইলেও তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নাই, হরিণটীর সেই দৃষ্টির কথা মনে করিয়া প্রাণে কষ্ট হইল। ভাল্লুক ও হরিণ মারিয়াছি, বাড়ী

আসিয়া সকলের নিকট গল্প করিলাম, কিন্তু আহ্লাদ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, এখনও মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হয় যে, নির্দ্দোষ হরিণটীকে খেলার ছলে হত্যা করিয়াছি, তাহার ফলে আমাদেরও সেই রকম তাড়া খাইয়া মরিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

(১১ বৎসরের বালিকা।)

মারসী মারভিল্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"তাহা হইলে আমাকে শীঘ্রই মরিতে হইবে, আর—"। লেডি পমরয়ের ভ্রাতা লেডি পমরয়কে এরূপভাবে অনর্গল বকিয়া যাইতে শুনিয়া ভর্ৎসনাসূচক স্বরে বলিলেন "কি মিথ্যা বকিতেছ ?"

লেডি পমরয় ভ্রাতার এইরূপ বাধা গ্রাহ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আমি মরিয়া গেলে পর যখন আমার মৃত দেহ ফুল ও ফুলের মালায় সজ্জিত করিয়া সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন আমাকে কেমন সুন্দর দেখাইবে। আমার স্বামী কেমন বিষণ্ণ ও নতবদনে আমার শবাধারের অনুগমন করিবেন। সকলে ধীরে ধীরে কথা কহিবে। আমি এখনই যেন ভৃত্যদিগকে বলিতে শুনিতে পাইতেছি যে, আমার ন্যায় সৎলোকেরা এই মলিন পাপপূর্ণ পৃথিবীতে থাকিবার উপযুক্ত নহে। সৎলোকেরা অধিক দিন পৃথিবীতে অবস্থান করেন না, কারণ দেবলোকে তাঁহাদিগের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। অবশ্য আমার শবাধারটি দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইবে, এবং চারিটি শ্বেতবর্ণের অশ্ব তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আমার স্বামীর সহিত এই সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ইতি-পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছি। আমার শবাধার শ্বেত অশ্বেই বহন করিবে। দীর্ঘ-লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব শবাধার বহন করিতেছে ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। দীর্ঘলাঙ্গুলযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দ্বারা আমাদের শবাধার বহন করাইবার রীতি কেন যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

লেডি মেরি লেডি পমরয়কে এইরূপ ভাবে কথা বলিয়া যাইতে শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"প্রিয়তম ডলি, এ কি ভীষণ কথা ? তুমি কি বলিবার আর কিছু পাইলে না ? কেমন করিয়া তুমি এমন কথা মনে আনিতেছ ? তোমার ঐরূপ ভীষণ কথা শুনিয়া আমার হাত পা সমস্ত শিথিল হইয়া আসিতেছে।

লেডি পমরয়ের ভ্রাতা লেডি মেরিকে

বলিলেন হাঁ, লেডি মেরি, ডলি কি নিষ্ঠুর কথাই বলিতেছে। ইহা শুনিলে যথার্থই শরীর শিহরিয়া উঠে, উহাকে নিরস্ত করুন। উহাকে না নিরস্ত করিলে ঐ বিষয় লইয়া ও আধ ঘণ্টা ধরিয়া বাকিতে থাকিবে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং কুকুর ও ঘোড়ায় পরস্পরে কি কথা বলিয়া থাকে, ডলি সেই বিষয়ে কথা বলিতে অতিশয় ভালবাসে। আমি এমন অর্থহীন কথা আর কখন কাহাকে বলিতে শুনি নাই।

লেডি পমরয় তাঁহার ভ্রাতার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই অতি নির্ব্বোধ। ইহা অর্থহীন কথা নহে। কুকুর ও ঘোড়ায় নিশ্চয়ই পরস্পরে কথা বলিয়া থাকে। আজ প্রাতে যখন আমি আমার ঘোড়া জ্যাককে বলিলাম "জ্যাক্ আজ আমি তোকে ভ্রমণার্থ বাহিরে লইয়া যাব, তখন সে আমার কথা শুনিবামাত্র দৌড়িয়া অশ্বশালে শৃঙ্খলাবদ্ধ 'স্যালী' নামক ঘোড়ার সহিত কি কথা বলিতে গেল। সে নিশ্চয়ই স্যালীকে তাহার বাহিরে বেড়াইতে যাইবার কথা বলিয়াছিল, তাহা না হইলে স্যালী এত রাগিয়া উঠিবে কেন?"

লেডি মেরি লেডি পমরয়কে নিরস্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাদরী আনষ্ট্রুথারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আমার বিশ্বাস, মিষ্টার আনষ্ট্রুথার কোন একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা আমাদিগকে বলিতে আসিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে এত গম্ভীর ও চিন্তিত দেখাইতেছে কেন? মিঃ আনষ্ট্রুথার আপনার কি বক্তব্য বলুন, আমি শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

পাদরী আনষ্ট্রুথার এই সময় একটা উচ্চ চৌকির উপর হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক চিমনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি লেডি মেরি কর্ত্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি নির্ভীক দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "লেডি মেরি, আমি আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। সে অনুগ্রহটি এই যে ইলষ্টেল পল্লীবাসিগণের যাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়, সেরূপ কার্য্যে আপনাকে সানুরাগ সাহায্য দান করিতে হইবে।"

লেডি মেরি বলিলেন "হাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি সর্ব্বদাই আমার উপর সেজন্য নির্ভর করিতে পারেন।" পাদরী আনষ্ট্রুথার কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইবার লোক ছিলেন না। তিনি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেডি মেরির নিকট যে নিতান্ত অসাময়িক ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সেইক্ষণে যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তিনি চলিয়া যাইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া লেডি মেরির কথার উত্তরে বলিলেন "আপনি সচারচর দরিদ্রপল্লীবাসিদিগকে অর্থ ও বস্ত্রদানে যেরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন, আমি সেরূপ সাহায্য প্রার্থনার

জন্য এবার আসি নাই। আমি তাহা অপেক্ষা অন্য মহত্তর অনুগ্রহ প্রার্থনার জন্য আসিয়াছি। যদ্যপি সে অনুগ্রহটি বড় অতিরিক্ত বলিয়া আপনার মনে হয়, তবে আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। এখানকার পল্লীবাসিগণের মধ্যে সতত আপনার উপস্থিতি এবং তাহাদের দুঃখ, কষ্ট ও শোকে আপনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি প্রার্থনার জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

যখন তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি সেই মহার্ঘ চিত্র ও আসবাব-সজ্জিত ক্র্যান্বয়েন-প্রাসাদ, লেডি পমরয় ও তাহার ভ্রাতার হাস্যোজ্জ্বল ও বিদ্রূপস্চক নয়ন এবং তাঁহার প্রার্থনাটি কতদূর সঙ্গত, ইহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার ধর্ম্মমণ্ডলটির অন্তর্গত দীন পল্লীবাসিগণের কথা তিনি স্মরণ করিতেছিলেন। তিনি কেবলি জীবন-সংগ্রামে পিষ্ট, দীন পল্লীবাসিগণের কথা ভাবিতেছিলেন। তাহারা দুঃখ, কষ্ট ও শোকের সময় তাঁহারি উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারি নিকট সাহায্যের জন্য আগমন করিয়া থাকে। ক্রাইষ্ট যেরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের সমস্ত পাপ, তাপ, মালিন্য বক্ষ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ সেই দীন পল্লীবাসিগণের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে হাস্য, বিদ্রূপ ও তিরস্কারের পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"লেডি মেরি! আপনার নিকটে এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার ধর্ম্মমণ্ডলের অন্তর্গত এই পল্লীটির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্য্যে পাঁচ বৎসর ধরিয়া অবিরত পরিশ্রম করিবার পর আমি সম্পূর্ণরূপে অসিদ্ধ হইয়াছি।"

লেডি মেরি তাঁহার এইরূপ নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক কথার উত্তরে সকরুণ অথচ উৎসাহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"না, না, আপনি একটুও অসিদ্ধ হয়েন নাই। আর এখন যখন আমি—"। পাদরী আনষ্টুথার লেডি মেরিকে আর বলিতে দিলেন না। তিনি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—

"না যথার্থই আমি অতি শোচনীয়রূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছি। মানবজীবন এবং সমস্ত মানবীয় দুঃখ, কষ্ট ও শোক ঈশ্বরের প্রদত্ত দান মাত্র, ইলষ্টেলগ্রামবাসিগণের নিকটে সে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে আমি এক্ষণে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। সম্প্রতি গ্রামে অত্যন্ত মৃত্যু ও পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আজ জন মরগানের একটিমাত্র কন্যা মারা গিয়াছে।"

চিরদুঃখী জন মরগানের একমাত্র কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া লেডি মেরি গভীরসহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"আমি এ সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

তৎপরে আনষ্ট্রপার পূর্ব্ববৎ সতেজ ও ঔৎসুক্যপুর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন— "সম্প্রতি শেহনের বিধবা স্ত্রীর একমাত্র পুত্রটিরও মৃত্যু হইয়াছে। কৃষক ডেবিডের পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দৈবাৎ পড়িয়া যাওয়ায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমি আপনাকে গ্রামবাসিগণের এইরূপ দুঃখ ও দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বহু সংবাদ প্রদান করতে পারি। কিন্তু এই প্রকার দুঃখ ও দুর্দ্দশার কাহিনী বিবৃত্ত করিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহস করি না। বন্যায় ও তুষারপতনে সম্প্রতি শস্যেরও বহু ক্ষতি হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ এতদিন অতি সাহসের সহিত এই সমস্ত দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুঃখদুর্দ্দশার সহিত সংগ্রাম করিতেছিল। এতদিন তাহারা সমস্ত জাগতিক দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুঃখ দুর্দ্দশা যে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান, তাহাতে কোন সন্দেহ করিত না।

কিন্তু সম্প্রতি তাহারা বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বহু চেষ্টায় তাহাদের বিশ্বাসহীনতা দূর করিতে পারিতেছি না। তাহারা আমার উপদেশ ও বাক্য অপরিণতবয়স্ক ব্যক্তির উক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, আমি জগতের কিছুই জানি না। মূল কথা এই যে, তাহাদের অজ্ঞতাই তাহাদের কাল স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির প্রতি আরচরণ

ভোগিনী শব্দের অর্থ যাহার ভোগ অর্থাৎ সুখভোগ আছে। প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে বিলাসোপভোগের জন্য গৃহীতা হইতেন বলিয়া রাজার তাদৃশ পত্নীগুণ ভোগিনীপদবাচ্য হইতেন। মহিষী ও ভোগিনী, এই দুই নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায় যে, নৃপতিদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্য একটী মাত্র পত্নী হইলেই চলিত। অতএব একাধিক বিবাহ করার আবশ্যকতা (অনেক স্থলেই) দৃষ্ট হইত না। আর্য্যগণের একপত্নীক ব্রতপালনই প্রশংসনীয় ছিল।

পূর্ব্বকালে বহু বিবাহ, বিলসনশীল নৃপতিদিগের মধ্যেই বহু প্রচলিত এবং তদন্যত্র সচরাচর বিরল ছিল। তৎকালে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত থাকাতে স্বয়ম্বর-সভায় নিমন্ত্রিত অনেক বিবাহিত ভূপালদিগের সম্বন্ধেও এরূপ জানা যায় যে, অনেকানেক প্রসিদ্ধ রাজা ধর্ম্মপত্নী বা রাজমহিষী ভিন্ন আর দারপরিগ্রহ না করিয়া রাজসমাজে এক-

পত্নীক ব্রতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

গৃহস্থগণ বিনা কারণে ও বিনা দোষে পত্নী পরিত্যাগ করেন অথবা দারান্তর পরিগ্রহ করেন, ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত ছিল না। কিরূপ অবস্থায় পত্নীর সংশ্রব ত্যাগ অথবা দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ভগবান্ মনু কতিপয় বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। পত্নী যদি শত্রুভাবাপন্ন হন, তবে তাঁহার সেই দ্বেষভাব বিদূরিত হইল কি না তজ্জন্য স্বামী এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন। যদি উক্ত সময়ের মধ্যেও তাঁহার সেই ভাব বিদূরিত না হয়, তবে স্বামী তাঁহার সহিত একত্র বাস ত্যাগ করিবেন। যদি স্ত্রী মদ্যপায়িনী, অসাধুশীলা, প্রতিকূলা (স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্যকারিণী), চিররুগ্না, অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা বা অর্থনাশিনী হন তবে স্বামী পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন স্বামী,স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বর্ষে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বর্ষে, কেবল-কন্যাপ্রসবিনী হইলে একাদশ বর্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিত পারেন ; কিন্তু স্ত্রী যদি অপ্রিয়বাদিনী (স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা অযথা অশ্রাব্য কটুভাষিণী) হন, তবে সদ্যঃ অর্থাৎ যখন অসহ্য হয়, তখন কালাতিপাত ব্যতিরেকে দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত যে কয়টী কারণে পুরুষের দারান্তরপরিগ্রহের বিধি শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনটীও অযৌক্তিক নহে। অযৌক্তিক হইলে শাস্ত্রকারগণ সেরূপ বিধান কেনইবা করিতে যাইবেন। স্ত্রীকে দ্বেষভাবাপন্না জানিতে পারিলেই তাহাকে ত্যাগ করিবার বিধি নাই। তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয় কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য এক বৎসর কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মদ্যপায়িনী নারী মস্তিষ্কবিকৃতি নিবন্ধন কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না, তাহাকর্ত্তৃক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ঐরূপ স্ত্রী ত্যাগার্হা। অসাধুশীলা ভার্য্যা দ্বারা কুলের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষা হয় না বলিয়া পতিকে পদে পদে অবমানিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, এই জন্য ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বর্জ্জনীয়া। পত্নী যদি স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করে, তবে তাহাকে লইয়া গৃহস্থের সুখশান্তির সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং তথাবিধা পত্নী সত্ত্বেও গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারেন। পতির সহিত পত্নীর অকপট ব্যবহার কর্ত্তব্য। যেখানে কপটতার প্রাদুর্ভাব, সেখানে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? এই জন্য স্ত্রী ক্রূরস্বভাবা হইলে গৃহস্থের পক্ষে দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করা নিন্দনীয় নহে। গৃহস্থের পক্ষে অর্থের সদ্ব্যবহার ও সঞ্চয় প্রধান কর্ত্তব্য, তাহাতে আবার অনেক ব্যয়ভার গৃহিণীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। গৃহিণী গৃহস্থের আয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যদি অপরিমিত ব্যয় করেন, তবে সেই সংসার শোচনীয় দশায় উপনীত হইতে পারে।

ঐরূপে অতিব্যয়হেতু যাহাতে গৃহস্থের সংসার হীনদশাপন্ন হইতে না পারে, তদুপায়বিধানার্থ শাস্ত্রকারগণ গৃহীকে ব্যয়শীলা স্ত্রী সত্ত্বেও দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। চিররুগ্না স্ত্রীদ্বারা তাঁহার সংসারিক কার্য্য ও সুশৃঙ্খলতা চলিতে পারে না। পত্নী চিররুগ্না এবং বন্ধ্যাত্বাদি দোষে দূষিতা হইলে, গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রীকে ভরণ পোষণ হইতে বঞ্চিতা করিতে পারিবেন না। স্ত্রী বন্ধ্যা ও চিররুগ্না হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া পুরুষকে বিবাহ করিতে হইত। গুণবতী ভার্য্যাও তাদৃশ স্থলে পতিকে স্বচ্ছন্দচিত্তে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহের অনুমতি দিতেন। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলেও কোন কোন গৃহস্থ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন যে, অদৃষ্টে পুত্রলাভ না থাকিলে ভার্য্যান্তর-গ্রহণ করিলেও ত পুত্র না জন্মিতে পারে? অনিশ্চিত পুত্রলাভের প্রত্যাশায় বিশুদ্ধ-প্রণয়িনী ধর্ম্মপত্নীর সপত্নী-ভাব মাত্র স্থাপিত হইতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা বন্ধ্যা পত্নী সত্ত্বেও পুত্রলাভকামনায় পুনর্ব্বার দার গ্রহণ করা সঙ্গত মনে, করিতেন না। প্রাচীন আর্য্যসমাজে পবিত্রতা, সংশিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রভাবে মদ্যপায়িনী, অসাধু-শীলা, প্রতিকূলা ও ক্রূরস্বভাবা ভার্য্যা প্রায়ই থাকিত না বলিয়া গৃহস্থের পক্ষে ঐরূপ স্থলে পুনর্ব্বার বিবাহেরও প্রায় প্রয়োজন হইত না। ভার্য্যা অপ্রিয়-বাদিনী হইলে পতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কতকগুলি বিচার করিবার বিষয় ছিল। অনেক সময়েই ত দম্পতীমধ্যে কলহ ঘটে, সেই কলহোপলক্ষে অধৈর্য্য হইয়া গৃহিণী যদি হঠাৎ কোন অপ্রিয় বাক্য বলেন, তাহা হইলেই কি গৃহস্থ তাহাকে অপ্রিয়-বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন? তাহা কখনই নহে। স্বামীকে চরিত্রদোষ বা অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ কোন দুষ্কার্য্যে রত হইতে দেখিলে যদি স্ত্রী কোন অপ্রিয় হিতবাক্য বলেন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে? অথবা কষ্ট-বিশেষে পড়িয়া যদি মনের দুঃখে স্বামীকে অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া স্থির করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে হইবে? তাহা কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অপ্রিয় ভাষা যে নারীর স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তাহাকেই অপ্রিয়বাদিনী বলিয়া জানিবে। বিশুদ্ধচরিত্র ও কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞ পতি যথোপযুক্ত ভরণ পোষণ, প্রণয় প্রদর্শন, সদয় ব্যবহার ও মিষ্ট ভাষণ দ্বারা তুষ্ট করিলেও যে নারী প্রকৃতিগত অভ্যাস বশতঃ সর্ব্বদা অযথা অশ্রাব্য কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে শান্তিলাভ করিতে দেয় না, সেই প্রকৃত অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী। আত্মীয়, পরিচিত ও গ্রামবাসি-মাত্রেই যাঁহাকে ঐরূপ মুখরা ও স্বামীর

অশান্তিবিধায়িনী বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত অপ্রিয়বাদিনী। ঐরূপ স্ত্রীর ব্যবহার যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের চেষ্টা করিবেন। উক্ত বিষয়ে আর অধিক বিস্তারিতরূপে না বলিলেও চলে। শাস্ত্রে

বিনা কারণে একাধিক দারগ্রহণের বিধি নাই বলিয়া বোধ হয় প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র সার্ব্বভৌম কাব্যতীর্থ ও পুরাণতীর্থ।

বাঘের আত্মকাহিনী।

চারি দিকে কেবলই মানুষের মুখ। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এবং বোধ হয় শীঘ্রই মরিয়া যাইব। আমার একটা নির্জ্জন স্থানে মরিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এখানে তাহার কোন আশাই নাই। কারণ যখনই আমি বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই কৌতূহলাক্রান্ত মানুষের মুখ দেখিতে পাই। লোকে আমাকে ৭।৮ সের সিদ্ধ ঘোড়ার মাংস খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। তাহারা যদি আমাকে যৌবনকালে একটা বন্যমহিষ খাইতে দেখিত, তাহা হইলে না জানি কি বলিত! এখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খোঁচা মারিয়া আমার সহিত খেলা করে, কিন্তু এক সময়ে আমিই বিড়াল যেরূপ ইঁদুর ধরিয়া খেলা করে, সেইরূপ মানুষ ধরিয়া খেলা করিয়াছি। ছেলেবেলা হইতে আমার কাহিনীটা তবে তোমাদিগকে বলি।

এ যেন ঠিক কালকের কথা। আমি ও আমার দুই ভাই "সের আলি" এবং "আফজল খাঁ" গুহার বালিভরা মেঝের উপর লুটোপুটী খাইয়া কত রকমই খেলা করিতাম। আমরা গুহার মুখ হইতে অদূরবর্ত্তী মাঠে মা ও বাবাকে শিকার করিতে দেখিতে পাইতাম। যে দিন আমি প্রথম একটি হরিণ শিকার করি, সে দিনের কথা কি কখনও ভুলিতে পারিব? হরিণটা মাঠের মধ্যে চরিতেছিল। তাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। আমি গুড়ি মারিয়া এ ঝোপ হইতে ও ঝোপে যাইতেছিলাম। যখনই হরিণটা মাথা তুলিতেছিল, তখনই আমি মাটীতে শুইয়া পড়িতেছিলাম। অনেকক্ষণ এইরূপ করিবার পর আমি শেষ ঝোপটার নিকটে পৌঁছিয়াছিলাম। হরিণটাও বিপদের আশঙ্কা না করিয়া চরিতে চরিতে সেইখানে আসিল। হঠাৎ এক লাফে আমি তাহার পিঠে চড়িয়া তাহার ঘাড় মট্‌কাইতে লাগিলাম। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে, তখন আমি অত্যন্ত

ছোট ছিলাম বলিয়া হরিণটা আমাকে পিঠে করিয়াই দৌড়িয়া গেল। যাহাহউক কোন প্রকারে আমি তাহার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

তাহার পরে যে ঘটনাটী ঘটে, তাহা এরূপ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয় নাই। আমরা তিন ভাই তখন প্রায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং নিজেরাই শিকার করিতে পারিতাম। একদিন আমরা তিনজনে একটা ডোবাতে জল খাইতে-ছিলাম এমন সময়ে একটা বন্যশূকর আসিয়া আমাদিগের প্রতি দৃকপাত না করিয়াই জল খাইতে আরম্ভ করিল। সের আলির মেজাজটা একটু কড়া ছিল, সে রুক্ষস্বরে শূকরকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিল। কিন্তু শূকর তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহাতে সের আলি ভয়ানক রাগিয়া শূকরটার উপর লাফ দিয়া পড়িল। শূকর চকিতের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল এবং সের আলি তাহার পিঠে না পড়িয়া তাহার তীক্ষ্ণ দন্তের উপর পড়িল। শূকরটা দাঁত দিয়া সের আলির চামড়া ছিঁড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া আমরা কাপড় ছেঁড়ার মত একটা চড় চড় শব্দ শুনিতে পাইয়া-ছিলাম। সের আলি এই আঘাতে একটু কাবু ও অবাক্ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই সামলাইয়া লইয়া আবার শূকরটার দিকে লাফ দিল। এবারও শূকরটা দাঁতের আঘাতে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া-ছিল। সের আলির শরীর তখন রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। সে নিজে আর আক্রমণ না করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। শূকরটা একটুও ভয় না পাইয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। এবার সের আলি লাফাইয়া শূকরটার মস্তক ডিঙ্গাইয়া একেবারে তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। কিন্তু শূকর মাটীর উপর গড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। কিছুক্ষণ দুইজনে মাটীতে লুটাপুটী খাইয়া পরক্ষণেই শূকর অগ্রে মাটী হইতে উঠিয়া দন্ত দ্বারা সের আলির পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত চিরিয়া দিল। এই আঘাতেই সের আলি একটী কষ্ট-সূচক চীৎকার করিয়া থাবার এক আঘাতে শূকরের মাথার চামড়া তুলিয়া দিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমি ও আফজল খাঁ সের আলির সাহায্যের জন্য আগেই যাইতাম, কিন্তু তাহার একটা বন্য শূকর মারিবার ক্ষমতা আছে, এই বলিয়া সে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিল।

এখন সের আলির মৃত্যুতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমি ও আফজল খাঁ এক সঙ্গে শূকরটাকে আক্রমণ করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি ঐ শূকরটা অতিশয় সাহসী ছিল। সে আমাদের দুজনের আক্রমণ এমন স্থিরভাবে সহ্য করিয়াছিল, যেন তাহার পক্ষে একটা বাঘকে মারিয়া অপর দুইটা বাঘের সহিত যুদ্ধ করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

সের আলির অবস্থা বুঝিয়া আমরা সাবধান হইয়া গিয়াছিলাম এবং তাহার

নিকটে না যাইয়া দূর হইতেই তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া আমাদের যুদ্ধ চলিল। সের আলিপ্রদত্ত মাথার আঘাত হইতে রক্ত গড়াইয়া চোখে পড়ায় শূকরটা ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না, বোধ হয় বিরক্ত হইয়াই লড়াই শেষ করিবার জন্য সে আফজল খাঁকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। আফজল খাঁও লাফাইয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। শূকরটা সের আলিকে যেমন করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছিল, আফজল খাঁকেও সেইরূপে ফেলিবার চেষ্টা করিবে ভাবিয়া আমি প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং যেমনি সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল অমনি তাহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিলাম। শূকরটা অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও আমার কামড় ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে একটা গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া সে মরিয়া গেল। এই জয়ে আমাদের গর্ব্ব করিবার কিছুই ছিল না। ইহাতে সের আলিত মরিয়াই গিয়াছিল এবং আফজলেরও ডান পাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে গিয়া যখন আমরা সের আলির মৃত্যুসংবাদ দিলাম, তখন বাবা তো রাগেই অস্থির, "আমি কি তোমাদিকে সর্ব্বদাই বলি নাই যে, বুড়ো বুনো শূকরের সঙ্গে ঝগড়া করিও না, ছোট ছোট শূকর মারা খুবই সহজ, কিন্তু তাহার গায়ের লোম কটা হইতে আরম্ভ করিলেই আর তাহাকে আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমি নিজে এই শূকরটাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতাম না।" একদিন আমি শিকার করিয়া ফিরিবার সময় একটা গোঁগানি শব্দ শুনিয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে বাবাকে বন্দুকের গুলি খাইয়া একটা ঝোপের মধ্যে ছটফট করিতে দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তোমার মা ও আফজল খাঁ উভয়েই শিকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। পরে আমাকে একটী দূরবর্ত্তী জঙ্গলে যাইতে পরামর্শ দিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। যে জঙ্গলে আমি এখন আশ্রয় লইলাম, তাহা হরিণে পূর্ণ ছিল এবং আমি ৩।৪ টী হরিণ প্রতিদিন মারিতাম। একদিন আমি একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় মারিয়াছিলাম, সেটা হরিণ ও শূকরের চেয়ে ঢের ভাল লাগিয়াছিল। ইহার পর হইতে আমি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের গরু বাছুর ইত্যাদি মারিয়া খাইতাম।

একদা এক চাঁদনী রাত্রিতে পূর্ব্ব-দিনের মারা ষাঁড়টাকে খাইতে আসিয়া দেখিলাম যে, নিকটেই একটা মাচান বাঁধা রহিয়াছে। আমি যখন ষাঁড়টাকে মারিয়াছিলাম, তখন মাচানটা সেখানে ছিল না। ইহাতে আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল হইয়াছিলাম এবং ওদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই খাইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম,

মাচানটার উপর একটি লোক রহিয়াছে। সে আমার দিকে একটা লাঠী বাড়াইয়াছিল। আমি পরে বুঝিয়াছিলাম সেটা লাঠি নয়, বন্দুক। সহসা একটা ভয়ানক শব্দ হইল এবং আমি মস্তকে আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিলাম একটা লোক বন্দুক হাতে করিয়া আমার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম যে, এক গুলিতে আমাকে মারিতে পারায় তাহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহার উরুদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া বিড়াল যেরূপ ইন্দুর ধরিয়া ঝাঁকুনী দেয় সেইরূপে নাড়িতে লাগিলাম। যখন সে একেবারে অসাড় হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আমার মুখে তাহার রক্ত লাগিয়াছিল, দেখিলাম যে তাহাতে একরূপ নূতন ধরণের আস্বাদ। আমি মনে করিলাম মানুষটাকে খাইতে আরম্ভ করি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাবার উপদেশ মনে পড়িল 'মানুষ কখনও খাইও না। মানুষ খাইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী'। বাবার কথা অনেক সময়েই ঠিক ঠিক ফলিয়াছে বলিয়া আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত মানুষটাকে খাইতে বিরত হইয়া ষাঁড়টাকে খাইতে লাগিলাম।

ইহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে আমার এই জীবনকাহিনীতে সন্নিবেশিত হইতে পারে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই

এই সময়ে সে দেশে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রাম্য লোকদিগের গরু বাছুর সব খাদ্যাভাবে মরিয়া যাইতেছিল ও গ্রামবাসীরা নিজেরাও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। আমি তিন দিন কোনও রূপ খাদ্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া নদীর ধারে একটা ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম। এমন সময়ে গ্রামের সুদখোর মোটা বেনেটা সেই নদীর ধারে আসিয়াছিল ও আমাকে দেখিতে না পাইয়া প্রায় আমার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিল। আমি সরিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু বাঘ দেখিয়া সে ভয়ে এমন জোরে তাহার হাতের লাঠির দ্বারা আমার মাথায় আঘাত করিয়াছিল যে, সেই গুরুতর আঘাতে আহত হইয়া আমি আর আমার স্বাভাবিক ক্রোধ ও হিংস্র স্বভাবকে সংযত রাখিতে পারিলাম না।

ক্রোধে তাহার দিকে ফিরিয়া থাবা চালাইলাম। যদিও আমি বেশী জোরে থাবা মারি নাই, তবু তাহাতেই বেনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রথমে আমি তাহাকে খাইব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দুদিন অনাহারে ছিলাম ও বেনে বেশ ছিল বলিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাকে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

ইহার পর হইতে আমার এক বিপদ উপস্থিত হইল। ভাল জিনিষের আস্বাদ পাইলে মানুষের মুখে যেমন আর মন্দ

জিনিষটী রুচে না, সেইরূপ মানুষের মাংসের আস্বাদ পাইয়া আমার আর অন্য কোন জন্তুর মাংসে রুচি র'হল না। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমি আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় ৫০ জন মানুষ মারিয়াছিলাম। এই সময়ে আমার একটা শৃগালের সহিত খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। কারণ সে মানুষের মাংস খাইতে খুব ভাল বাসিত এবং আমার আহারাবশিষ্ট মাংসে তাহার বেশ চলিয়া যাইত। আমি দেখিয়াছি, মানুষের মধ্যে বড় লোকদের ছেলের নিকটে এই রকম কতকগুল উচ্ছিষ্টভোজী পোষ্য বাস করে। শৃগালের সহিত বন্ধুত্ব হওয়াতে আমার উপকারও খুব হইয়াছিল। যখনই আমাকে ধরিবার বা মারিবার জন্য গ্রামবাসীরা কোন আয়োজন কারত, তখন শৃগালটা কাছে কাছে থাকিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিত। সরকার বাহাদুর এই সময়ে আমাকে ধরিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি তাহা শুনিয়া মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিলাম। শিকারীরা পুরস্কারের আশায় আমাকে ধরিতে অথবা মারিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমার বন্ধু শৃগালের ধূর্ত্ততার জন্য আমি সকল বিপদ হইতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলাম।

* * *

আমার এখন বোধ হয় যে, যদি শৃগালের সহিত আমি ঝগড়া না করিতাম, তাহা হইলে আজও পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে পারিতাম। একদিন শৃগালটা আসিয়া আমাকে বলিল "হুজুর! আপনি গত সপ্তাহে যে কাঠুরিয়াটাকে তাহার ঘরে ঢুকিয়া মারিয়াছিলেন, তাহার কথা মনে আছে ত? তাহার স্ত্রী দুইটী ছেলে লইয়া এখনও সেই ঘরেই বাস করিতেছে। দরজাটার এরূপ অবস্থা যে, আপনি একটু ঠেলা দিলেই পড়িয়া যাইবে।" আমি বলিলাম "বেশ তা আজ রাত্রিতে সেইখানেই শিকার করা যাইবে।" আমরা কাঠুরিয়ার বাড়ীর নিকটে গিয়া দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, কাঠুরিয়ার স্ত্রী খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহার ছেলে দুটীকে খাইতে দিতেছে। বড় ছেলেটি এক খানা বাঁশ-কাটা দা লইয়া বলিল "আমি বড় হলে বাবার মত কাঠুরিয়া হইব। আচ্ছা মা! বাবা কোথায় গিয়াছেন? কবে আসিবেন?" এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তিনি আর ফিরে আস্‌বেন না। তবে একদিন আমরা সকলে তিনি যেখানে গেছেন, সেইখানেই যাব।" অন্য ছেলেটী জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কেন চলে গেলেন? তিনি কি এখানে সুখী ছিলেন না?" ইহাতে স্ত্রীলোকটী মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে আমি এই সব দরিদ্র লোকদিগকে কত কষ্ট দিয়াছি তাহা সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে

পারিলাম। সহসা আত্মগ্লানি ও অনুতাপে পুড়িতে পুড়িতে আমি মনে মনে ভাবিলাম, আর আমি মানুষ মারিব না। এমন সময়ে শৃগালটা বলিল "হুজুর আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? ছেলেটাকে দেখেত আমার জিব্ দিয়ে জল পড়্ছে।" আমি বলিলাম "হতভাগা পেটুক দূর হ। আমি আর কখনও মানুষ মারিব না।" শৃগাল এই কথা শুনিয়া রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমিও তাহার পিছনে পিছনে চলিয়া আসিলাম। কিছু দূরে এক স্থানে গাছের পাতা খুব ঘন করিয়া ছড়ান রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়াই সেটা যেন কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। আমি ফাঁদ আছে সন্দেহ করিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু শৃগাল আমার এই ভয় দেখিয়া অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গী করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সেই পাতা-ঢাকা স্থানটার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু অর্দ্ধেক দূর যাইতে না যাইতেই ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ করিয়া ইঁদুরকলের মত দাঁতওয়ালা ছুটা প্রকাণ্ড লোহার মুখ লাফাইয়া উঠিয়া আমার সম্মুখের ডান পাটা কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজের সে পাটা মুক্ত করিতে পারি নাই। শৃগালটা বোধ হয় জানিত যে, তাহার ক্ষুদ্র শরীরের ভারে ফাঁদটা খুলিয়া যাইবে না এবং সেই জন্যই সে সাহস করিয়া তাহার উপর দিয়া গিয়াছিল। এখন সে আমাকে বলিল "হুজুর এ ফাঁদটার বিষয়ে আপনাকে আমি সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু 'হতভাগা পেটুক' বলিয়া আপনার মত মহৎ লোককে কোন কথা বলিতে সাহস করি নাই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। সে রাত্রি আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা অসহ্য। তবু তখনও আমি মনে মনে ইহাও আশা করিতেছিলাম যে, সকাল হইলে মানুষেরা আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিয়া আমার সকল কষ্টের শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু সকালে মানুষেরা আসিয়া আমার সাধারণ-ব্যাঘ্রদুর্ল্লভ প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া আমাকে না মারিয়া একটা প্রকাণ্ড লোহার গরাদে যুক্ত প্রকাণ্ড পিঁজরার মধ্যে বন্দী করিল। পরে আমাকে গরুর গাড়ীর উপর করিয়া এবং অবশেষে খুব দ্রুতগামী রেলগাড়ীতে চড়াইয়া এখানে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এখানে সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চীতা বাঘ, হস্তী, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু বন্দী আছে দেখিতেছি। ইহারাও হয়ত এক দিন বনে বনে আমার মত শিকার করিয়া বেড়াইত। এখন যেখানে আসিয়াছে লোকে তাহাকে চিড়িয়াখানা বলে। আমার এখানটা মোটেই ভাল লাগে না। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমাকে আর বেশী দিন বাঁচিতে হইবে না। মরিলেই আমি এখন বাঁচি।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত-সম্রাটের প্রতিগমন।

এসেছিলে তুমি ভারত সম্রাট্,
স্বদেশ আবার চলিলে ফিরিয়া,
দেখিলে ভারতে পথ, মাঠ, ঘাট
তোমারে দেখিয়া উঠিল মাতিয়া।

২

দেখিলে ভারতে ত্রিংশ কোটী নর,
দেখিলে তোমারে দেখিয়া সকলে
তুলিয়া উচ্ছ্বাসে কোটী কণ্ঠস্বর
গাইল তোমার সুযশ সকলে।

৩

বাল, বৃদ্ধ, যুবা, পুরাঙ্গনা যত
তোমারে দেখিতে আসিল ছুটিয়া,
পথের ভিখারী, অন্ধ খঞ্জ কত
উঠেছিল তারা আনন্দে মাতিয়া।

৪

যেতেছ চলিয়া যাওহে নৃপতি,
মনে রেখ চির ভারতের কথা,
মনে রেখ চির-রাজভক্ত জাতি
গাবে চিরদিন তোমার বারতা।

মনে রেখ স্মৃতি ভারতনারীর,
মনে রেখ তুমি তাহাদের কথা,
মনে রেখ তারা মহিষী "মেরীর"
শত মুখে গাবে যশোগুণ-গাথা।

৬

পরাধীনা নারী গাবে তবু তারা
গৌরব তোমার শত কণ্ঠে সবে,
লাঞ্ছিতা বিধবা—মুখে নাহি সাড়া,
তারাও তোমার যশোগুণ গাবে।

৭

দেখিও তাদের বলি হে নৃপতি,
দেশাচারে তারা সদাই দলিত,
দেখিও তাদের চিরদুঃখী জাতি,
দেখিও তারাই চির নির্যাতিত।

৮

শিখেনি ভারত এখনো শিখেনি,
নারীর মর্য্যাদা এখনো বুঝে না,
তাই রেখ মনে—ভারতরমণী
তোমারে কখন ভুলিয়া রবে না।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

নূতন সংবাদ

১। আমেরিকার সিকাগো নগরে দুঃস্থ ও রুগ্ন কবিদিগের জন্য একটী আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছে। যে সকল কবি এক সময় কবিতা-রচনা-নৈপুণ্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়া নিরুপায় হইলে তাঁহাদিগকে ঐ আশ্রমে আশ্রয় প্রদান করা হইবে।

২। বিগত ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টার-

মিডিয়েট্ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রী দুইটী বিশিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ—কটক মডেল বালিকা বিদ্যালয়।

ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষা।

প্রিয়নাথ দত্তবৃত্তি।

ক্ষেমদা রায়—বেথুন কলেজ।

৩। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে বাঙ্গালোর, মহীশূর, হাসান্, শিমাগো, কোলার, তুমকর, চিতলদ্রুগ্ ও কাডুর নগরে বালকদিগের ধূমপান-নিষেধক আইন জারি হইবে।

৪। এইবার করাচী বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ইহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাই দিল্লী রাজধানীর বন্দর হইবে।

৫। দেখিতে দেখিতে আবার ইংরাজি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অনন্ত কালজলধিবক্ষে ধীরে ধীরে বিলীন হইল। নানা কারণে এই অব্দটি বহুকাল আমাদিগের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে। তন্মধ্যে ভারত সম্রাটের শুভাগমন, বঙ্গচ্ছেদ নিরাকরণ ও রাজধানী পরিবর্ত্তন, এই গুলি প্রধান। ইটালী ও তুরস্কের সমর, চীনরাজ্যের মহাবিপ্লব, পারস্য রাজ্যের রাজনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি ঘটনার জন্যও ইহা জগদ্বাসীর স্মরণীয় থাকিবে।

বামারচনা।

রাজ-অভ্যর্থনা।

(১)

হইল ভারত গগন উজল
তরুণ অরুণ কিরণে আজি,
নিশি অবসানে আসিল দিবস
মনোহর বেশে, আজি গো সাজি।

(২)

কোন মুকুল ফুটিল আবার
মধুর প্রভাতে শিশির-মাখা;
গুঞ্জরে ভ্রমর আদরে সোহাগে
ফোটা ফুল' পরে কাঁপায়ে পাখা।

(৩)

মঙ্গল সঙ্গীত গাহিছে মধুর
কোকিল পাপিয়া কাঁপায়ে পাখা,
বহিছে তটিনী উল্লাসে মাতিয়া
সৈকতে আঁকিয়া রজত-রেখা।

(৪)

ভারতের আজি বড় শুভ দিন,
এলেন নূতন ভূপতি দ্বারে,
দুঃখিনীর আজি দুঃখ ঘুচাইতে
যতনে মুছাতে নয়নধারে।

(৫)

এস মহারাজ! এস মহারাণি!
দীনা অভাগিনী তনয়া-বাসে,
কত মাস, বর্ষ, যুগ, যুগান্তর
ভারত যাচিছে আপন পাশে।

(৬)

পিতা মাতা তায় দেখিতে বারেক
এসেছেন যদি কৃপা বরষণে,
এত দিনে আশা মিটিল তাহার
এস রাজা রাণি! তারি ভবনে।

(৭)

মলিন বদনে ফুটেছে যে হাসি
তোমারি দয়ায় এ শুভ দিনে,
কৃতজ্ঞ ভারত সপুত্র আজি গো
নমে মহারাজ তোমারি চরণে!

(৮)

এস মহারাজ! এস মহারাণি!
সম্মান-ভবনে লইতে পূজা,
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে গাহিছে উচ্ছ্বাসে
"জয় মহারাণি! জয় মহারাজা!"

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরাণী।

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(১)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
উপরে মেঘের স্তর, মৃদু ছায়া তার পর,
রবির রক্তিম আভা তায়।

২

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
বাতাস আর বহে নাকি যেন স্তব্ধ হয়ে রহে,
ক্ষীণা নদী ধীরে ব'য়ে যায়।

(৩)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
তরণী উপরে নেয়ে কি সুরে উঠিছে গেয়ে
পরাণ টানিছে যেন তায়।

(৪)

সলিলে রঙ্গিমা মেখে, প্রকৃতি দিয়াছে এঁকে,
বিশাল আকাশপট তায়।
শাখির কোমল ছায়ে ওপারে শ্যামল ভূঁয়ে
মাখামাখি লতায় পাতায়।
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৫)

তরুকোলে রাখি মাথা, ব্রততী কহে কি কথা,
কোকিলা আপন মনে গায়,
শ্যাম সন্ধ্যা ধীরে এসে, দাঁড়ায় ধরার পাশে,
ঢুলে ঢুলে ফুল পড়ে গায়।

(৬)

আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।
দুটি মেয়ে নদীতীরে চাহিয়া রয়েছে মোরে
অঞ্চল উড়িছে ধীরে বায়।

হাসি হাসি সুধা মুখ, হৃদয়ে নাহিক দুখ,
বিষাদ ভাবনা নাহি তায়।
সুদূরে আকুল সুরে কে যেন ডাকিছে কারে,
কাছে এসে বায়ে ভেসে যায়।
আজ প্রাণ কি জানি কি চায়।

(৭)

আজি দিবা অবসানে, কাহারে বা পড়ে মনে,
পরাণ ছুটিয়া কেন যায়?
কে কি বলে কাণে কাণে,
বায়ু কারে ডেকে আনে
করিবারে পাগল আমায়।

(৮)

ফুল কেন ভাসে ঢেউয়ে, পাখী কেন উঠে গেয়ে,
কেন তরী ব'য়ে যায়।
নদী কেন বহে ধীরে,ছায়া কেন পড়ে নীরে,
ম্লান রবি সকরুণ চায়?

(৯)

ভ্রমি বিশ্ব একা একা, চাহে প্রাণ কার দেখা,
হিয়া ঢাকা তীব্র বাসনায়।
আজি প্রাণ কি জানি কি চায়।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
মহকুমা মানিকগঞ্জ, জেলা ঢাকা।

রাজসূয়-যজ্ঞ।

আজি বহু যুগ-যুগান্তর পর,
ইউরোপ হ'তে ইংলণ্ড-ঈশ্বর,
প্রথম আসি এ ভারত-ভূমে,
সম্রাজ্ঞীর সহ ভারত-সম্রাট্—
রাজসূয় যজ্ঞ মহান্ বিরাট—
করিছেন সুখে বিপুল ধূমে!!

যেখানে দ্বাপরে রাজসূয় যজ্ঞ
করেছিলা রাজা পাণ্ডব ধর্ম্মজ্ঞ,
সেই দিল্লী ধাম হস্তিনাপুরে
ভারতবাসীর সৌভাগ্যে আবার,
পঞ্চম-জর্জ্জের এ যজ্ঞ ব্যাপার
হতেছে কতই বরষ ঘুরে।

নিজাম, বরদা, ভোট, পাতিয়াল,
কাশ্মীর, সিন্ধিয়া, বেগম ভোপাল,
যোধপুর-ভূপ, কাশীর রাজ।
বিকানীরপতি, রাণা উদিপুর,
অযোধ্যা-নবাব, রাজা ত্রিবাঙ্কুর,
করেছেন সবে কুর্ণীশ আজ।

ধন্য ভাগ্যবান্! ধন্য মহারাজ!
অদ্বিতীয় তুমি একছত্রী আজ,
সমকক্ষ তব জগতে নাই।
যত রাজা রাণী, নবাব. বেগম,
দিতে রাজকীয় উচিত সম্ভ্রম,
সমাগত সবে এ যজ্ঞে তাই।

ভারতীয় প্রজা মোরা সর্ব্বজনে,
নতশিরে রাজদম্পতীচরণে,
ভক্তি-অর্ঘ্য দিনু অঞ্জলি ভরি।
আমরা কেবলি এই ধ্রুব জানি,

রাজা নারায়ণ, নারায়ণী রাণী,
　জাতি ধর্ম্ম আদি কিছু না ধরি।

দাগরে কামান, দাগ গোলন্দাজ !
ছুড়ুম্ ছুড়ুম্ হোক আওয়াজ,
　দেখুক সর্ব্বত্র সকল জন।
সম্রাটেরে রাজ-চক্রবর্ত্তী ব'লে
মানিতে হাজির এই যজ্ঞস্থলে,
　রাজভক্ত যত প্রকৃতিগণ।

উড়াও রে পতাকা, পতাকাবাহী !
দেখুক সকলে সবিস্ময়ে চাহি,
　একই রাজার নিশান-তলে,—
হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান,
ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মী জাতি সে নানান
　সম্মিলিত সবে সদল-বলে।

যত বাদ্যকর ! বাজা সুখে আজ,
ঢাক, ঢোল, কাঁশী, সেতার, এস্রাজ,
　ললিত সানাই, মৃদঙ্গ, ভেরী।
—সুরে জয়ধ্বনি উঠুক বিরাট,
জয় "পঞ্চম জর্জ্জ্" জয় সম্রাট ! !
　জয় ভারতের সম্রাজ্ঞী "মেরী" !!

বাজাও বৃটিশ বাদ্যকরগণ !
সজোরে সঘনে বৃটিশ বাদন,
　হইয়ে সকলে প্রফুল্ল-প্রাণ।
ভরাতবাসীর প্রাণের প্রার্থনা,
বৃটনের গতে বাজাও বাজনা
　"গড্ সেভ্ দি কিং কুইন্" গান।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
　　শোভাবাজার রাজবাটী।

সম্রাট আগমনে।

নিজে দয়া বিলাইতে,
প্রজা-অশ্রু মুছাইতে,
আসিয়া ইংলণ্ড হতে
　করিলেন মঙ্গল-ঘোষণ।
করে লয়ে রাজ্যভার,
পার হয়ে পারাবার,
ত্যজি পুরি আপনার
　আসিলেন ভারতরঞ্জন্।
উঠালেন বঙ্গচ্ছেদ,
ঘুচালেন মন-খেদ,
রাজরাণী সম্ভাবেদ
　রেখো সবে যতনে স্মরণ।

স্বচক্ষে দেখিল নর
ভিক্টোরিয়া বংশধর
হয়েছেন দণ্ডধর
　শিরে ধরি মুকুট ভূষণ।
ভেবে দেখ আগে পাছে,
তাঁরে দিবে কিবা আছে,
হৃদিভরা ভক্তি কাছে
　ধরামাঝে নাহি কোন ধন।
ভারত সোণার খনি,
বহু-রত্ন-প্রসবিনী,
উঠগো দরিদ্রা ধনি,
　লহ তাঁরে করিয়া বরণ।

সম্রাট মহিষী সঙ্গে,
রোধ করি বঙ্গভঙ্গে,
আসিছেন দীন বঙ্গে
দাও ভক্তি বিধিদত্তধন।
সন্তান সমান প্রজা
পালিও যতনে রাজা,
দেশে দেশে শুকা ধ্বজা
ব্যর্থ করে রাজ-আগমন।
রাজার করুণা আশে
দাঁড়াইয়া পথপাশে
জানাতে রাজসকাশে
সকলের মনের বেদন।
পাইবে অভয় বাণী
মনে হেন অনুমানি
দীন দুঃখী যত প্রাণী
সবে আজি আনন্দে মগন।
পাণ্ডব গৌরব যথা
রাজসূয় যজ্ঞ তথা
হয়েছিল, সে বারতা
কে না জানে মাঝে ত্রিভুবন।
অনুসরি সে কাহিনী
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী
আদেশিলে গুণমণি
ভিত্তি তার করিলে স্থাপন।
উদার রাজা মহান্
করুন হেন বিধান,
যেন অন্ন-সংস্থান
করিবারে পারে প্রজাগণ।
শিল্পোন্নতি যাতে হয়
বাণিজ্য সুগম হয়,
কহে রাজা সদাশয়
যুক্ত করে এই নিবেদন।

শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী।
১৮।৪, অক্রূর দত্তের গলি।

১৬।৪ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সরোজিনী দেবী প্রণীত

তিন খানি গ্রন্থ।

"আবেগ"—সর্ব্বজনপ্রশংসিত কাব্যগ্রন্থ, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, আর্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা, মূল্য ১৲ টাকা।

"আদর্শ-জীবনী"—মূল্য ॥০ আনা। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত ষোল জন সাহিত্যসেবীর জীবনের আলেখ্য। সরল ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে সুলিখিত মহাজনকাহিনী এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তক-খানি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার যোগ্য। এই গ্রন্থখানি ঘরে ঘরে আদৃত হইলে আমরা বড়ই সুখী হইব।—নব্যভারত, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩১৬।

স্যার গুরুদাস বাবু বলেন—

"I have had time only to glance over portions of the book. From what I have read I think the book will be interesting and instructive to the boys."

নূতন গ্রন্থ বঙ্গ-বিধবা—মূল্য ॥০ আনা।

স্যার গুরুদাস বাবুর মন্তব্য—

এই পুস্তকে, হিন্দু বিধবার ও চিরবৈধব্যের গৌরব অতি সুন্দর ভাষায় এবং অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক হিন্দুর, হিন্দু বিধবার বিশেষতঃ প্রত্যেক সমাজসংস্কারকের পাঠ করা উচিত।

বিধবা কন্যা বা ভগিনীর হস্তে দিবার উপযোগী এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকখানি মহিলাসমাজে আদৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তিন খানি গ্রন্থই কলিকাতার ২৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, হরিমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্য প্রশংসাপত্রগুলি ছাপা হইল না।

সূচীপত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 577-78. Sept. & Oct., 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৭৭-৭৮ সংখ্যা। } আশ্বিন, কার্ত্তিক, ১৩১৮। { ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর ঊনপঞ্চাশৎ জন্মোৎসব

প্রভু পরমেশ্বরের অপার করুণায় বামাবোধিনী আজ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ঊনপঞ্চাশৎ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে ইহার জীবনের ঘটনা সকল স্মরণ করিলে ভগবানের আশ্চর্য্য করুণার নিদর্শন দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। বিশেষতঃ বিগত চারি বৎসর কাল পিতৃহীনাবস্থায় কি মহাপরীক্ষার মধ্য দিয়া ইহাকে আপন ক্ষীণ দেহখানি লইয়া বৎসর অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা চিন্তা করিলে ইহার সম্বন্ধে ভগবানের কোন মহান্ উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে পারিয়া আমরা নিরুৎসাহ ও অবসন্ন হৃদয়ে বল লাভ করি। মানুষ অন্ধ, দুঃসময় ও পরীক্ষা আসিলেই একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যে ও সেই চিরমঙ্গলালয়ের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে পায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার আয়ুর শেষ হইল ভাবিয়া আমরা বিকম্পিত হইতেছি, কিন্তু কি জানি কোন্ অদৃষ্ট হস্ত স্নিগ্ধবায়ু-সঞ্চারণে এই শুষ্কপ্রায় মুমূর্ষু লতাটীকে পুনর্জীবিত করিতেছে। আজ সেই-বিঘ্নবিনাশন মঙ্গলময়ের চরণে প্রাণের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত প্রণাম করি। ইহার যে স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ইহার মঙ্গলসাধনোদ্দেশে ভাবিয়াছেন এবং যাঁহার অভাবে আজ ইহাকে অশেষ বিপদরাশির মধ্য দিয়া অতিকষ্টে জীবনের পথে অগ্রসর

হইতে হইতেছে, তাঁহাকে স্মরণ করি ও তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তৎপরে যে সকল সহৃদয় ও সহৃদয়া লেখক লেখিকা ইহার শত অপরাধ ও ত্রুটি মার্জ্জনাপূর্ব্বক ইহাকে এখনও প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া ইহাতে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি প্রেরণ ও ইহার উন্নতিকল্পে অসীম যত্ন ও সহায়তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও প্রাণের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আজ আমরা সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

বিগত ৩১শে ভাদ্র, রবিবার, বামাবোধিনীর সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত স্বর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু ইহার উন্নতিকল্পে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

বামাবোধিনীর জন্মদিনে

তরুণ অরুণ রাগে, সোণামুখী উষা জাগে,
সুবর্ণ-অচল,
তার শুভ স্পর্শ পেয়ে, বসুমতী হর্ষে চেয়ে,
সঞ্জীবনমন্ত্রে জীয়ে মৃত প্রাণিদলে।

২

অর্দ্ধ শতাব্দীর আগে, অরুণের রক্ত রাগে
ভরা ভাদ্র মাসে,
নিত্য ধরা করে স্নান, গঙ্গায় উছলে বান,
কে যেন অবনী ভরে স্নেহের আশ্বাসে।

৩

সেই কালে, সেই যুগে, বঙ্গ জননীর বুকে,
এক তপোবনে,
হতে ঋষি তপোরত (বঙ্গবালা-হিত-ব্রত)
জন্মিল মানসী মেয়ে সে শুভ মননে।

বিধাতার কৃপা মাগি, নারীর কল্যাণ লাগি,
পিতা সে বালায়—
কত মত দিলা শিক্ষা, মহামন্ত্রে দিয়া দীক্ষা
অন্তঃপুর নিরজনে প্রেরিলা তাহায়।

৫

আমি সেই অভাগিনী, জনকের আদরিণী
সে "বামা-বোধিনী",
পিতৃ আজ্ঞা পালিবারে, ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে
তোমা সবে সেবিবারে প্রাণের ভগিনি!

৬

তোমরা দুয়ার খুলি, স্নেহার্দ্র নয়ন তুলি,
কাছে লহ ডেকে,
আজি আমি পিতৃহীনা, ভগিনীর প্রীতি বিনা,
কি চাহিব শূন্য বুকে এ মরতে থেকে?

পিতা দিয়াছেন কহি, আমি অন্য কিছু নহি,
সেবা মূর্ত্তিমতী,

পিতা দিয়াছেন কহি, আমি ভিখারিণী নহি,
বিলাইব জ্ঞান ধর্ম্ম করুণা ভকতি।

৮

আজি পিতা বহু দূরে, স্বর্গে—সে অমরপুরে,
আমি ধরাতলে ;
তবু তাঁর স্নেহরাশি, বায়ুভরে আসে ভাসি,
অলক্ষ্যে জীবনী দিতে এ দীন দুর্ব্বলে !

৯

হে পিতঃ, আরাধ্যতম, ও পদে প্রণতি মম,
দুহিতা তোমার,
বিধাতার শুভাশীষে, সংসারের শত বিষে
নাহি হোক জরাজীর্ণ আয়ুষ্কাল তার ;
সমস্ত শকতি ঢালি, তোমার আদেশ পালি,
ফিরে যেন তব কোলে, বলিব কি আর,
তুমি পিতঃ, স্বর্গ ধর্ম্ম তপস্যা তাহার।

বামাবোধিনী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। মৃত্যু—রত্নপ্রসূ ভারতের আজ কি দুর্দ্দশা! এই অল্প দুইমাস কালের মধ্যে ভারতমাতা কতগুলি রত্ন হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাহা একবার চিন্তা করিলে শোকে অধীর হইতে হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রথমতঃ বহুভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তিনি ৩৪বৎসর কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে ৩৩টী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কয়েকটীতে অতীব কৃতিত্বের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক একটী ভাষায় একেবারে পণ্ডিত হইতে পারিতেন যে তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে এতগুলি ভাষায় সুপণ্ডিত জগতে বিরল। তিনি অতীব পরোপকারী ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার বৃদ্ধা জননী, এবং তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়দিগকে শান্তি প্রদান করুন

ইহার পর হায়দ্রাবাদের নিজাম পরলোক গমন করেন।

তাহার পরই বিদ্যুদনুগামী বজ্রপাত। মিথ্যা মৃত্যুসংবাদরটনার অব্যবহিত পরেই কুচবিহারাধিপতি, লেঃ কর্ণেল মহারাজ স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া যান। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখিয়া স্বদেশপ্রত্যাগমনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতসম্রাট এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে তাহা স্থগিত করিতে হয়। পরে বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের দিন স্থির হয়। কিন্তু হায়, দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁহাকে কালকবলে নিক্ষিপ্ত করিল। তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান মিত্ররাজ ছিলেন। অসামান্য

উদারতা, মহানুভবতা, বদান্যতা, দেশ-হিতৈষণা প্রভৃতি নানা গুণে তিনি সর্ব্ব-সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পার্থিব ধন, সম্পদ, মান, সম্ভ্রম অনেকেরই থাকে, কিন্তু কয়জন তাঁহার ন্যায় ব্যথিতের বেদনা অনুভব ও দরিদ্রের অভাব বিমোচন করিয়া থাকেন। ইনি আজীবন বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া ইনি শাসনকর্ত্তাদিগের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বহু পুরস্কারাদিও পাইয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি যুবরাজ প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌সের Hony. Aide de camp, ইংরাজ সৈন্যদলের Lieutenant colonel প্রভৃতি পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সমরে ভারত-সম্রাটের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি সকল দর্শন করিলে তাঁহার কি গভীর স্বদেশপ্রেম ছিল, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। এই সকল গুণে তিনি যেরূপ অলঙ্কৃত ছিলেন, ক্রীড়াদিতেও সেইরূপ সুনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোলো, টেনিস প্রভৃতি খেলায় তাঁহার অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল বলিয়া তিনি ইংরাজদিগের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি পূজনীয় ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। হায়! বিধির কি বিচিত্র বিধান! অকালে ইঁহার জীবনরবি অস্তমিত হইল। যাঁহার ইচ্ছায় সকলই সাধিত হয়, সেই বিশ্ববিধাতা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে শান্তিবিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তৎপরে আর কি বলিব! বিধাতা যেন তাঁহার আদরের সামগ্রী কয়টীকে একে একে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন। বিগত ৪ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, বেলা এগারটার সময় বৈদ্যকুলচূড়ামণি বিজয়রত্ন সেন মহাশয় সজ্ঞানে ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গমাতা তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন, বিজ্ঞ, ধীর, উদারচিত্ত, সদালাপী চিকিৎসককে হারাইলেন। যে বস্তু হারাইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী বিজয়রত্নের মাতা। বিজয়রত্ন তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান। ইনি অল্প বয়সেই দুরূহ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পাঠাবস্থা সমাপ্ত হইবার পর তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, চিকিৎসা-নৈপুণ্য এবং আতুরের প্রতি যত্ন দর্শন করিয়া ও তাঁহার সদালাপে মুগ্ধ হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্ব স্ব গৃহে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রসার ও প্রতিপত্তির এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ক্রমে তাহা বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। "সুদূর বেলুচিস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, এবং নেপাল, সিকিম ও কাশ্মীর হইতে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার যশ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী

প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশেও তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অসীম গুণগ্রামের জন্য মহামান্য বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে উপাধি প্রদান করেন। এই রাজসম্মানপ্রাপ্তির পর তিন বৎসর মাত্র অতীত হইতে না হইতেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার শিবা ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

ইহার পর গত মহাষ্টমীর দিন দেশহিতৈষী, কর্ম্মবীর, তেজস্বী, সত্যবাদী, দয়াশীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি পূজ্যতম শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। লীলাময় ভগবান্ তাঁহার বৃদ্ধ পিতার শোক দূর করুন।

আবার গত বুধবার ১০ই আশ্বিন কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মভীরু ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবন্মৃত অবস্থাতেও তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার বিরাম ছিল না। বহু দর্শনশাস্ত্র অনুবাদ করিয়া তিনি মাতৃভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। যতদিন তাঁহার বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ—যিনি কলিকাতার অন্তর্গত ইটালীতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বহু সংসারতাপে তাপিত নরনারী শান্তিসুধা লাভ করিতেন, গত ২৭শে আশ্বিন ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহারও তিরোভাব হইয়াছে।

ভীষণ কালের কথা আর কত বলিব! মানবরত্নমালা বুঝি ভগবানের যশোগীতি গান করিতে করিতে অনন্তধামে চলিয়া যাইলেন। ভগিনী নিবেদিতা (Sister Nivedita) অথবা কুমারী নোবল্‌ও (Miss Margaret E. Noble) গত ২৬শে আশ্বিন, শুক্রবার, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম সকলেরই নিকট পরিচিত। তিনি আইরিসজাতীয় আমেরিকাবাসিনী। শিক্ষা দীক্ষায় তিনি খৃষ্টান ছিলেন বটে, কিন্তু আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবতী হিন্দু কুমারীর ন্যায়। স্বর্গীয় বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার সিকাগো (Chicago) নগরে Religious congressএ গমন করিয়া, ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রদ্ধেয় ভগ্নী নিবেদিতা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করতঃ ভারতে শুভাগমন করেন। এখানে আগমন করিয়া তিনি রামকৃষ্ণ-মিশন কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। পরে তিনি 'নিবেদিতা' এই নাম গ্রহণ করেন। এই মার্কিন বিদুষী যুবতী একাকিনী বঙ্গদেশে আসিয়া ঠিক বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের ন্যায় ছিলেন। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিতা, সেইরূপ সুপণ্ডিতাও ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, এমন কি অনেক হিন্দুসন্তানের স্বধর্ম্মে সেরূপ অনুরাগ দেখা

যায় না। তিনি প্রাণের সহিত ভারতকে ভাল বাসিতেন এবং ইহার কল্যাণসাধনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এদেশবাসীরা কিরূপে উন্নত হইবেন, ইহাই সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তার বিষয় ছিল। এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাগবাজারে তাঁহার বাসা ছিল। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য তিনি বোসপাড়া লেনে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তত্রত্য স্ত্রীলোকগণ অনেক উপকার পাইতেন। তিনি যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন, সেইরূপ সুলেখিকাও ছিলেন। তিনি বহু অনাথ ও অনাথাদিগকে অকাতরে সাহায্য করিতেন। যাঁহাদের বদান্যতায় বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয় তাঁহাদের মধ্যে তিনি একজন। প্রাচীন যোগিঋষিদিগের বাসস্থান, অভ্র ভেদী হিমাচল পর্ব্বতে দার্জ্জিলিঙে আমাশয় রোগে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা যার পর নাই ব্যথিত হইয়াছি। সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহার পবিত্র আত্মাকে চিরসুখ ও চিরশান্তিতে রক্ষা করুন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—গত ৬ই অক্টোবর পাসিয়া নামক জাহাজে বোম্বাই পুলিশের ডেপুটী কমিশনর ভিন্‌সেণ্ট সাহেব বিপিন বাবুকে গ্রেপ্তার করেন। বিপিন বাবু ইংলণ্ডে অবস্থানকালে স্বরাজনামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে Etiology of Bomb শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও ম্যাজিষ্ট্রেট অ্যাসটন সাহেব তাঁহাকে বিনা পরিশ্রমে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

তুর্কী ও ইটালীয় সমর—তুরস্ক ও ইটালীতে ত্রিপোলী লইয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের চেষ্টায়, বিশেষতঃ জর্ম্মণীর আগ্রহে গত ১১ই অক্টোবর তারিখে ইটালী ও তুরস্ক আপাততঃ তাহা বন্ধ রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

চীন সাম্রাজ্যে বিষম বিপ্লব—চীনবাসিগণ তাহাদের সম্রাটের হস্ত হইতে চীনের শাসনভার কাড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র চীনবাসী যাহাতে বিদ্রোহী হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

দান—দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার এই বদান্যতায় হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতাস্থ সিটি কলেজভবনে রামমোহন রায়ের একটী স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমাদের ঋণ

(১)

৮১ বৎসরের অধিক হইতে চলিল ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ইহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন সহ্য করিতে হইয়াছে এবং ইহার মাথার উপর দিয়া অনেক ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। সমাজ যখন এখনও জীবিত, তখন সেই সব বাধা বিঘ্ন ঝটিকা যে ইহার বিশেষ কিছু অপকার করিতে পারে নাই, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। ঘাত ও প্রতিঘাত যে কেবল জড়জগতেরই নিয়ম, তাহা নহে। মানব-জগতও ইহার অধীন। সেই জন্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কোন না কোন রূপে সঞ্চারিত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মসমাজও তাঁহাদের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এই ঘাত প্রতিঘাতের ফল নির্ণয় করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা দেখিতে চাই, ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট হইতে সুবিশাল হিন্দু সমাজ কি পাইয়াছে।

যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তখন দেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। মুসলমান শাসনের অবসান তখন অল্পদিন মাত্র হইয়াছে, ও ইংরাজ শাসনের সবে মাত্র প্রবর্ত্তন হইয়াছে। দেশে যে ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে, তখন তাহার সূত্রপাত মাত্র হই-য়াছে। পুরাতনের তিরোভাব ও নূতনের আবির্ভাবের সন্ধিস্থলে তখন সমাজ স্থিত। কাজে কাজেই দেশের অবস্থা তখন বড়ই মন্দ। মুসলমান সময়ের শিক্ষা ও জ্ঞান যাহা কিছু ছিল তাহা চলিয়া যাইতে-ছিল, এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে-ছিল মাত্র। হিন্দু সমাজের দশা তখন অত্যন্ত হীন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভিতর তখন সংস্কৃতচর্চ্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ভিতর তাহার কিছুই ছিল না। এই সকল শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান আমলে প্রচলিত ও আবশ্যকীয় বিদ্যার কতক পরিমাণে আলোচনা করিত বটে, কিন্তু অনেকের শিক্ষা তখনকার প্রচলিত বাঙ্গালার বাহিরে যাইত না। বিষয় ও রাজকার্য্যের অনুরোধে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমে লোকে উপলব্ধি করিতে লাগিল এবং রাজপুরুষদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা চলিতেছিল। এই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় আবির্ভূত হন। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি আপনাকে নানা বিদ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে হইবে, কি সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীতে হইবে এই বিতণ্ডায় তিনি

ইংরাজীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন। অবশেষে যে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী-দেরই জয় হয়, তাহা সকলেই জানেন।

ইংরাজী শিক্ষার জয় হইলে দেশের কতকগুলি লোক বিশেষ আগ্রহের সহিত ঐ শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। তখনকার হিন্দুসমাজ অনুদারতা ও কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন। ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রবণতা, উদারতা ও নূতনত্ব ইংরাজি-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক বিপ্লব আনয়ন করিল। তাঁহাদের মস্তক ঘুরিয়া গেল। বিলাতের সবই তাঁহাদের চক্ষে ভাল লাগিতে লাগিল। দেশের সবই তাঁহাদের বিষনয়নে পড়িল। দেশীয় সকল জিনিসই তাঁহারা ঘৃণার বিষয় মনে করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনের কোন ধারই ধারিতেন না, এবং উহাতে যে কিছু শিখিবার আছে, তাহা বিশ্বাসই করিতেন না। ইহার এক ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, তখনকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদের মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইত, তাঁহারা অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না, তাঁহারাও বিশ্বাস করিতেন যে,ঐ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেক উচ্চ। এমন কি কেহ কেহ সেই জন্যই খৃষ্টানও হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হয়। উহা ঠিক সময়েই হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব না হইলে দেশে খৃষ্ট ধর্ম্মের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইত। যে স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, ব্রাহ্ম-সমাজই তাহার বেগ প্রতিহত করিতে পারিয়াছিল। ইহার এক কারণ এই যে, প্রথম সময়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেকটা খৃষ্টীয় ছাঁচে ঢালা। উহা ইংরাজী শিক্ষার অবান্তর ফল। ঐ সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা বড় হীন ছিল। শিক্ষিতসম্প্রদায় উহাতে অসার ও অযৌক্তিক পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজ দেখাইল যে, হিন্দু-ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেই যে নাস্তিক বা খৃষ্টান হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। সকল ধর্ম্ম হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এমন এক ধর্ম্ম গঠিত হইতে পারে, যাহার ভিত্তি যুক্তিমূলক এবং যুক্তিবাদের প্রবল পক্ষীয়েরা যাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রথম অবস্থায় বহুল পরিমাণে খৃষ্টীয় ভাবাপন্ন ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য একটা কথা বলিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে। অনেক খৃষ্টানের বিশ্বাস যে, রামমোহন রায় পুরা না হইলেও অনেকটা খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ছায়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যতটাই পড়ুক না কেন, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা বুঝাইবার এখন আবশ্যক নাই। আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কাছে আমাদের প্রথম ঋণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গতিরোধ।

(২)

হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিকতার

জন্য উহা ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী বলিয়া মনে হয়। এ ঋণ একটি বিরাট ঋণ। বহুকাল ধরিয়া আমাদের দেশে ধর্ম্ম অনেকটা আড়ম্বর ও অজ্ঞানতা-পূর্ণ অর্থবিহীন কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন বিরল হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মজীবন একেবারে ছিল না বলা অত্যুক্তিদোষ হইবে, কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক "বার মাসে তের পার্ব্বণ" পালন করা ভিন্ন ধর্ম্মের অন্য ধার ধারিতেন না। পূজা আহ্নিক অনেকে করিতেন বটে, কিন্তু কয় জন উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিলেন? ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃতচর্চ্চা ছিল বটে, কিন্তু উহাতে সংস্কৃত দর্শন বিশেষ স্থান পাইত না। বঙ্গদেশে সংস্কৃতসাহিত্যচর্চ্চাও অনেকটা নীরস অথচ অত্যাবশ্যক ব্যাকরণচর্চ্চায় পরিণত হইয়াছিল। বেদ ও বেদান্ত বা উপনিষদের নাম মাত্র জানা ছিল, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। দেশের অধিকাংশ পণ্ডিতই ন্যায়, স্মৃতি বা অলঙ্কারের চর্চ্চা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ইংরাজীভাবাপন্ন হইলেও সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গলার বাহিরে গিয়া বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চা করেন। অনন্ত-প্রতিভাবলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পূর্ণ মাত্রায় ইংরাজী ছাঁচে ঢালা হয়, তাহা হইলে এ দেশে চলিবে না। উহা যে উপনিষদের ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের সার, তাহা প্রতিপন্ন করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গদেশে বেদ ও উপনিষদচর্চ্চার কোন সুব্যবস্থা ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ কয়েকটী ব্রাহ্মযুবককে ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিবার জন্য বারাণসী প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম প্রাচীন হিন্দু দর্শনের আদর করিয়াছিলেন ও উহার মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের দিকে লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ কাল আমরা বেদ ও উপনিষদের চর্চ্চায় মন দিতেছি, ভগবদ্গীতা লইয়া আন্দোলন করিতেছি এবং হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিতেছি। এই অবস্থার জন্য যে আমরা কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজই আমাদিগকে প্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, অধ্যাত্মজগতে বেদান্তের স্থান অতি উচ্চ এবং ধর্ম্মজীবনে উহার শিক্ষা অতুলনীয়। এই সকল দেখিয়া মনে হয় আজ কাল আমাদের মধ্যে যে নূতন ধর্ম্মজীবনের ও আধ্যাত্মিকতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার জন্য হিন্দুসমাজ বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী। উহার পথ ব্রাহ্মসমাজই প্রথম দেখান।

(৩)

ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে আর একটী বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। ধর্ম্ম যে কতকটা

প্রচারের জিনিষ, তাহা পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। অনেক দিন হইতে দেশে কথকতা প্রচলিত ছিল বটে এবং কথকেরা জনসাধারণকে রামায়ণ পুরাণাদির কথা শুনাইয়া কিয়ংপরিমাণে যে ধর্ম্মপ্রচার না করিতেন তাহা নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে নূতন প্রকার ধর্ম্মপ্রচার শিখাইয়াছেন। এখানে প্রচারের অর্থ ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল সহজভাবে সাধারণকে বুঝান। ধর্ম্মকে জীবিত রাখিতে হইলে উহার প্রচার আবশ্যক, কারণ প্রচার লোকের ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান উপায়। এ উপায়ের উদ্‌ভাবন অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ করেন নাই। ইহা ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকদের নিকট শিক্ষা করেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান প্রচারপদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পাওয়া। ব্রাহ্মসমাজানুষ্ঠিত প্রচারপদ্ধতিকে যদি কতকটা দেশীয় আকার না দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় হিন্দুরা কখনই উহা গ্রহণ করিতেন না। নূতন ধারা অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্ম যে অধিক প্রচারিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম ঠিক প্রচারের ধর্ম্ম নয় বটে, কিন্তু আজ কাল লোকশিক্ষার জন্য অনেকে যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে। (ক্রমশঃ)

কোচবিহারাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকালবিয়োগে।

হায় কি শুনিনু, একি নিদারুণ বাণী,
জন্ম আয়ুষ্মতী জানি তুমি রাজরাণী,
তুমি নারী বুদ্ধিমতী, প্রতিভা-শালিনী,
সোণায় সোহাগা যথা ধর্ম্মানুরাগিণী।
পিতৃক্রিয়াকলাপের আজো তুমি মূল,
তোমাতে গৌরবান্বিতা আর্য্যনারীকুল।
রাণী হয়ে নহ কভু গরিমাজড়িতা,
শ্লাঘা ভাবি যবে হই মিষ্ট-সম্ভাষিতা।
শৈশবের ছবিগুলি আজি ধীরে ধীরে
প্রকাশিছে, ভাসি তাই নয়নের নীরে;
অচিরে সে আবরিত প্রাণ কাঁদে তাই,
স্মরি যবে এ জগতে মহারাজ নাই।
এ বারতা শুনে হৃদি হয় ম্রিয়মাণ,
অতিক্রমি মহাসিন্ধু ছুটে যায় প্রাণ।
যথায় নয়নাসারে ও চারু বদন
ভাসিছে নিয়ত হায় বিনা সে রাজন্।
নৃপকুলমণি সভ্য নির্ভিকহৃদয়,
সুশোভিত দয়ামায়া কত গুণচয়।
চারি ধার আজি তাঁর করে হায় হায়!
কেন এ অকালে বিধি তুলে নিলে তাঁয়।

বনে রণে শত্রুমাঝে যে কোন সময়
পেয়েছেন ক্লেশ শুনে রাণীর হৃদয়
কত যে পীড়িত হত ব্যথিত ব্যাকুল।
শুনেছি সে সুধা পাশে ; তার সমতুল
আজি কি হৃদয়ব্যথা ? নহে তুল্য তার,
সকলি ফুরাল যে গো সে আশা তোমার,
মহানৈরাশ্যের গাথা সুনীল অম্বরে
লিখিত রহেছে যেন অপপ্ত অক্ষরে।
তবু সতী ধৈর্য্যবতী উঠ মহারাণি !
কর্ত্তব্যের ডালি শিরে সন্তানজননী।
নৃপেন্দ্রের চারি অংশ তনয় তোমার,
মহাতেজ বলধারী নৃপেন্দ্রকুমার।
পিতৃশোকে বিগলিত হৃদয় তাদের,
টেনে লও ; হায়, প্রেম মহাসাগরের
অগাধ সলিল পরে ধরমের ভেলা
বাঁধিয়া ভাসিতে দাও ; সংসারের খেলা
কর্ত্তব্যে খেলিবে সবে, হবে না বিফল,
রবে না মনের গ্লানি শরীর বিকল,
হবে না কাহার কভু রাজ্যে অপযশ,
সুনিয়ম সুপ্রেমের তরে হবে বশ,
রাজ্যের সকল প্রাণী, মহাজয় রবে
আশীর্ব্বাদ করিবেক রাজাত্মজ সবে।
তনয়ার তরে রাণী মুছ অশ্রুধার
সন্তাপিত বক্ষে রোধি সান্ত্বনার দ্বার,
জনক জননী প্রতিনিধি একাধারে
স্বরূপে বিরাজ কর স্বরাজ্যমাঝারে।

সহোদরা প্রিয়জন যে আছে নিকটে
লয়ে ফিরে এস দেশে আর স্মৃতিপটে
সে আলেখ্য, বীরতেজলীলা শৈশবের
ছিল যাঁর একাধারে সাম্য জীবনের,
বীরসম পরাক্রমে হৃদয় কোমল
স্মরিয়া হৃদয়তাপ বহিবে কেবল।
কোথা রাণী পিতা মাতা তোমাদের ধন
লও গো তুলিয়া কোলে শান্তিনিকেতন,
হেথায় সাজাতে যে গো রাজযোগ্য করে।
কমলকুটীরখানি যত্নে থরে থরে,
কত দ্রব্যচয় হায় যতন আদরে,
হরষিত নৃপমণি উদার অন্তরে,
শিশুর সমান তাঁর আবদার তরে
সন্তানবৎসল প্রাণ কি পুলকভরে
হেরিতে যে স্নেহভরে নৃপজামাতায়।
আজি আবাহন করে তুলে লও তাঁয়,
সাজাও তাঁহারে পূত চারু আভরণে,
ঘুচায়ে ধরার ধূলা ত্রিদিববন্ধনে।
ভক্তিমতী শোকাতুরা প্রিয়তনয়ায়
স্বরগের আশীর্ব্বাদ মহা সান্ত্বনায়
দাও তাতঃ দাও মাতঃ মাগি এই দান।
সকলি প্রভুর ইচ্ছা যে কোন বিধান
নতশিরে নিতে হয় নিখিল জগতে,
নাহি ত্রাণ মানবের হেথা কোন মতে।
লইয়া অমৃতরাজ্যে মৃত্যুঞ্জয় হরি,
অক্ষয় জীবন দাও করুণা বিতরি।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুধর্ম্মত্যাগে ভবিষ্যতে যে বিপদ্ হইবে, তাহাও তিনি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জমীদারেরা আমাদের কোনও কোনও বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিলেন। এক জমীদার পিতামহের বিশ্বস্ততার জন্য প্রদত্ত ১০ বিঘা নিষ্কর ভূমি কাড়িয়া লইলেন, আর ফিরাইয়া দিলেন না। জ্যেষ্ঠ মহাশয় বলিলেন, উঁহাদিগের কৃপাদত্ত সম্পত্তির জন্য পুনঃ প্রার্থনা বা তাহার জন্য মোকর্দ্দমা করিব না। শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমাদের সঙ্কল্প ছিল যে, আমরা পৌত্তলিকতার কোনও কার্য্য করিব না, কিন্তু তদ্ভিন্ন হিন্দু আচার সকল রক্ষা করিব। তদনুসারে আমরা একমাস কাল রীতিমত হিন্দু অশৌচপ্রথা রক্ষা করিলাম। এই সময়ে দেশের দুইটী বন্ধু উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করিলেন। বাবু হরনাথ বসু এবং র, না, হ কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিলেন। হরনাথ বাবু কলিকাতা বারুইপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধু সকলকে সংগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের দিন মজিলপুরে উপস্থিত হইলেন।

জমীদারেরা শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু জয়নগরের দারোগা নারায়ণদীন তেওয়ারী আমাদের সহকারী থাকায় ও বারুইপুরের জমীদারদের ছেলেরা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় সাক্ষাৎভাবে বাধা দিতে নিরস্ত হইলেন। কিন্তু দেশের জনপাণী আমাদের সহিত যোগ না দেন এ জন্য গোপনে শাসন করিয়া দিলেন। হরনাথ বাবু আমাদের সহিত যোগ দেওয়াতে জমীদারদের বাটীতে তাঁহার আশ্রয় ও অন্ন উঠিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ গোপাল বাবু জমীদারদিগের প্রাচীন ভৃত্য ছিলেন, তিনি তাঁহাকে ছিন্ন করিবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইলেন না। র--বড় বুদ্ধিমান্ ও শিল্পপটু ছিলেন। তিনিও কলিকাতায় লেখা পড়া করিতেন। তিনি এই ঘটনার পর এক পুস্তক বাহির করিলেন:—"পাড়াগাঁয়ে মহাদায়, ধর্ম্মরক্ষার কি উপায়।" তাহাতে মজিলপুরের ব্রাহ্মদের নিরুপায় অবস্থা এবং জমীদারদের প্রবল অত্যাচার নাটকাকারে বর্ণিত হয়।

জমীদারদের নিষেধ সত্বেও শ্রাদ্ধের দিনে বাটীতে মহাসমারোহ হইল। কতকগুলি যুবক উপাসনায় যোগ দিলেন —কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পাড়ার স্ত্রীলোকগণ দলে দলে বাটী পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। উপাসনাপূর্ব্বক যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সম্পন্ন হইল। প্রীতিভোজন ও গরীবদিগকে চাউল পয়সা বিতরণ করা হইল। জমীদারেরা এখন ব্রাহ্মদিগকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে চেষ্টা করিলেন। আমি জয়নগর স্কুলের 2nd master ছিলাম এবং স্কুলের কর্ত্তা হরনাথবাবুও আমার কার্য্যে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু দত্ত জমীদারদের সহিত তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। এজন্য আমাকে সার্টিফিকেট দিয়া অতি দুঃখের সহিত বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

কালিনাথের হাটের দরুণ বৎসরে ৩৬৫ টাকা আয় ছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা বন্ধ করিবার প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু তাহা কার্য্যকর হইল না। দক্ষিণ বারাশতে একটী ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, জয়নগরের দুই জন শিক্ষক তাহার সভ্য ছিলেন। অন্ন যাইবার ভয়ে তাঁহারা সমাজের ও আমাদের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলেন, ইহাতে সমাজটী উঠিয়া গেল। ইহার পর মজিলপুরের বালিকা-বিদ্যালয়টি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে ১৮৬২ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালযের একটী স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ব্রাহ্মেরা নাবালক হারাণ চন্দ্র ঘোষের মাতার নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি পাট্টা লইয়া ঘরের পত্তন করেন। জমীদারের লোক রাত্রিতে তথাকার গাছ কাটিয়া খুঁটী চুরি করিয়া লইয়া গেল। এই উপলক্ষে বারুইপুরে মোকর্দ্দমা হয়, তাহাতে ব্রাহ্মেরা অসহায় হইয়াও জয়লাভ করেন।

শোকসন্তপ্তা মাননীয়া মহারাণী কোচবিহারাধীশ্বরীর চরণে

ভগিনীর অশ্রুজল।

কি শুনিনু আজ সিন্ধু পার হ'তে
নৃপেন্দ্র " নৃপেন্দ্র "নাই !
আজি কি শুনিতে পাই
শোকসমাচার, আজ গৃহেতে গৃহেতে
কাঁদে নরনারী সবে দরিদ্র ভারতে !

বৃটীশ বেলায় আজ বৃটীশ ভবন,
সে পবিত্র দেহ তাঁর
প্রশান্ত মূরতি আর
দেখিবে না দেখিবে না আর যে এখন,
বৃটনে, ভারতে আজ মরু দরশন !

সুরম্য প্রাসাদ তাঁর শূন্য মূর্ত্তি ধরি
কহে সবে শোকে আজ—
"নাহি আর মহারাজ "
কহে তরুগিরিরাজি সেই মূর্ত্তি স্মরি
আঁধার আঁধার আজ " বিহার "নগরী !

অদূরে হিমাদ্রি অই শিরোন্নত করি
কাঁদিছে নিরলে বসি
অশ্রু—হিমানীতে ভাসি
কহে ভগ্ন প্রাণে আজ ভগ্ন স্বর ধরি
" নাই মহারাজ নাই "—শূন্য গৃহ পুরী।

ভারত-সম্রাট ' জর্জ্জ ' সম্রাজ্ঞী ' মেরী '
মর্ম্মাহত সবে দুখে,
বিষাদের রেখা মুখে,
' বেক্সহিল ' হ'তে এই বিষাদের ভেরী
কাঁদায় ' তোরসা ' তীরে যত নর নারী!

অশ্রুমাখা চখে আজ কি দেখিব আর!
দেখিবার কিছু নাই,
শ্মশান যে দিকে চাই,
বজ্রাহত আজ এই দুঃখী পরিবার,
শ্মশান সকলি—কিছু নাহি দেখিবার!

জাগিছে কেবল মনে--তাঁর অশ্রুজল
আমাদের ভগ্নী যিনি
ভক্তিমতী মহারাণী,
তাঁর অশ্রুজলে আজ কোটী অশ্রুজল,
ভারতভবন আজ শ্মশান কেবল!

অশ্রুতে মিশায় অশ্রু—কথা নাহি সরে
আজি এ দুর্দ্দিনে কত
পুরাতন স্মৃতি যত
শৈশবের ইতিহাস জাগিছে অন্তরে,
শৈশবের স্মৃতি যত সব মনে পড়ে!

তাই এ দুর্দ্দিনে আজ পারি না থাকিতে
তাই আজ ডাকি হায়
প্রিয় ভগিনী তোমায়,
তাই আজ ভাঙ্গা প্রাণে এহেন দিনেতে
শৈশবের ইতিহাস এসেছি বলিতে।

মিলেছিনু যবে মোরা দীন নিকেতনে
প্রত্যাদিষ্ট ভক্ত সনে
এক ধর্ম্ম এক প্রাণে
মিলেছিনু যবে সেই মধুর জীবনে
মনে পড়ে সেই স্মৃতি আজি এ দুর্দ্দিনে!

মনে পড়ে সেই শিক্ষা সেই দীক্ষা তাঁর,
মনে পড়ে কত আশা
হৃদয়ের ভালবাসা,
মনে পড়ে নানা স্মৃতি—দেবমূর্ত্তি তাঁর,
মনে পড়ে কত কথা সেই দিনকার!

তাঁহারি দীক্ষায় তুমি তাঁহারি শিক্ষায়
তাঁহারি আদর্শমতে
ধর্ম্মজীবনের পথে
জান তুমি—কোন্ লক্ষে চলেছ কোথায়,
চল নাই কোন দিন—অসার আশায়।

আজও চলিবে তুমি সেই লক্ষ্য ধ'রে,
বিধাতার বিধানেতে
তাঁহারি আদেশমতে
পাঠালেন ভক্ত তোমা সুরম্য ' বিহারে'
তাই ভগ্নি চল তুমি তাঁহারেই স্ম'রে।

তাঁর কন্যা তুমি যিনি তোমার তরেতে
ক্লেশভার স্কন্ধে লয়ে
বিধাতার মুখ চেয়ে
সঁপিলেন তাঁর কাজে সুদূর রাজ্যেতে,
চল ভগ্নি চল তুমি তাঁহার মন্ত্রেতে।

ঋষিপত্নী মত তুমি রাজর্ষির সনে
করিয়াছ কত কাজ,

কিন্তু ভগ্নি জেনো আজ
আছে আরো করিবার তোমার জীবনে,
লক্ষ্য তব চিরদিন—আদেশ পালনে।

ভক্ত নৃপতির কাজ হয় নাই শেষ,
তাঁহার ইচ্ছার কাজ
কর তুমি ভগ্নি আজ,
তিঁনি৭ বুঝিয়া শুধু বিধাতা আদেশ
করিলেন " বিহারের " মঙ্গল অশেষ।

উচ্চ লক্ষ্য কত আছে সম্মুখে তোমার,
কুমার কুমারী তব,
বিধাতার দান সব,
এদের লইয়া কাজ আছে করিবার
এ সব ব্যবস্থা ভগ্নি! সকলি তাঁহার।

' রাজেন্দ্র ' ' জিতেন্দ্র , তব ' হিতেন্দ্র '
' ভিক্টর '
' সুকৃতি ' ' প্রতিভা ' দেবী
তব জীবনের ছবি
শেষ জীবনের চিত্র ' সুধীরা ' তোমার
উজলিবে তব নাম গৌরব অপার।

কি বলিব আর আমি—কথা নাহি সরে,
কত আশা ক'রে জানি,
' বিহারে ' মোদের আনি,
আমাদের লয়ে তুমি স্ত্রীশিক্ষার তরে
উৎসাহ উদ্যম কত দেখালে সবারে।

ছাত্রীদের পুরস্কারে তুমিই তাঁহারে
এনেছিলে উৎসাহে,
ভুলিতে কি পারি তাহে,
হাসি মুখে পুরস্কার বিতরি সবারে,
কত না উৎসাহ-কথা কহেন সেবারে।

এবারেও ছিল ভগ্নি বড় আশা মনে,
সিন্ধু পার হ'তে এসে,
সেইরূপ হেসে হেসে,
নিজ হাতে ছাত্রীদের পুরস্কার দানে
দিবেন আনন্দ কত আমাদের প্রাণে।

বিধাতার ব্যবস্থায় সে কাজ তাঁহার
পড়িল তোমার হাতে,
তাই তুমি নারীহিতে
নিয়োজিত কর শক্তি ভগিনি তোমার,
চেয়ে আছে তব পানে তোমার 'বিহার।'

তোমারেও ক্রুশবাহী হাতে ক্রুশ দিয়া,
ঈশা মূশা যেই স্থানে,
গিয়াছেন সেইখানে,
যে মন্ত্র তোমারে দিয়া গেছেন চলিয়া,
সে মন্ত্র লয়েছ তুমি মাথায় করিয়া।

তোমরা দু বোন্ এই সুদূর বিহারে',
আচার্য্যের মন্ত্র ল'য়ে,
দুই জনে এক হ'য়ে,
একমন্ত্রে দুই জনে নারীর উদ্ধারে
করিয়াছ কত কাজ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে।

আজো আছে করিবার ভগিনি 'সুনীতি',
উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ আশা
হৃদয়ের ভালবাসা
উচ্চ ধর্ম্মে রাখ চির হৃদয়ের গতি,
দীনা ' সুমতির 'এই সুদীন মিনতি।

শেষের প্রার্থনা আজ্ তব ' সুমতির '
ঋষি সম মহারাজ
আচার্য্যের সনে আজ
আনন্দে বসিয়া ক্রোড়ে আনন্দময়ীর
করুন আনন্দে পান চিদানন্দ-নীর।

দুইটী বন্ধু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ল' পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। ভূপেন্দ্র ও সুরেশ উভয়ে পরীক্ষা দিলেন। উভয়েই ভাল লিখিতে পারিয়াছিলেন, উভয়েরই আশা হইল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে ভূপেন্দ্রের বিবাহ। হরিমোহন বাবু মহা উৎসাহে পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর দশ দিন পরে ভূপেন্দ্রের বিবাহ, সমস্তই প্রস্তুত। "গৃহিণী তথায় বিবাহ দিতে অনেক নিষেধ করিলেন, অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন," কিন্তু হরিমোহন বাবু কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নহেন। ভূপেন্দ্র আশা করিয়াছিলেন, মাতার চেষ্টায় অবশ্যই ফল হইবে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন একান্তই কোন ফল হইল না, তখন আপন কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভগবানের বোধ হয় অন্যরূপ অভিপ্রায় ছিল। হঠাৎ বিসূচিকা রোগে বিনোদ বাবুর বৃদ্ধা জননী প্রাণত্যাগ করিলেন। সুতরাং এ বিবাহ একেবারে এক বৎসরের মত স্থগিত হইয়া গেল। এক বৎসর কাল কাল-অশৌচ, বিবাহ হইতে পারে না। হরিমোহন বাবু তখন একেবারে বসিয়া পড়িলেন, এই ঘটনায় তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। কিন্তু কি করিবেন, আর কোনও উপায় নাই, সুতরাং স্থির হইতে হইল। বিনোদ বাবু মহা ধুমধামের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন ভাবি বৈবাহিক হরিমোহন বাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শুভ কর্ম্মে হঠাৎ বাধা পড়ায় বিনোদ বাবুও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিনোদ বাবুর অপেক্ষা হরিমোহন বাবু অধিক ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং তাঁহার চোরবাগানে বাড়ী কিনিবার কি হইবে, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে যথাসময়ে ল'পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সুরেশ এবং ভূপেন্দ্র, দুই জনেই প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুরেশচন্দ্র বর্দ্ধমানে ওকালতি করিবেন স্থির করিলেন, ভূপেন্দ্রনাথও বর্দ্ধমানে যাইবেন মনঃস্থ করিলেন। ওকালতিতে পশার প্রতিপত্তি হউক বা না হউক, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য নাই, তাঁহার প্রাণ সুরেশকে ছাড়িতে চাহে না, সেই জন্যই তিনি বর্দ্ধমানে যাইতে ইচ্ছুক।

হরিমোহন বাবুর ইচ্ছা, ভূপেন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতী করেন; কিন্তু ভূপেন্দ্র পিতাকে বুঝাইলেন তাঁহার ন্যায় নব্য উকিলের হাইকোর্ট অপেক্ষা মফঃস্বলে অধিক পশার হইবে। সুতরাং হরিমোহন

বাবু সম্মত হইলেন। দুই বন্ধু বর্দ্ধমানে আসিয়া, বর্দ্ধমানের জজকোর্টে দুই জনেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, দুই বন্ধুর বাসাবাটী স্বতন্ত্র হইল।

সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া-কোর্টের সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন একটী বাসা ভাড়া করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ একটী বড় বাটী ভাড়া করিয়া অতিশয় জাঁকজমকের সহিত দাসদাসী-গণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। হরিমোহন বাবু স্বয়ং আসিয়া পুত্রের সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন, এবং অর্থাগম হইলে একটি বাটী নির্ম্মাণ করাইবারও উপদেশ দিয়া গেলেন। অধিক ভাড়া দিয়া অনর্থক অপব্যয় করা তিনি ভালবাসেন না। তবে তাঁহার বিশ্বাস, উকিলের জাঁকজমক দেখিলে মক্কেলগণ মধুলোভী মধুমক্ষিকার ন্যায় দৌড়িয়া আসিবে, তাই তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, ভূপেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে আসিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া বড়ই পুলকিত হইলেন। তিনি ধনীর সন্তান, কখন অর্থাভাব-জনিত কষ্ট ভোগ করেন নাই। তিনি রীতিমত কোর্টে যান বটে, কিন্তু মক্কেল যুটাইবার তত আগ্রহ নাই, বরং সুরেশ যাহাতে দুপয়সা পান, সে বিষয়েই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। তিনি অনেক সময়ে হাতের কায সুরেশকে দেন, সুরেশ নিষেধ করিলেও শোনেন না, বলেন "অত পরিশ্রম করিবার আমার সামর্থ্য নাই"

ভূপেন্দ্রনাথের আর একটী কার্য্য হইল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সুরেশের বাটী গিয়া গল্প করা।

ভূপেন্দ্রনাথের অমায়িকতা গুণে সুরেশের বাটীর সকলেই মুগ্ধ। নবীন বাবুর মুখে ভূপেন্দ্রের প্রশংসা ধরে না। আর এক ব্যক্তি উৎকর্ণ হইয়া ভূপেন্দ্রের প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসে। বলিতে হইবে কি—সে শোভা?

সুরেশ দরিদ্রের সন্তান, তাঁহার চির-দিনের বাসনা—অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতা-মাতার দুঃখ দূর করিবেন। এতদিন পরে তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল। তিনি পরিশ্রম, সত্যনিষ্ঠা, ও ন্যায়পরায়ণতা গুণে শীঘ্রই সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহার পশার প্রতিপত্তি বেশ হইয়া উঠিল। সুরেশের পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এইবার সুরেশ ও শোভার বিবাহ দিতে পারিলে তাঁহাদের সুখ পূর্ণ মাত্রায় হয়। এখনকার দিনে সুরেশের মত সুপাত্রের বিবাহের অভাব নাই, পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে লোক সুরেশচন্দ্রের বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হইতে লাগিল। এমন কি, স্থানীয় মুন্‌সেফ্ ও ডেপুটী বাবুরাও সুরেশচন্দ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এখন নবীন বাবুর প্রতি মা কমলার্ হইয়াছে, তাঁহার দুর্দ্দিন দূর

হইয়াছে, সু দিনে অনেক বন্ধু যুটিয়াছে। শোভার বিবাহের জন্যও চতুর্দ্দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল।

আর দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ আখ্যায়িকা শেষ করিব।

বর্দ্ধমানের যে পল্লীতে সুরেশচন্দ্রের বাসা ছিল, সেই পল্লীতে একজন সৎকুলোদ্ভবা দরিদ্রা বিধবা বাস করিতেন। তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া একটী কন্যা ভিন্ন ইহ জগতে আর কেহ ছিল না, অথবা কেহ থাকিলেও বিধবার তত্ত্ব কেহ লইত না। তাঁহার স্বামীর কিঞ্চিৎ ধান-জমী ছিল, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে মাতা ও কন্যার ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হয়। কন্যাটী অবিবাহিতা। বাঙ্গালীর ঘরে ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা অবিবাহিতা, বিশেষতঃ কায়স্থের ঘরে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা বটে। কিন্তু কি করিবেন, কন্যার বিবাহ দিবার উপযুক্ত অর্থ তাঁহার ছিল না। সুতরাং কন্যা এখনও অবিবাহিতা। বালিকার নাম প্রতিভা। প্রতিভা সৎস্বভাবা, রূপবতী ও পরম লাবণ্যময়ী। তাহার মুখকমলে যেন কি এক স্বর্গীয় প্রতিভার লক্ষণ ছিল এবং গুণও তাহার যথেষ্ট ছিল। পাড়ার লোকে সকলেই একবাক্যে প্রতিভার রূপগুণের প্রশংসা করিত, কিন্তু এ সকল থাকিলে কি হইবে? এ সংসারে সর্ব্বপ্রধান ও প্রয়োজনীয় বস্তু যে অর্থ, তাহা প্রতিভার মাতার নাই। হায় সমাজ! তোমার পায়ে কোটী কোটী নমস্কার! তুমি রূপ চাও না, গুণ চাও না, শীল চাও না, চাও কেবল অর্থ! অর্থের প্রভাবে তোমার নিকটে নির্গুণ গুণবান্ হয়, অধম উত্তম হয়। তোমার শাসনে দরিদ্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই নিষ্পেষিত।

প্রতিভার মাতা প্রতিভার বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সৎকুলোদ্ভবা, সুন্দরী কন্যা হইলে কি হয়, অর্থ দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, সুতরাং কেহই দয়া করিয়া বিধবার কন্যার পাণি গ্রহণ করিল না। তিনি কন্যার বিবাহের নিমিত্ত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে জাতি যাইবে, ধর্ম্মনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কা তাঁহাকে আকুল করিল।

তিনি প্রতিদিন প্রতিবেশীদিগের বাটীতে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। দয়া করিয়া একটী পাত্র অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিবার নিমিত্ত সকলকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কেহ আশ্বাস দিতেন, কেহবা নিরাশও করিতেন। সকলেই বলিতেন" টাকা না হইলে মেয়ের বিবাহ হয় না, আগে টাকার যোগাড় কর।"

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে তাঁহাদের একজন প্রতিবেশী "দয়াপরবশ" হইয়া প্রতিভার জন্য একটী পাত্র স্থির করিলেন। তাঁহার মুখে আস্ফালন আর ধরে না, অন্যান্য প্রতিবেশীদিগকে নিন্দা করতঃ তিনি আত্মপ্রশংসায় পাড়া মাতাইয়া তুলিলেন।

সকলে স্বার্থপর, প্রতিভার জন্য কেহই কিছু করিল না, কেবল তিনিই অনেক কষ্ট

করিয়া এ কার্য্যটী করিলেন. ইহা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা গোপনে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে,দয়ালু প্রতিবেশীটী প্রতিভার মাতার নিকটে কিছু এবং পাত্রের পিতার নিকটেও কিছু টাকা লইয়া তবে এ কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন। যাহাই হউক প্রতিভার মাতা এজন্য বিনীতভাবে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং 'দয়ালু' প্রতিবেশীর শুভ কামনায় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। পাত্রটী তিনবার এণ্ট্রান্স ফেল হইয়া প্রথম বিবাহ করেন, সে স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পাত্রের পিতামাতা বর্ত্তমান। উপস্থিত তিনি কোন কাজ কর্ম্ম করেন না, পিতার কষ্টার্জ্জিত ধনে উদর পূরণ করেন। তাঁহার হাতে পয়সা পড়িলে সুরা এবং গঞ্জিকা দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। এই ত তাঁহার গুণ, রূপও "তথৈবচ"।

উক্ত প্রতিবেশীর মতে এমন সুপাত্র আর কুত্রাপি মিলিবে না, অতএব শীঘ্র শুভ কার্য্য সম্পন্ন করাই মঙ্গল।

এই 'সু' পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে বিধবার ৫।৬ শত টাকার প্রয়োজন। পোনের ভরি স্বর্ণালঙ্কার, এবং নগদ তিন শত টাকা চাই; তৎপরে বরাভরণ, ফুলশয্যা ও বিবাহের খরচ প্রভৃতি আছে। তাঁহার সম্বলের মধ্যে কয়েক বিঘা ধানজমী মাত্র। তবে তিনি কিরূপে এত অর্থ সংগ্রহ করিবেন? হায়! তাঁহার নিকট একটী তাম্রমুদ্রা একটী সুবর্ণমুদ্রার ন্যায় মূল্যবান্!

কিন্তু ইহা না হইলেও কন্যার বিবাহ হইবে না। অগত্যা তিনি ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন। যে জমীটুকু ছিল, তাহা এক জনের নিকটে বন্ধক রাখিলেন এবং ঐ বন্ধকী টাকা লইয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে অন্নাভাবে তাঁহার যে কি দশা হইবে তাহা আর তিনি ভাবিলেন না, অথবা নিরুপায় বলিয়া সে ভাবনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

গৃহসজ্জা সামান্য যাহা ছিল, তন্মধ্যে কিছু কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বিক্রয় করিলেন। এইরূপে কন্যার অলঙ্কারগুলি ও 'ভাবী জামাতার জন্য চেন, ঘড়ি প্রভৃতি ক্রয় করিলেন। বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল.বিধবা যথাসাধ্য জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমাদের সুরেশচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং সুরেশ আসিয়াছিলেন বলিয়া ভূপেন্দ্রও বিবাহদর্শনার্থে আসিয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিতেছিলেন, এবং "বানরের গলায় মুক্তার মালা" অর্পিত হইতেছে দেখিয়া সমাজকে ধিক্কার দিয়া উভয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। এদিকে পাত্রের পিতা আসিয়াই আপনার "প্রাপ্য" বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। প্রতিভার মাতা একজন লোক দ্বারা তৎসমস্ত বুঝাইয়া দিতেছিলেন। চেন, ঘড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি দেখিয়া "ভাল

হয় নাই” বলিয়া বরকর্ত্তা নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। যাহাহউক অনুগ্রহপূর্ব্বক সে গুলি গ্রহণ করিয়া প্রতিভার মাতাকে কৃতার্থ করিলেন। শেষে টাকা গণিতে বসিলেন। নগদ তিন শত টাকা দিবার কথা ছিল, কিন্তু বিধবা আড়াই শত টাকার অধিক তখন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি অতি বিনীত ভাবে ভাবী বৈবাহিককে কহিলেন “আর টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বাকি পঞ্চাশ টাকা পরে দিব, এখন এই আড়াই শত টাকা লইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন।

পাত্রের পিতা এ কথা শুনিয়া মহা রাগান্বিত হইলেন। “যুয়াচোর” “পাজি” “ছোট লোক” মিথ্যাবাদী” প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, “যদি বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এখনি ঐ বাকি পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হউক, নচেৎ আমি বর উঠাইয়া লইয়া যাইব”। প্রতিভার মাতা অত্যন্ত ভীত হইলেন, গালি যাহা খাইলেন তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, এখন তিনি মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে বাঁচেন। তিনি অধিকতর কাতর ও বিনীত ভাবে বলিলেন, “আমি আপনার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, এক মাসের মধ্যে উক্ত পঞ্চাশ টাকা আপনাকে দিব, আজ আমি আর কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ধার কর্জ্জ করিয়া আমি যাহা পাইয়াছি তৎ-সমস্তই আপনাকে দিয়াছি, আর আমার কিছুই নাই। কিন্তু দরিদ্র বিধবার এ কাতরতা কে দেখে? কে শোনে? বরকর্ত্তা অকথ্য কথায় নানারূপ গালাগালি দিতে দিতে স্বীয় পুত্রের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

প্রতিবেশিগণ বিবাহ দিয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন, একজন এক মাসের মধ্যে টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া জামিন হইতে চাহিলেন, কিন্তু “চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী”, বরকর্ত্তা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন প্রতিভার মাতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। “ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার জাতি রক্ষা কর” বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক জাতিনাশ হয় দেখিয়া জ্ঞাতিগণও চিন্তান্বিত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সকলে বৃথা গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। সুরেশ এবং ভূপেন্দ্র এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত এবং ব্যথিত হইলেন, উভয়ের চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

গৃহদ্বারে পাত্রীকে সুসজ্জিতা করিয়া একখানি পিঁড়ার উপর বসাইয়া রাখা হইয়াছিল, বালিকা সেই পিঁড়ার উপরেই বসিয়া আছে। মাতার এই বিপদে এবং তাঁহার আর্ত্তনাদশ্রবণে বালিকার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছিল,

"দয়াময়! আমি ক্ষুদ্র বালিকা, আমার জন্য আমার দুঃখিনী মাতা যেন আর অধিক দুঃখ না পান? তাঁহাকে এ দুঃখ-সাগরে পার কর। এই দণ্ডে আমার মৃত্যু হ'ক, তাহা হইলেই আর কোন জ্বালা থাকিবে না।" বুঝি ভগবানের চরণে তৎক্ষণাৎ সে কথা পৌঁছিল!

বালিকার কাতরতায় দয়াময় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই অনন্ত দেবের অপার কৃপাবলে হঠাৎ সুরেশের দৃষ্টি প্রতিভার উপর পতিত হইল। সেই সজল নেত্রে তাহার বদনকমলের শোভা যেন সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সুরেশচন্দ্র মুগ্ধ হইলেন। অবিলম্বে তিনি প্রতিভার মাতার নিকট গিয়া কহিলেন "মা, যদি অন্যায় বিবেচনা না করেন, তবে আমাকে আপনার কন্যা সম্প্রদান করিয়া জাতি রক্ষা করুন"।

বিধবার কর্ণে সে কথা স্বপ্নে শ্রুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। একি কখনও হইবে পারে? সুরেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ বি, এল্ উপাধিধারী, নবীন যুবক, কত ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার করে কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন। তিনি একজন দরিদ্রা অনাথা বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিবেন? ইহা হইতেই পারে না।

এ কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উদাসনেত্রে সুরেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন সুরেশ তাঁহার মনোভাব বুঝিলেন, এবং তাঁহার ম্লান মুখ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" এইবার বিধবা কথা কহিলেন এবং বাষ্পগদগদ স্বরে বলিলেন "হাঁ বাবা, সত্যি কি তুমি প্রতিভাকে বে' কোরবে?

সুরেশ "আজ্ঞা হাঁ।" বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। বিধবা তখন অতিরিক্ত আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া কি কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া গেলেন। পুরোহিত সুরেশচন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বরের আসনে বসাইলেন। নাপিত আসিয়া ভূতপূর্ব্ব বরের পরিত্যক্ত চেলির যোড় ও টোপর তাঁহাকে পরাইয়া দিল, তাহার পর প্রতিভাকে আনিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ আরম্ভ হইল। সুরেশচন্দ্র কন্যাযাত্র হইয়া বিবাহ দেখিতে আসিয়া নিজেই বর সাজিয়া বিবাহ করিতে বসিয়া গেলেন। এই ব্যাপারদর্শনে ভূপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সুরেশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ভাই সুরেশ! জগতে তুমিই ধন্য! তোমার তুলনা নাই। আজি তুমি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলে, জগৎ ইহা দেখুক, সমাজ ইহা শিক্ষা করুক! তোমার এই দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিলে পৃথিবী স্বর্গ হইবে। ইহাতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে। যাহারা 'সমাজ সংস্কার,' 'সমাজ সংস্কার,' বলিয়া বৃথা চীৎকার করে, সেই জ্ঞানগর্ব্বিত নির্ব্বোধ

লোকেরা আজি দেখুক যে, সুধু গলাবাজি বা মসাযুদ্ধে সমাজসংস্কার হয় না, যথার্থ সমাজসংস্কার করিতে হইলে প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় কর্ম্ম করা চাই। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজসংস্কারের কার্য্য করিলে অবশ্যই সমাজের উন্নতি সাধিত হইবে।”

যথারীতি শাস্ত্রমতে সুরেশচন্দ্রের সহিত প্রতিভার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। প্রতিভার মাতার আজি যে আনন্দ, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে না। প্রতিবেশিগণের মধ্যে কেহ কেহ যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন, আবার কাহারও বা ইহা ভাল লাগিল না। সামান্যা, দীনা দরিদ্রার কন্যা, অর্থাভাবে অপাত্রেও যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল না, তাহার কিনা সুরেশচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বগুণবিভূষিত পাত্রের সহিত বিবাহ! !

যাহারা পরের সম্পদ দেখিতে পারে না, তাহাদের প্রাণে ইহা সহিবে কেন? বলা বাহুল্য সুরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়া অর্থাদি কিছুই লন নাই। এমন কি প্রতিভার গাত্র হইতে অলঙ্কার কয়খানিও খুলিয়া লইয়া প্রতিভার মাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রতিভার মাতা সে গুলি লইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন “বাবা, তোমার মত জামাতা যাহার, তাহার এ সংসারে আর কিছুরই অভাব নাই।”

কিন্তু সুরেশ সে কথা শুনিলেন না। তিনি কহিলেন “আমি সকলই জানি, আপনার অন্নসংস্থানের জমীটুকু আপনি বন্ধক রাখিয়াছেন, আপনি তাহা কিরূপে উদ্ধার করিবেন? অন্নাভাবে কালি আপনার কি হইবে তাহা একবার ভাবিয়াছেন কি? এই অর্থে আপনি সেই জমীটুকু ছাড়াইয়া লউন। এ বিষয়ে আপনি আপত্তি করিবেন না। আমার এ সকলে কোনও প্রয়োজন নাই, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, পরদ্রব্যে আমার যেন কখনও লোভ না জন্মে।” ধন্য সুরেশ! আর যে রমণী তোমার ন্যায় পুত্র গর্ভে ধরেন, তিনিও ধন্যা!”

বিবাহের পর বর কন্যা বাসরগৃহে গমন করিলেন। রমণীগণ ‘বর’ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। সুরেশচন্দ্র হাস্য পরিহাসে বাসর বেশ জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রের কার্য্যে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, নবীন বাবু তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কন্যাদায় যে কি প্রকার ভীষণ ও ভয়াবহ, তাহা তাঁহার বিশেষরূপেই জানা ছিল, তিনি স্বয়ং ভুক্তভোগী। পুত্র যে এইরূপ কন্যাদায়গ্রস্তা এক অসহায়া বিধবাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে তিনি আহ্লাদিত হইলেন। পরদিন যথাসাধ্য সমারোহে বর ও বধূকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

(৯)

সুরেশচন্দ্রের বিবাহের পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। প্রতিভা প্রাণপণে শ্বশুর ও শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করে। সে ননদিনীগণকে সহোদরাধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা করে,

এবং কিসে সে সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে, সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করে! মা কমলার কৃপায় এখন সুরেশের দাস দাসী অনেক হইয়াছে, তথাপি প্রতিভা অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকে। আলস্য বা বিলাসিতা কি প্রকার তাহা সে আদৌ জানে না। প্রতিভার গুণে বাটীর সকলেই সুখী। সুরেশচন্দ্রও পত্নীর রূপে মুগ্ধ এবং গুণে বশীভূত হইয়াছিলেন।

এক দিবস দিবা দ্বিপ্রহরকালে সুরেশচন্দ্র আপন বিশ্রামকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিন আদালত বন্ধ ছিল, সেই জন্য কোর্টে যাইতে হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শোভা একখানি পুস্তক হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ বলিয়া নূতন পাঠ লইতেছে। সুরেশচন্দ্র একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ভগ্নীর পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন। এমন সময়ে সহাস্যবদনে ভূপেন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইলেন। আলুলায়িতকুন্তলা শোভা আলতা-পরা পাদুখানি দোলাইতে দোলাইতে পুস্তক হস্তে করিয়া একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়াছিল। দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ভূপেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তমাত্র সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন, অমনি চারি চক্ষুর সম্মিলন হইল!

শোভা এখন ভূপেন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হয় না, কে জানে কেন ভূপেন্দ্রকে দেখিলেই তাহার অন্তরে কেমন এক প্রকার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়।

দ্বারের পার্শ্বে ভূপেন্দ্রকে দেখিয়া শোভার বদনমণ্ডল আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। দ্বারে ভূপেন্দ্র, সে বাহিরে যাইতেও পারিতেছে না, তাহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল, যেন কি মহা বিপদ উপস্থিত!

ভূপেন্দ্র আসিয়া কক্ষমধ্যে সুরেশের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অমনি শোভা হস্তের পুস্তকখানি রাখিয়া দিয়া বেগে অন্দরাভিমুখে প্রস্থান করিল। উঠিবার সময় বেঞ্চির কোণে লাগিয়া পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল কিঞ্চিৎ ছিন্ন হইয়া গেল। আবার বহির্গমনকালে দ্বারের অর্গলে কয়েক গাছি চুল আটকাইয়া গেল, শোভা সেগুলি খুলিবার অবকাশ পাইল না, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া দৌড়িল।

কিয়ৎক্ষণ এ কথা সে কথার পরে ভূপেন্দ্র কহিলেন "ভাই সুরেশ! তুমিতো দিব্য পত্নীটী বিবাহ করিয়া আনিলে, সার্থক সে দিন বিবাহ দেখিতে গিয়াছিলে? এখন আমিই একা আইবড় থাকিব নাকি?"

সুরেশ সহাস্যে কহিলেন "দুঃখ কেন ভাই!" তোমার তো সকলি প্রস্তুত, আর এক বৎসরও অতীত হইতে চলিল।"

ভূপেন্দ্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "সে যে কাণা, কাণার হস্তে এমন অমূল্য জীবনটা উৎসর্গ করিব?"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, জানিয়া শুনিয়া ভূপেন্দ্রের মনে ব্যথা দেওয়া ভাল কাজ হয় নাই।

পরিহাস ত্যাগ করিয়া তিনি কহিলেন "কাণাকে যদি বিবাহ করিয়া অসুখী হও, তবে আর একটী ভাল পাত্রী মনোনীত কর না কেন? কিন্তু তোমার পিতার মত হইবে কি?" ভূপেন্দ্র একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমি ভাবিয়াছি, বিবাহের পরে অনুনয় বিনয় করিয়া পিতার নিকটে ক্ষমাভিক্ষা চাহিব, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে তিনি যে মত করিবেন, সে আশা আমার নাই।"

সুরেশ কহিলেন "পিতামাতার অনুমতি ভিন্ন এরূপ ভাবে বিবাহ করা উচিত নহে।" ভূপেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ওহে পণ্ডিতপ্রবর, তুমি কি পিতামাতার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিয়াছিলে?"

সুরেশ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, সত্য আমি পিতামাতার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু আমি জানিতাম এ কার্য্যে আমার পিতামাতা অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি দরিদ্রের সন্তান, অতএব আমার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু তোমার বিবাহে তোমার পিতা বিপুল সম্পত্তি হস্তগত করিবার কত প্রত্যাশা করেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই।"

ভূপেন্দ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভাই এ ভিন্ন কানার হস্তে পরিত্রাণলাভের আর আমার উপায় নাই। এরূপ না করিলে জীবনের সুখ, শান্তি এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়।" এই বলিয়া ভূপেন্দ্র অধোমুখে নিরুত্তর রহিলেন।

কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া সুরেশ-চন্দ্র ভূপেন্দ্রের বিবাহের বিষয় এক প্রকার বিস্মৃত ছিলেন, আজি আবার সকল কথা স্মরণ করিয়া চিন্তিত হইলেন। কিরূপে ভূপেন্দ্র মনোমত পত্নী লাভ করিয়া চির-শান্তি লাভ করিতে পারে, সেই চিন্তা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, ভূপেন্দ্র যদি অন্যত্র বিবাহ করেন, তবে কখনই বিনোদবাবু তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। অতএব ভূপেন্দ্রের গোপনে মনোনীত পত্নীর সহিত পরিণয় নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তবে ইহাতে হরিমোহন বাবু নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু ভূপেন্দ্রের মাতা স্নেহময়ী, তিনি অর্থলোলুপা নহেন। তাঁহার অনুরোধে অবশ্যই হরিমোহন বাবু ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি ভূপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি অন্য কোন পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিয়াছ?"

ভূপেন্দ্র কহিলেন "হাঁ, এখন তোমার মতের অপেক্ষা।"

সুরেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মত? তুমি যাহাতে সুখী হও, আমার কি তাহাতে অনিচ্ছা ভূপেন?"

ভূপেন্দ্র। না, তাহা জানি বলিয়াই আজি আমি সাহস করিয়া তোমার নিকটে সে কথা বলিতে আসিয়াছি। ভাই, বহুদিবস হইতে এ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া

আসিতেছি. আমার এ আশা কি পূর্ণ হইবে না ?

সুরেশ উৎসুক হইয়া কহিলেন "ব্যাপারখানা কি খুলেই বল না !"

ভূপেন্দ্র। বলিব বলিয়াই ত আসিয়াছি। বলিব বলিব অনেক দিন ভাবিয়াছি, কিন্তু লজ্জা ও আশঙ্কায় বলিতে পারি নাই। কিন্তু আজ বলিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছি. তাহার পর আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক, তুমি— সুরেশ বাধা দিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজি কোর্ট বন্ধ, অত বক্তৃতা করিতেছ কেন ? কাজের কথাটা কি শীঘ্র বল !"

ভূপেন্দ্র সাগ্রহে সুরেশের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন "ভাই সুরেশ ! প্রাণের সুরেশ ! আমি শোভার পাণি ভিক্ষা করি, বল ভাই, আমার এই বাসনা কি পূর্ণ হইবে না ?" এই কথা শুনিয়া সুরেশের বদনমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পর ক্ষণেই তাহা অতি বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভাই, পোনের হাজার টাকা দিবার ক্ষমতা তো আমাদের নাই ?"

ভূপেন্দ্র হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পাগল, আমি টাকার প্রত্যাশী নই।"

সুরেশ। তুমি টাকার প্রত্যাশী নহ তাহা জানি, কিন্তু তোমার পিতা ছাড়িবেন কেন ? তাঁহার প্রথম আকাঙ্ক্ষা পোনের হাজার টাকা, দ্বিতীয়, অগাধ সম্পত্তি ! এ সকল ত্যাগ করিয়া আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্রের ঘরে তোমার বিবাহ দিতে কখনই তিনি সম্মত হইবেন না।

ভূপেন্দ্র দুঃখিতচিত্তে উত্তর দিলেন, "ভাই, পিতা আমার যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন.সে বিবাহে আমার অন্তর কিরূপ ব্যথিত তাহা তো তুমি জান. তবে জানিয়া শুনিয়া এ কথা কেন বলিতেছ ?"

সুরেশ। ভাই, তোমার ন্যায় ভগ্নীপতি লাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? কিন্তু আমার পক্ষে তাহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়া ভিন্ন আর কি বলিব ! যে রমণী তোমার ন্যায় পতি লাভ করিবে, তাহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমার ভগ্নীর তত সৌভাগ্য আছে কি ? এ বিবাহে তোমার পিতা মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কি জানি কি অনর্থ ঘটাইবেন। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি অন্য কোন ধনাঢ্যের কন্যাকে মনোনীত করিয়া বিবাহ কর।

ভূপেন্দ্র। ভাই, যে দিন আমি তোমার সহিত প্রথম বর্দ্ধমানে তোমাদের বাটীতে আসি, সেই দিনেই আমি আমার চিত্ত হারাইয়াছি। আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে শোভার মনোহারিণী মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আমি মনে মনে কত দিন সেই বিষয়-বিষ-মাখা, ধনগর্ব্বিতা, এক-চক্ষুহীনা রমণী ও আনন্দময়ী, জীবনানন্দদায়িনী, প্রস্ফুটিত কমল তুল্য, শোভার আধার শোভার তুলনা করিয়াছি, উভয়ে স্বর্গ নরক প্রভেদ ! শোভার অতুলনীয় রূপরাশি এবং অনুপমেয় গুণগ্রামে আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, তোমার কাছে

বলিতে লজ্জা কি ? যদি আমি শোভাকে না পাই,তবে আমার জীবনের আশা ভরসা সবই ফুরাইবে। শোভা ভিন্ন আর কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না। আমি কল্পনায় প্রণয়-কুসুমে শোভার পূজা করি, এবং প্রণয়-মাল্য শোভার গলায় দিই, অনেক চেষ্টা করিয়াও এ প্রবৃত্তি দমন করিতে পারি নাই। পাছে আমার হাতে পড়িলে শোভা অসুখী হয়, সেই ভয়ে এত দিন এ কথা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু আমি ঘোর স্বার্থপর, এখন শোভার বিবাহের কথা শুনিতে পাইতেছি, তাই আমার আশঙ্কা পাছে আমার হৃদয়রত্ন, চির-ঈপ্সিত ধন, অপরের কণ্ঠ শোভা করে ! বলিতে কি আমি শোভাকে পাইবার আশাতেই আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। এখন তুমি কৃপা করিলেই আমার বাসনা সফল হয়।

সুরেশ বুঝিলেন শোভার সহিত বিবাহে যথার্থই ভূপেন্দ্র সুখী হইবে। আর শোভারও হাব ভাব দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না, যে শোভাও ভূপেন্দ্র-নাথের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ! তবে ইহা দুরাশা মাত্র মনে করিয়া এ কথা তিনি কল্পনাতেও স্থান দিতেন না।

ভূপেন্দ্র কহিলেন "সুরেশ! তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু, তোমার নিকটে সকলই বলিলাম, এখন যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি কর। আমি তোমার মত পরার্থে আত্মহারা নহি, আমি ঘোর স্বার্থপর ও নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে লালায়িত, আমায় ক্ষমা কর।"

দুই বন্ধুতে বহুক্ষণ ধরিয়া কত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে কথা এ স্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। শেষে স্থির হইল, বিবাহ হইয়া গেলেই ভূপেন্দ্রনাথ পিতাকে পত্র লিখিয়া বিবাহের বিষয় জানাইবেন। সুরেশচন্দ্র স্বীয় পিতাকে সকল কথা বলিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের ন্যায় জামাতা লাভ বহু সৌভাগ্যের ফল, ইহাতে কাহার আপত্তি হয় ? কিন্তু নবীন বাবু সেকেলে লোক, এরূপে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে ক্রোধ ও অভিসম্পাতের ভার মস্তকে বহন করিয়া বিবাহ দেওয়ায় ও করায় তিনি সম্মত হইলেন না।

তিনি কহিলেন "পিতা মাতা বর্ত্তমানে পুত্রের স্বয়ং বিবাহ করিবার অধিকার নাই, তাঁহাদের উভয়েরই অসম্মতিতে আমি কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক নহি। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ না লইয়া বিবাহ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। তাঁহাদের মধ্যে এক জনেরও মত হইলে আমি ভূপেন্দ্রনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে পারি।"

সুরেশ ভূপেন্দ্রনাথকে সকল কথা কহিলেন, এবং সুরেশেরই উপদেশমতে ভূপেন্দ্র এই বিবাহের কথা বিস্তৃতরূপে লিখিয়া তাঁহার মাতাকে একখানি পত্র পাঠাইলেন। কয়েক দিন পরে ভূপেন্দ্রের

পত্রের উত্তর আসিল। পত্রখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে কয়েক পংক্তি মাত্র লিখিত ছিল—

শ্রীশ্রীহরি
সহায়।

কলিকাতা,
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

দীর্ঘজীবেষু,

বাবা, তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি যেরূপে পারি কর্ত্তাকে সম্মত করিব। তুমি বিবাহ করিয়া গৃহে আসিলে আমি সানন্দে বৌ বরণ করিয়া গৃহে তুলিব। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া অতুল আনন্দ ভোগ কর, ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা – তোমার মাতা।

পত্র পাঠ করিয়া ভূপেন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সুরেশের বাসায় গিয়া পত্রখানি সুরেশের হাতে দিলেন। সুরেশচন্দ্র নবীন বাবুকে সেই পত্র দেখাইলেন। অতঃপর নবীন বাবুর আর কোনও আপত্তি রহিল না। বিবাহের দিন স্থির হইল। ইতিমধ্যে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। প্রচুর অর্থলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে ভাবিবধূর গাত্রহরিদ্রার নিমিত্ত প্রচুর দ্রব্যসম্ভার এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কারাদি লইয়া হরিমোহন বাবু স্বয়ং পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত লোকজন সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। পাঠিকা ও পাঠকগণ বলিতে পারেন কি এ কাহার চেষ্টায় হইল? ইহা ভূপেন্দ্রের স্নেহময়ী মাতার চেষ্টাতেই হইল। হরিমোহন বাবুর প্রবল অর্থলিপ্সা কেবল তাঁহারই চেষ্টায় দূর হইয়াছে। আমাদের বঙ্গভূমিতে সহৃদয়া মহিলার অভাব নাই। তাঁহারা যদি স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ভূপেন্দ্রের মাতার ন্যায় কেবল পুত্রের সুখদুঃখের উপর সকল নির্ভর করেন, তাহা হইলে সমাজের বহু উপকার সাধন হয়। আর আমাদের সন্তানগণ যদি ভূপেন্দ্র ও সুরেশচন্দ্রের ন্যায় হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠে। জগতে কন্যাভারপ্রপীড়িত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। সংসারে দুঃখদরিদ্রতার পরিবর্ত্তে আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। হায়! বঙ্গে এমন দিন কি কখন আসিবে? হরিমোহন বাবুকে দেখিয়া সুরেশ প্রভৃতি সকলে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত, পরক্ষণে তেমনি আনন্দিতও হইলেন। তাহার পর শুভক্ষণে ভূপেন্দ্র ও শোভার বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। সতী আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। এ বিবাহে ভূপেন্দ্র ও শোভা অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। শোভার আত্মীয় স্বজনেরও আনন্দের সীমা রহিল না। হরিমোহন বাবুও পুত্রবধূর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, সকলই বিস্মৃত হইলেন। তিনি

সানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া গৃহে গমন করিলেন। আমাদেরও আখ্যায়িকা শেষ হইল, আমরাও পাঠিকা ও পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র, হুগলি।

দাতা চিরং জীবতু।

বড় অল্প দিনের কথা নয়, প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল বৈশাখ মাসের শেষভাগে একদিন অপরাহ্ণসময়ে—সূর্য্য অস্তমিত-প্রায় হইয়াছে—পৃথিবী ছাড়িয়া রৌদ্র গাছের মাথায় উঠিয়াছে ও উচ্চ অট্টালিকার শিরে বসিয়াছে। পাখীগুলি তাহা দেখিয়া চারি দিকে আনন্দে রব করিতেছে, শীতল বায়ু মৃদু মৃদু বহিতেছে, এমন সময় বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনের বাহিরের বারান্দায় একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিলেন। তাঁহার মুখখানি যেন গাম্ভীর্য্যমাখা—পরিধানে একখানি রেলির থানের সাদা ধপধপে ধুতি, গাত্রে একখানি লংক্লথের চাদর। তিনি বার মাসই তাহা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মাথার চুল-গুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, প্রায় গোল ভাবে মস্তক কামান এবং পায়ে তালতলার চটী জুতা। তখন ঠনঠনিয়ার চটীর এতটা প্রসার প্রতিপত্তি হয় নাই।

একটী অন্নক্লিষ্ট দশ বার বছরের বালক আপনার খালি পেটটীতে হাত দিয়া তাঁহাকে আপনার ক্ষুধার্ত্ততা জানাইয়া একটী পয়সা ভিক্ষা চাহিল। প্রবীণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পয়সা লইয়া কি করবি?"

বালক। ঐ এক পয়সার মুড়ি কিনে খাবো।

প্রবীণ। যদি দুটী পয়সা দি?

বালক। এক পয়সার মুড়ি খাবো, আর একটী পয়সার মুড়ি ছোট ভাইটীর জন্য নিয়ে যাবো।

প্রবীণ। যদি চারিটী পয়সা দি?

বালক। তা হ'লে দুপয়সার মুড়ি কিনবো, আর দুটী পয়সা মাকে দিব।

প্রবীণ। আচ্ছা—যদি একটী টাকা দিই?

বালক। তা হ'লে দুপয়সার মুড়ি কিনি, দুটী পয়সা মাকে দি, আর পনর আনা পয়সায় আম কিনে ফেরি করিয়া বেড়াই।

প্রবীণ। তখন হাসিতে হাসিতে বালকটীকে পাঁচটী টাকা দিলেন। বালক টাকা পাইয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং হাসিমুখে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার বার তের বৎসর পরে আবার একদিন সেই প্রবীণ পুরুষটী বর্দ্ধমানের রেল ষ্টেশনের বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলেন, বাইশ তেইশ বৎসরের একটী যুবা অনেকক্ষণ ধরিয়া

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন কোন সুপ্ত স্মৃতিকে জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মুখে একটু প্রফুল্লতার চিহ্ন দেখা গেল এবং সে সেই প্রবীণ পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া বলিল—

তিনি "আপনিই বটে।"

প্রবীণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—

'কে তুমি, কেন আমার পায়ে পড়িলে?'

যুবক। আপনাকে আপনার আমের দোকানে যাইতে হইবে; চলুন, আমি অনেক দিনের পর আপনার দেখা পাইয়াছি. আপনাকে আর ছাড়িব না-- এই স্থানটীতে আসিলেই আপনাকে আমার মনে পড়ে। অনেক কষ্টে আজ ভগবান আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছেন।

প্রবীণ। ব্যাপারটা কি বল, আমার কখন আমের দোকান নাই,আমি কোথায় যাইব?

যুবক। আপনি চলুন, দোকানে গেলেই আপনাকে সকল কথা মনে করিয়া দিব।

যুবকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যদর্শনে প্রবীণ কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে যুবকের অনুসরণ করিলেন। আমের দোকান ষ্টেশনের অতি নিকটেই, দুই এক মিনিটের মধ্যে তিনি একখানি বৃহৎ আমের দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানখানিতে প্রায় হাজার টাকার আম রহিয়াছে, দুই তিনজন চাকরে আম বেচিতেছে, একজন মুহুরী বিক্রয়ের হিসাব লিখিতেছে। দোকানে খরিদ্দার ধরে না, এ বলিতেছে "আমাকে আগে দাও", ও বলিতেছে "আমাকে আগে দাও, গাড়ী এখনি ছাড়িয়া দিবে।" ইত্যাদি—

যুবক প্রবীণকে দোকানে লইয়া গিয়া একখানি চৌকিতে বসাইয়া, আপনি জলের ঘটী লইয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিল, তাহার পর সাত আট টী সুপক্ক বড় বড় আম লইয়া ছাড়াইয়া একখানি থালা পরিপূর্ণ করিয়া বলিল—

"এগুলি আপনাকে খাইতে হইবে, না খাইলে কিছুতেই ছাড়িবো না, এ সকল যাহা দেখিতেছেন সবই আপনার। আপনি পেট ভরিয়া খান।"

প্রবীণ কিয়ৎকাল অবাক হইয়া বসিয়া থাকিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ব্যাপারটা কি বল দেখি। তুমিই বা কে, ষ্টেশনে কত লোক আসা যাওয়া করিতেছে, তাহাদের কাহাকেও ত এরূপ যত্ন করিয়া আম খাওয়াইবার জন্য জেদ করিতেছ না, এ সকল কথা না বলিলে কিছুতেই আমি আম খাইব না।"

যুবক তখন অশ্রুজলে চক্ষু ভিজাইয়া বলিতে লাগিল,

"মনে করিয়া দেখুন আজ ১২।১৩ বৎসর হইল এই বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে ঠিক এমনি সময়ে দশ বার বছর বয়সের একটী বালক একটী পয়সা ভিক্ষা চাহিলে আপনি তাহাকে পাঁচটী টাকা দিয়াছিলেন, বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি। সেই এক-

পয়সার ভিখারী বালক আপনারই কৃপায় আজ এই নগরের একজন প্রধান আমের মহাজন।"

প্রবীণ। "শুধু তাই মনে করিব কেন, তোমার ভ্রাতৃস্নেহ, আর মাতৃভক্তির কথাটাও মনে করিব, তোমার সেই বাল্যকালের বিষয়টাও ভুলিব না।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রবীণের চক্ষু দুইটীও অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি বলিলেন,—

"দাও আম দাও, তোমার আম অবশ্যই খাইব।"

এই বলিয়া দুই তিনটী আম খাইয়া বলিলেন,—

"আর খাইব না হে—আমার অম্বলের ব্যামো আছে।"

যুবক ছাড়িল না, জেদ করিয়া আরও দুইটী আম খাওয়াইল।

প্রবীণ বলিলেন, "ভোরপুর হইয়াছে। রাত্রিতে আর আমার জলস্পর্শ করিতে হইবে না।"

অতঃপর যুবক একটী ঝুড়িতে ভাল ভাল একশত আম বাছিয়া লইল, এবং প্রবীণের স্বস্থানে প্রস্থান করিবার সময় আপনার চাকরকে দিয়া সেই আমগুলি তাঁহার সঙ্গে পাঠাইল।

প্রবীণ বলিলেন, "এত আম লইয়া আমি কি করিব, এখানে আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গের কেহই নাই, কেবল চাকর ও বামুন মাত্র, তাহাদের জন্য ৮।১০টা না হয় ২০।২৫টা হইলেই যথেষ্ট হইবে।"

যুবক বলিল—"পাড়া প্রতিবাসীকে বিলাইয়া দিবেন, তাহা হইলেও আমার সার্থক হইবে।"

পাঠকপাঠিকাগণ এই প্রবীণ পুরুষকে চিনিয়াছেন কি? –ইনি দয়ার অবতার স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ দেশে প্রবাদ এইরূপ যে, যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের দানে উপকৃত, সেই সার্থক হইয়াছে; তাঁহার দান ব্যর্থ হইবার নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়।

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

ভূত না মানুষ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ফকিরের ফন্দি ও প্রতারণা।

চণ্ডদেবের ভূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হওয়ার পর কিছুদিন অতীত হইল। তিনি অনেকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার হাতের ক্ষত সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হইলেও ভূত কর্ত্তৃক আক্রমণের দুর্ব্বিতাটা একেবারেই উপশম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি ভূতের ভয়ে অতি অস্থিরভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ইহার উপর নন্দক কোথায় গেল, সে চিন্তাতেও তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন। নন্দক পূর্ব্বে কখনও

তাঁহার বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইত না। একদিন সন্ধ্যার সময় চণ্ডদেব একজন ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, একজন ফকির তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।

তিনি ফকিরকে নিকটে আনাইলেন। ফকির তাঁহার কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, এবং চণ্ডদেবের সম্মুখে মেজের উপর একখানি কম্বল বিছাইয়া বসিয়া পড়িল। চণ্ডদেব ফকিরের ব্যবহারে ভীত হইলেন এবং বিরক্তিও বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছ কেন?

ফকির। তুমি আমাকে চিনিতে পার না? আমি শুধু ফকির নই, ভূতের ওঝা, ও জ্যোতিষ বিদ্যাতেও আমার অধিকার আছে।

চণ্ডদেব ভীত হইয়া কহিলেন, তুমি ভূতের ওঝা?"

ফকির। হাঁ, আমি জানিতে পারিয়াছি বহুদিন হইতেই একটা ভূত তোমার অনুসরণ ও তোমাকে সময়ে সময়ে আক্রমণ করিতেছে। এই কয়েক দিন হইল তুমি যে কুমারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, ও যাহাকে তুমি বিষাক্ত সূচ দ্বারা হত্যা করিয়াছ, তাহার প্রেতাত্মা তোমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। নন্দকের আগমনের আর এক দণ্ড কাল বিলম্ব হইলেই তোমাকে ধরাধাম হইতে চিরবিদায় লইতে হইত। সেই কুমারীর নামের আদি অক্ষর "চ"।

চণ্ডদেব বিস্ময়ে ও ভয়ে শবের মত হইয়া গেলেন, এবং বিস্ফারিতনেত্রে ফকিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। এই সময়ে তিনি এরূপ মুখব্যাদন করিলেন যে, আর কখনো কেহ তাঁহাকে সেরূপ মুখব্যাদন করিতে দেখে নাই। চণ্ডদেব এই ভাবে কতক্ষণ ছিলেন, তাহা তিনিও বলিতে পারেন না। যখন তাঁহার চক্ষু সঙ্কুচিত হইল, মুখের সে ভাব তিরোহিত হইল, তখন তিনি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। এবং জড়িতস্বরে কহিলেন, "কাহার প্রেতাত্মা? চন্দনীর?"

ফকির। হাঁ যাহাকে বিষপ্রয়োগ করাইয়া হত্যা করিয়াছিলে তাহারই সেই প্রেতাত্মা।

চণ্ডদেব ভয়ে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল। ফকির কহিল, "আমি ভূতের ওঝা, জানিতে পারিয়াছি যে, তোমার পশ্চাতে অনেক ভূত লাগিয়াছে। তুমি জানিও তোমার জীবনের এক তিলার্দ্ধও নিরাপদ নহে। তবে নিরাপদ হইতে পারে, যদি তুমি আমার শরণাপন্ন হও"

চণ্ডদেব ভয়ে একেবারে জড়বৎ হইয়া গেলেন, এবং নিতান্ত অস্থির হইয়া কহিলেন, "শরণাপন্ন হইলাম, হইলাম।"

ফকির। আচ্ছা, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহার সত্য উত্তর দাও। বল, প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ?

ভয়ে চণ্ডদেবের প্রাণে আর প্রাণ

রহিল না, তাঁহার জিহ্বা শুকাইয়া গেল। তিনি রুদ্ধ স্বরে ক'হিলেন, "আ-মি জানি-না।"

ফকির। তুমি জান না? অবশ্য জান। জানত আমি কে? আমি ভূতের ওঝা, আমি সব জানিতে পারি। আমার কাছে লুকাইয়া ফল নাই। বল, সত্য কথা বল।

চণ্ডদেব কথা বলিতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। অনেক চেষ্টায় চক্ষু মুদিয়া ও বুকের উপর হাত দিয়া কহিলেন, "রা-জ"। "হাঁ বুঝিলাম, রাজপুত্তানায়।" এই বলিয়া ফকির বায়ুবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ফকির চলিয়া গেলে চণ্ডদেব বহুক্ষণ মৃতবৎ অসাড় ও অবশ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার ভৃত্যগণ নিকটে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

চণ্ডদেব কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কোমল ও করুণ স্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

"মনরে কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোণা।"

তাঁহার ধর্ম্ম-সংগীত শুনিয়া ভৃত্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিল না, কারণ আজ কাল গ্রামের মধ্যে চণ্ডদেবের দুর্নামের সীমা ছিল না। "পাপিষ্ঠ বলিয়া যার এত দুর্নাম, তাহার আবার ধর্ম্ম-সঙ্গীত লইয়া এত চেঁচা চেঁচি কেন?" এই কথাই তখন তাহাদের মনে উদয় হইতেছিল।

চণ্ডদেব তখন ফকিরের চাতুরী হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নন্দকের আগমন-প্রতীক্ষাতেই জীবন ধারণ করিতেছিলেন। ভূতের আক্রমণে প্রপীড়িত ও ফকিরের কথায় ভীত হইয়া চণ্ডদেব স্ত্রীলোকের ন্যায় দেহাচ্ছাদনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিলেন।

ফকির তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, বহুসংখ্যক ভূত তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। এ কথায় তিনি অবিশ্বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভয় তাহাকে ছাড়িল না। মৃত্যুভয় সততই তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। চন্দনীর আত্মা আসিয়াছিল, এ কথায় তিনি অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু জাগ্রত ও নিদ্রিত, উভয় অবস্থাতেই চন্দনীর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। ফকিরের উপরেও তাঁহার বিশেষ সন্দেহ হইল। কারণ, তিনি ফকিরের মুখেও যেন বহুদিন পূর্ব্বের একটি মৃত ব্যক্তির ছায়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস পৃথিবীর যত ভূত, তাঁহার মৃত্যুর জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ফকির বলিয়াছে যে, সে ভূতের ওঝা, কিন্তু চণ্ডদেব বুঝিলেন যে, ফকির নিজেই ভূত, এবং নন্দকই এই সব ভূতাত্মার ওঝা, কিন্তু নন্দক কোথায়? তিনি কায়মনোবাক্যে বিধাতার নিকট নন্দকের নিরাপদে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

চণ্ডদেব ত এই ভাবেই দিন কাটাইতে লাগিলেন। দেবদত্তের সময় আর কিছুতেই কাটিতেছে না, সে নন্দকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সহসা একদিন একজন ফকির তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় কহিল, "দেবদত্ত, তুমি গুণবতী স্ত্রী হারাইয়াছ, যদি তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার সঙ্গে আইস।"

এই কথা শুনিয়া দেবদত্ত ঈশ্বরকে স্মরণ-পূর্ব্বক ফকিরের সঙ্গে বাহির হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই ফকির দেবদত্তকে আদেশ করিল, "গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বন আছে, তাহা ক্রমশঃ একটী উচ্চ পাহাড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বনের প্রান্তভাগে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা কর।"

দেবদত্ত সাহসে নির্ভর করিয়া সেই দিকে চলিল।

ভবভূতি ইহার অগ্রেই নন্দকের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল।

পথিমধ্যে তাহাদের মিলন ও পরিচয় হইল। দেবদত্ত ও ভবভূতি উভয়ে এক জন কর্ত্তৃকই প্রপীড়িত, এবং উভয়ে এক পথেই চলিল।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

সেণ্ট পলের পত্রাবলী।

রোমীয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩। কতকগুলি লোক যদি বিশ্বাস না করে, তাহাতে কি আসে যায়? তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিধানকে অতিক্রম করিবে?

৪। ঈশ্বর সত্যাশ্রয়; মনুষ্য মিথ্যাবাদী হয়, তিনি কখনও তাহা ইচ্ছা করেন না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাতে তোমার সত্যতা প্রতিপন্ন হউক এবং যে মানুষ তোমাকে বিচার করে, সে পরাস্ত হউক।

৫। কিন্তু আমাদের অসত্যতা যদি ঈশ্বরের সত্যতাকে উজ্জ্বলতর করিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কি বলিব। ঈশ্বর পাপের দণ্ডদাতা, তাই বলিয়া কি তিনি অন্যায়াচারী?

৬। ঈশ্বর কখনও অন্যায় করেন না। ঈশ্বর যদি অন্যায় করেন, তাহা

হইলে তিনি কিরূপে জগতের বিচারকর্ত্তা হইবেন ?

৭। যদি ঈশ্বরের সত্য আমার মিথ্যা দ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাঁহার গৌরবের কারণ হয়, তবে আমি কেন পাপী বলিয়া বিচারিত হইব ?

৮। এরূপই হউক না কেন যে, পাপের দণ্ড যখন ঠিক, তখন আমরা যতই পাপ করি না কেন, তাহা হইতে ত পরিণামে মঙ্গল হইবে।

৯। তবে কি আমরা জেণ্টাইলদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহি ? কিছুতেই নয়, কারণ আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ইহুদী ও জেণ্টাইল সকলেই পাপী।

১০। শাস্ত্রে লেখা আছে, কেহই ধার্ম্মিক নয় ; না, একজনও নয়, তাহাই সত্য।

১১। এ সকল তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই, ঈশ্বরকে চায় এমন ব্যক্তি কেহই নাই।

১২। সকল লোকেই বিপথগামী, তাহারা সকলেই অকৃতী, সাধুভাবাপন্ন কেহই নহে ? না, একজনও নহে।

১৩। তাহাদের কণ্ঠ উন্মুক্ত কবর, তাহাদের রসনা প্রতারণায় অভ্যস্ত এবং তাহাদের ওষ্ঠে সর্পের বিষ।

১৪। তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটু কথায় পূর্ণ।

১৫। তাহাদের পদদ্বয় রক্তপাতের জন্ত দ্রুতগামী।

১৬। তাহাদের পথ ধ্বংস ও ক্লেশময়।

১৭। শান্তির পথ তাহাদিগের অজ্ঞাত।

১৮। তাহাদের একটুও ঈশ্বরের ভয় নাই।

১৯। এখন আমরা বেশ জানি যে, বিধি যাহা বলে, তাহা বিধিবাদীদিগের জন্য। সকল মুখ নিস্তব্ধ হউক, কারণ ঈশ্বরের নিকট সমুদায় জগৎ অপরাধী বলিয়া গণ্য।

২০। অতএব ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শরীর-ধারী কোন ব্যক্তি নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ তাহাদের পাপের জ্ঞান হইয়াছে।

২১। কিন্তু সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের ন্যায়পরতা প্রতিপন্ন হইতেছে। ঈশ্বরের বিধি-প্রচারক ঋষিরা ইহার সাক্ষী।

২২। তবে আর গর্ব্বের কারণ কোথায় ? কাহারও গর্ব্ব করিবার উপায় নাই মনুষ্যমাত্রেরই এই বিশ্বাসের আবশ্যক।

২৩। অতএব বিধি অনুসারে কার্য্য না করিয়াও এক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারা নির্দ্দোষ হইতে পারে, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

২৪। ঈশ্বর কি কেবল ইহুদীদিগের ঈশ্বর ? তিনি কি জেণ্টাইলদিগের ঈশ্বর নন ? হাঁ ! তিনি জেণ্টাইলদিগেরও।

চতুর্থ অধ্যায়।

১। অতএব বিশ্বাসদ্বারা দোষমুক্ত হইয়া আমরা ঈশ্বরের সহবাসে শান্তিলাভ করি।

২। বিশ্বাস দ্বারা আমরা ঈশ্বরের

কৃপা লাভ করি। এই কৃপা অবলম্বন করিয়া আমরা দণ্ডায়মান হই, এবং ঈশ্বরের গৌরবের আশায় আনন্দ করি।

৩। কেবল তাহাই নহে, আমরা যন্ত্রণাতেও উল্লাস করি ; আমরা জানি, যন্ত্রণা হইতে ধৈর্য্য আইসে।

৪। ধৈর্য্য হইতে লোকের অভিজ্ঞতা, ও অভিজ্ঞতা হইতে আশা উৎপন্ন হইবে।

৫। আশাতে আমরা লজ্জিত হই না, কারণ যে পবিত্র আত্মা আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগের হৃদয়ে বিস্তৃত হইতেছে।

৬। আরও আমাদের অপরাধ অধিক হয় তাহাতে কি? যেখানে পাপের প্রাচুর্য্য, সেখানে ব্রহ্মকৃপার আরও অধিক প্রাচুর্য্য।

৭। যেমন পাপের প্রভাবে মৃত্যু, তেমনি ব্রহ্মকৃপার প্রভাবে ধর্ম্ম হইতে অনন্ত জীবন।

পঞ্চম অধ্যায়।

১। আমরা তবে কি বলিব? ব্রহ্ম-কৃপা প্রচুর পরিমাণে আসিবে বলিয়া আমরা কি পাপে রত থাকিব?

২। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা পাপের পক্ষে মৃত-প্রায়, কেমন করিয়া জীবিত থাকিব?

৩। তোমরা কি জান না যে, আমাদের মধ্যে যতগুলি যিশুর নিকট দীক্ষা পাইয়াছে, তাহারা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতেও দীক্ষিত হইয়াছে।

৪। আমরা এই জানিয়াছি যে, আমাদের পুরাতন পশুভাব যিশুর সহিত ক্রুশে হত হইয়াছে, তাহাতে পাপেরও শরীর ধ্বংস হইয়াছে, অতএব এখন হইতে আমরা আর পাপের সেবা করিব না।

৫। যে ব্যক্তি মৃত, সে পাপ হইতে মুক্ত।

৬। আমরা যদি যিশুর সহিত মৃত হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত জীবিত থাকিব ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৭। আমরা জানি যে যিশু মৃত্যু হইতে পুনরুত্থিত হইয়া আর মরেন নাই, তাঁহার উপর আর মৃত্যুর অধিকার নাই।

৮। তিনি যে মরিলেন সে একবার পাপেতে মরিলেন, কিন্তু তিনি যে জীবিত, সে ঈশ্বরে চিরকাল জীবিত।

৯। তেমনি তোমরাও আপনাদিগকে পাপের জন্য মৃত মনে কর, কিন্তু ঈশ্বরে জীবিত বিবেচনা কর।

১০। অতএব তোমাদের মর্ত্ত্য দেহের উপরে পাপ আধিপত্য করিতে না পারে, এজন্য তোমরা যেন পাপের প্রবর্ত্তনার অধীন না হও।

১১। আরও তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ সকলকে অপবিত্রতার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া পাপের হস্তে দিও না, কিন্তু মৃত্যু হইতে জীবনপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আপনাদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, এবং তোমাদের অঙ্গ সকলকে পুণ্যের যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর।

১২। পাপ তোমাদের উপর আধিপত্য

করিতে পারিবে না, কারণ তোমরা দৈবের অধীন নও, ঈশ্বরের কৃপার অধীন।

১৩। কিন্তু আমরা দৈবের অধীন নই, ঈশ্বরের কৃপার অধীন, তাই বলিয়া কি আমরা পাপ করিব? ঈশ্বর এরূপ না করুন।

১৪। তোমরা কি জান না যে, তোমরা যাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে, তাহারই ভৃত্য; হয় পাপের ভৃত্য হইয়া মৃত্যুলাভ কর, নয় ঈশ্বরের অধীন হইয়া পুণ্যজীবন লাভ কর।

১৫। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমরা পাপের দাস ছিলে, কিন্তু তোমাদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তোমরা অন্তরের সহিত তাহা পালন করিয়াছ।

১৬। তোমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যের পরিচায়ক হইয়াছ।

১৭। তোমাদের শরীর দুর্ব্বল বলিয়া আমি মানুষের ন্যায় বলিতেছি যে, তোমরা যেমন আপনাদিগকে অপবিত্রতার সেবক করিয়াছিলে, এবং পাপ হইতে অধিকতর পাপে নিমগ্ন হইতেছিলে, সেইরূপ এখন তোমাদের অঙ্গ সকলকে পুণ্যের সেবক কর, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পবিত্রতা উপার্জ্জন কর।

১৮। যখন তোমরা পাপের অনুচর ছিলে, তখন তোমরা ধর্ম্মবিহীন ছিলে।

১৯। তোমরা যে সকল কার্য্যের জন্য এখন লজ্জিত হইতেছ, তাহার কি ফললাভ করিতেছিলে? সে সকলের পরিণাম মৃত্যু।

২০। কিন্তু এখন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দাস হইয়াছ, ইহার ফল পবিত্রতা, এবং অনন্ত জীবন।

২১। তোমাদের পাপের ফল মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দান অনন্ত জীবন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১। আমরা যখন জড় দেহে জীবিত ছিলাম, তখন কত প্রকার পাপের বীজ আমাদিগের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া তাহার ফল মৃত্যু আনয়ন করাইত।

২। কিন্তু এক্ষণে আমরা বিধি হইতে মুক্ত, কারণ আমরা যাহাতে বদ্ধ ছিলাম, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা আর পুরাতন বিধির বাহ্য নিয়মে কার্য্য করিব না। কিন্তু আত্মার নবীন ভাব দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিব।

৩। আমরা তবে কি বলিব? বিধি কি পাপজনক? না, কখন নহে। বিধির সাহায্য ব্যতীত আমি পাপ জানিতে পারিতাম না। দেখিও, তুমি লোভ করিও না, এই বিধি না পাইলে আমি লোভ জানিতে পারিতাম না।

৪। কিন্তু বিধির সূত্রে পাপ উৎপন্ন হইয়া আমার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিকার জন্মাইয়াছে। জানিও যে বিধি ব্যতীত পাপ মৃত হইয়াছিল।

৫। এক সময় বিধি ব্যতিরেকেও আমি জীবিত ছিলাম, কিন্তু যখন বিধি আসিল, পাপ পুনর্জীবিত হইল, এবং আমি মরিলাম।

৬। যে বিধি জীবনের জন্য নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছিল, আমি দেখিলাম, তাহা আমার মৃত্যুর কারণ হইল।

৭। পাপ বিধির সূত্রে উৎপন্ন হইয়া আমাকে প্রবঞ্চনা করিল ও অবশেষে আমাকে হত করিল।

৮। অতএব নীতি পবিত্র, এবং বিধি পবিত্র, ন্যায়সঙ্গত ও সাধু।

৯। তবে কি যাহা সাধু, তাহা আমার মৃত্যুর জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল? পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবার জন্য যাহা সাধু তাহা দ্বারা মৃত্যুকে আনয়ন করিল। ইহাতে বিধিনির্দ্দিষ্ট পাপগুলি অত্যন্ত ক্লেশজনক হইল।

১০। আমরা জানি যে, বিধি আধ্যাত্মিক, কিন্তু আমি পাশবপ্রকৃতি, তাই পাপে বিক্রীত।

১১। আমি যাহা মনোনীত করি না, তাহাই আমি করি, এবং যাহা আমি করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না। কিন্তু যাহা আমি ঘৃণা করি, তাহাই আমি করি।

১২। অতএব আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা যদি আমি করি, তাহা হইলে বিধি যে সৎ তাহা আমি অনুমোদন করিতেছি।

১৩। তবে আমি এ কার্য্য করিতেছি না, আমার অন্তরে যে পাপ আছে, তাহাই ইহা করিতেছে।

১৪। আমি জানি আমাতে অর্থাৎ আমার রক্তমাংসে কিছুই ভাল নাই; কারণ, ভাল করিবার ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা আমি জানি না।

১৫। যে ভালটি আমি ইচ্ছা করি, তাহা আমি করি না; কিন্তু যে মন্দটী ইচ্ছা করি না, তাহাই করি।

১৬। অতএব আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহাই যদি করি, তবে আমি ইহার কর্ত্তা নই, আমার অন্তরস্থ পাপই ইহার কর্ত্তা।

১৭। ইহার মধ্যে আমি একটী নিয়ম দেখিতে পাই যে আমি যখন ভাল করিতে ইচ্ছা করি, তখন মন্দ আমার সহিত বর্ত্তমান থাকে।

১৮। ভিতরের মানুষের ইচ্ছানুসারে আমি ঈশ্বরের নিয়মে আনন্দ অনুভব করি।

১৯। আমি দেখিতে পাই, আমার অঙ্গ সকলের মধ্যে আর একটী নিয়ম আমার মনের নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, এবং আমার অঙ্গ সকলের মধ্যে যে পাপের নিয়ম রহিয়াছে, আমাকে তাহাতেই আবদ্ধ করিতেছে।

২০। হায়! আমি কি হতভাগ্য, কে এই মৃত্যুময় শরীর হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে?

অষ্টম অধ্যায়।

১। যাহারা ইন্দ্রিয়ের অধীন, তাহারা ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ই ভাবে। কিন্তু যাহারা আত্মার অনুগত, তাহারা আত্মার বিষয় সকল ভাবে।

২। ইন্দ্রিয়াসক্ত মতিই আমাদের মৃত্যু,

আধ্যাত্মিক মতিই জীবন এবং শান্তির কারণ।

৩। ইন্দ্রিয়াসক্ত মতিই ঈশ্বরের বিপক্ষ, ইহা ঈশ্বরের নিয়মাধীন নহে, বস্তুতঃ হইতেও পারে না।

৪। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারা কখনও ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না।

৫। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করে,তোমরা শরীরে নও, কিন্তু আত্মাতেই বাস কর। এখন খৃষ্টের আধ্যাত্মিক ভাব যাহার মধ্যে নাই, সে তাঁহার কেহ নয়।

৬। যদি খৃষ্টাত্মা তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে পাপের জন্য শরীর মৃত. কিন্তু ধর্মের জন্য আত্মাই জীবন।

৭। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমরা ইন্দ্রিয়ের নিকট ঋণী নই, এবং ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি অনুসারে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য নই।

৮। যদি তোমরা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অনুসারে চল, তোমরা মরিবে; কিন্তু যদি আত্মার প্রভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল খর্ব্ব কর, তাহা হইলে তোমরা বাঁচিবে।

৯। যতগুলি লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।

১০। তোমরা বন্ধনের দশা পাও নাই যে, ভয় করিবে। কিন্তু তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের ভাব পাইয়াছ, সেইজন্য আমরা বলি ঈশ্বর আমাদের পিতা।

১১। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, পরমাত্মা ও আমাদের আত্মা তাহার সাক্ষী।

১২। আমরা যদি মহান্ ঈশ্বরের সন্তান হই, তাহা হইলে আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং যিশুখৃষ্টের সম অধিকারী। আমরা যদি তাঁহার সহিত ক্লেশ ভোগ করি, তবে তাঁহার সহিত গৌরবান্বিতও হইব।

১৩। আমার মতে যে গৌরবের জ্যোতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের ক্লেশ কিছুই নয়।

১৪। জীবের ঐকান্তিক আশা যে, সে ঈশ্বরের পুত্ররূপে প্রকাশিত হয়।

লেডি মেরী।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাদরী রেভারেণ্ড জেরাল্ড আস্‌ট্রপার এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইল্‌ষ্টেল্‌গ্রামবাসী দরিদ্র শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়া ও করুণার কথা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কই আজও পর্য্যন্ত ত কোন

শুভ ফলের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। আজও ত ইল্‌ষ্টেন্‌গ্রামবাসিগণ মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী শোকের সময়, কষ্টের সময়, দুঃখের সময় ভগবানের সৃষ্টির বিধানের প্রতি অনেক দোষারোপ ও তাঁহার দয়া এবং করুণার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতে ছাড়িল না। মানুষের জীবন যে ঈশ্বরের করুণার প্রবাহমাত্র, এবং জাগতের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট ও শোক যে তাঁহারি প্রদত্ত দান, তাহা তিনি তাহাদিগকে চোকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তথাপি তাহারা বুঝে না। তথাপি তাহারা শোকের সময় ক্রন্দন করে; দুঃখের সময় ঈশ্বরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে থাকে। হায়! তিনি তাহাদের মধ্যে ভগবানের দয়া ও করুণা প্রচার কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। যাহাতে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয় এরূপ বহু চিন্তায় অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। ইহার অধিক আর তিনি কি করিবেন? বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম প্রাণ ও ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ চিন্তাও নিরুৎসাহজনক।

ডান্ মরগানের চিরজীবন বড়ই কষ্টে কাটিয়াছে। আজ আবার তাহার নয়নের আলোক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পার্শ্বস্থ গৃহে কফিনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আজ এই চিরদুঃখী শোকাহত ডান্ মরগানকে কি বলিয়া তিনি সান্ত্বনা দান করিবেন। সে যখন সংসারে তাহাকে কঠোরতর দণ্ড প্রদান করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিল, তখন তিনি তাহার কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। যখন ডান্ মরগান বলিল,—

পাদরী মহাশয় আপনি ঈশ্বরের দয়া ও করুণার বিষয় যাহা বলিতেছেন, তাহা আপনার ন্যায় যুবা লোকের পক্ষেই বলা সাজে। কেননা আপনি জগতের কিছুই জানেন না। আপনাকে আমি ব্যথিত করিতে চাহি না। অবশ্য আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই বলিতেছেন। নান্ যখন জীবিত ছিল, তখন আমি ঈশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসশীল, সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে নান্ চলিয়া গিয়াছে, আর আমি ঈশ্বরের দয়া ও করুণার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

পাদরী ডান মরগানের এই উক্তির কি বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। তথাপি যাহা হউক তাড়াতাড়ি একটা উত্তর দিবার জন্য বলিলেন—

ডান, ঈশ্বরের বিধান মন্দ বলিয়া বিচার করা ও ধরিয়া লওয়া কাহারও উচিত নহে। দেখ, প্রত্যেক মেঘখণ্ডের পার্শ্বদেশ সূর্য্যালোকে অনুরঞ্জিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পাদরী আন্‌সট্রুথার এই কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু শোকাহত মরগানকে সান্ত্বনা দিবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুপযুক্ত

বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি বুঝিলেন যে, এতদিন ঈশ্বরের দয়া ও করুণা প্রচার কার্য্যের সংস্পর্শে আসিয়া এক্ষণে তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তৎপরে তাঁহার মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন -

"যখন আমি প্রথম এ স্থানে আগমন করি, তখন আমি নিজ ক্ষমতার উপর অধিকতররূপে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি ইল্‌ষ্টেলগ্রামবাসিগণের প্রকৃতি বুঝিতে পারি নাই। আমাকে পুনরায় নূতন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। নতুবা আর সিদ্ধকাম হইবার আশা নাই।"

তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্রুতবেগে গ্রামাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর, সদ্ভাবপূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ও তাঁহার দৃঢ় পদবিক্ষেপ তাঁহাকে একজন দৃঢ়চেতা ও অধ্যবসায়ী লোক বলিয়া সূচিত করিতেছিল। তিনি গ্রামের সন্নিকটস্থ হইলে, একটা ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ স্থান হইতে গ্রামের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল! ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া শ্বেতবর্ণ গির্জ্জাটি কি সুদৃশ্য দেখাইতেছিল! পাঁচ বৎসর হইল তিনি এই গ্রামে আসিয়া তাঁহার অভীপ্সিত ভগবানের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। গ্রামের বৃদ্ধ জমিদার ক্র্যানবয়েন রহস্য করিয়া তাঁহাকে "ধর্ম্মোন্মত্ত পাদরী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি একবার তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—

"দেখুন, মিঃ আন্‌সট্রুথার, এই সমস্ত মস্তিষ্কহীন শৃগালদের মধ্যে বৃথা কাজে আপনার যৌবনের উৎসাহ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যদি গ্রামবাসিগণের সাহায্যকল্পে আপনার অর্থ কিম্বা বস্ত্রাদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাকে তৎক্ষণাৎ অনুগ্রহ করিয়া তাহা জানাইবেন। আমি তাহা প্রদান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত জানিবেন। কিন্তু এই সমস্ত নির্ব্বোধ জানোয়ারদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ আমার নিকট উত্থাপন করিবেন না। আমার বিশ্বাস যে, এই সমস্ত শৃগালদের মধ্যে ধর্ম্মভাব বলিয়া কোন বস্তু নাই।" এক্ষণে এই বৃদ্ধ দারের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর এক্ষণে তাঁহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী লেডি মেরি তাঁহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। গ্রামবাসিগণের সাহায্যকল্পে পাদরী আন্‌সট্রুথার অর্থ প্রার্থনা করিলে ক্র্যানবয়েন পরিবার অকাতরে তাহা দান করিতেন, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতির কোন কার্য্যে তাঁহারা কখন কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন না।

এক্ষণে পাদরী আন্সট্রুথার গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একজন সাহায্যকারী ব্যতীত তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু

কে এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার সহায় হইবে? ক্র্যানবয়েন পরিবারের নিকট গ্রামবাসিগণের ধর্ম্মবিষয়ক উন্নতি সম্বন্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা বৃথা। এই জমিদার-পরিবার এতকাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। গ্রামের যিনি ডাক্তার তিনি ঠিক তাঁহার মনের মত লোক। কিন্তু তিনি গ্রামবাসিগণের শারীরিক ব্যাধি মোচন করিতে যেরূপ তৎপর, মনের ব্যাধি ও পাপ তাপ ইত্যাদি মোচন বিষয়ে তাঁহাকে সেরূপ তৎপর দেখা যায় না। তিনি বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও তাঁহাকে নূতন পথ দেখাইয়া দিবার কি জগতে কেহ নাই? এক জন সহায় প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় যখন তাঁহার হৃদয় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে সহসা ঘোটকের পদ-শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, গ্রামের নূতন ভূম্যধি-কারিণী লেডি মেরি ক্র্যানবয়েন তাঁহার পিতৃস্বসা মিসেস আকরাইটের সহিত যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে শকটারোহণে আসিতেছেন। লেডি মেরির শকট তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া লেডি মেরির আনন বন্ধুতাভাবব্যঞ্জক মধুর হাস্যে অনু-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। নূতন ভূম্যধিকারিণী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার শকট চলিয়া গেল। লেডি মেরির দর্শনে হঠাৎ তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, লেডি মেরি কি তাঁহার মহৎ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন না? তিনি জানিতেন যে, গ্রামবাসিগণের উপর ক্র্যানবয়েন পরিবারের অসীম প্রভাব। তাঁহাদের মুখের কথা তাহারা রাজবিধির ন্যায় মানিয়া লয়। গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস যে, ক্র্যানবয়েন পরিবারের লোকেরা যে চিন্তা করে, যে কার্য্য করে, তাহা কখন মন্দ হইতে পারে না। অধিকন্তু হয়ত গ্রাম-বাসিগণের সম্বন্ধে এই নূতন ভূম্যধিকারিণী লেডি মেরির মত পূর্ব্বতন জমিদার অপেক্ষা অধিকতর অনুকূল হইতে পারে। যদি তিনি লেডি মেরিকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতে ও গ্রামবাসিগণের সম্পর্কে সর্ব্বদা আসিতে সম্মত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই একজন ক্ষমতা-শালী সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইবেন। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তিনি সেইক্ষণেই লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি যাহা সঙ্কল্প করিতেন, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যে পরিণত করিতে তৎপর হইতেন। লেডি মেরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করিবামাত্র তিনি অবিলম্বে ক্র্যানবয়েন-প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পথে তাঁহার প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা নান্‌সির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা নান্‌সি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল—

"মহাশয়, আজ কি সুন্দর দিন।" নান্‌সিকে ঠিক সন্তোষের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়ভাব, ভবিষ্যতের চিন্তা ও সাংসারিক দুঃখ কষ্টের পীড়ন নান্‌সির অন্তঃকণকে কখন ক্লিষ্ট করিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় সর্ব্বদাই শান্তি ও সন্তোষে পূর্ণ। নান্‌সি পুনরায় বলিল—

"মহাশয়, এমন মনোহর দিন যে ঈশ্বর আমাদিগকে ভোগ করিবার জন্য দান করিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

তিনি উত্তর করিলেন—"হাঁ, নান্‌সি, এই পৃথিবী অতি সুন্দর স্থান। কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এই সুন্দর পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ন্যায় পাপী মানবেরাই সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত সৃষ্ট বস্তু।"

নান্‌সি উত্তর করিল—

"আপনার কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এই সুন্দর পৃথিবীর ন্যায়ই সুন্দর। এই আমাদের মাননীয়া নূতন ভূম্যধিকারিণীকে দেখুন না কেন। তিনি এইমাত্র এই স্থান দিয়া শকটারোহণে গমন করিয়াছেন। তিনি যে একজন বিখ্যাত সুন্দরী রমণী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকলে বলিতেছে যে, লণ্ডনের তিন জন সুপুরুষ ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের সকলকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।" নান্‌সির এইরূপ উক্তিতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—

"হয় ত তোমাদের ভূম্যধিকারীর উত্তরাধিকারিণী এতদপেক্ষা উচ্চতর পদস্থ অন্য কাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যেরূপ সুন্দরী, তাহাতে বোধ হয় দীর্ঘকাল এ স্থানে অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহাকে থাকিতে হইবে না। তবে এখন বিদায়, নান্‌সি।"

নান্‌সি প্রত্যুত্তর করিল—

"বিদায়, মহাশয়।" তৎপরে তিনি ক্র্যানবয়েন-প্রাসাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

লজ্জাবতী বসু।

বিবাহ।

সত্য কি উদিবে উষা সে নব প্রদেশে গিয়ে,
এ গৃহে আনন্দরশ্মি সবটুকু সাথে নিয়ে।
উষা সম হাস্যময়ী সুখে দুঃখে তোরে হেরি,
গগনের উষা সনে তোর যে তুলনা করি।
গগনেতে উষা উদি ত্রিভুবনে প্রাণ দেয়,
উষা সম্মিলনে ধরা নবীন উৎফুল্লময়।
তেমনি এ পুণ্য গেহে তুমি উদেছিলে রাণী,
ঘন বিষাদের মাঝে ছিলে আনন্দের ধ্বনি।
তব আর্ত্ত-দুঃখি-সেবা, পবিত্র মূরতি হেরি,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত দুঃখ গেছে অপসরি।

সরলতা দেবগুণ বিভুদত্ত মহাদান।
সে মধুর স্নিগ্ধ বারি জুড়াইছে তপ্ত প্রাণ,
প্রিয়জন শোক তাপ কত হৃদি পরে গেছে।
বিভুপ্রেমানন্দে থাকি সে বিচ্ছেদ পাসরিছে।
যে তোরে হেরেছে ঊষা সে তোরে
বেসেছে ভালো,
সদ্‌গুণে সবার হৃদি তুই করা'স্ আলো।
শোকাহতা দিদিমার তুমি যে সম্বল রাণী,
বজ্রদগ্ধ হৃদে তাঁর দিয়াছ শান্তির বাণী।
কেন ঊষা শুভদিনে সব কথা মনে হয়,
স্মৃতির তীখন বাণে জর্জ্জরিত এ হৃদয়।
তারা কি এসেছে ঊষা শুভ সম্মিলন মাঝে,
তাই কি তাদের স্মৃতি প্রাণে আজ বড়
রাজে।
কমল কোরক সম সাধু অবিনাশ ভ্রাতা,
দিবা অবসান হল বলে গেল শেষ কথা।
সেই যে চলিয়া যান ব্রহ্মভক্ত ঋষি,
যাঁর ত্যাগ, ধর্ম্মজ্ঞান ভারতে রয়েছে মিশি।
যে সাধু ভক্তেরে লয়ে বঙ্গমা'র মুখোজ্জ্বল,
যার ব্রহ্মজ্ঞান সুধা ভারতের মহাবল।
আত্মার কভু নাহি বিনাশ যোগলব্ধ জ্ঞানে
যিনি বলেছেন, ঊষা ধ্রুব তিনি আজ
এখানে।

আশীষ করেন তোমা অলক্ষ্যে অদৃশ্যকায়,
সত্যবান, স্নেহময় সে যোগীন্দ্র যবে যায়,
জ্ঞান দৃষ্টি খুলে দেখ পুণ্যাত্মা সে
জ্যোতির্ম্ময়।
ব'লেছিল ঊষারাণী ভুলনাকো দয়াময়।
মৃত্যু আর কিছু নয় দুই দিন আগে পরে,
তার তরে কেন, মাগো, শোক-অশ্রুবারি
ঝরে।
কয়দিন পরে মোরা মিলিব সকলে সেথা,
সেথা যে পিয়াসা নাই রোগ, শোক, জরা,
ব্যথা।
সে দিন যে চলে গেল সোণার প্রতিমাখানি,
রোগে শোকে চিরদুঃখে মুখে ছিল বিভু
বাণী।
কত সে কেঁদেছি ঊষা নিভৃতে একান্তে বসি,
তোরে মাতৃহীনা হেরি স্মরি গো বিষাদ-
রাশি।
কি আর বলিব রাণী এ গৃহের পুণ্য গাথা,
বঙ্গ জননীর বুকে আছে গো সে স্মৃতি গাঁথা।
কেন তবে দুঃখ আর স্বর্গ মর্ত্ত সম্মিলনে,
এ আশীষ বিভুপদে চিরসুখী হও প্রেমে।
সংসার কর্ত্তব্যপথে, নব যাত্রী মা আমার,
সে ব্রতসাধনে তুমি বিভুপ্রেম করো সার।

শ্রীমতী লীলাবতী।

হিন্দুগৃহে বধূ-যন্ত্রণা।

আজ বহুকাল পরে অনেক ভাবিয়া হিন্দু-গৃহে বধূর যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিতেছি। সেই জন্য আজ লেখনী ধরিয়া, আমার বঙ্গীয়া ভগিনীদিগকে সেকালের মত একালেও যে বধূর যন্ত্রণা আছে, সেই কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধুনা শিক্ষিতা বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতা মহিলারা যখন নিজেরা বধূ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শ্বশ্রূরূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন যেন তাঁহারা 'স্নেহের পুতলী' বধূদিগের প্রতি নিগ্রহ না করিয়া অনুগ্রহই প্রকাশ করেন।

হিন্দুসমাজের প্রায় ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি বড়ই অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। আমার অনুমান শতকরা ৫ জন বধূ শ্বশ্রূর স্নেহের অধিকারিণী হইতে পারেন। অবশিষ্ট ৯৫ জন শ্বশ্রূর কাছে অশেষ প্রকারে বাক্যের ও অন্যবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে ইহার কারণ কি? আমি অনুমান করি, ইহার প্রধান কারণ দুইটী মাত্র—প্রথম হিন্দুসমাজে পুত্র উপযুক্ত, স্বাধীন এবং উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, হিন্দুসমাজে উপযুক্তরূপ স্ত্রীশিক্ষার অভাবে পুত্রবধূ বা শ্বশ্রূ অশিক্ষিত হওয়া।

অশিক্ষিতা রমণীরা সময়ে সময়ে এক প্রকার কাণ্ডজ্ঞানরহিতা হয়েন। তাঁহারা রমণী হইয়া সময়বিশেষে রমণীর প্রধান ভূষণ যে দয়া, স্নেহ, মমতা এবং কোমলতা তাহা হইতে বর্জ্জিত হন।

দয়াময় পরমেশ্বর শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকলকেই, এমন কি জীব জন্তুদেরও হৃদয়ে 'অপত্যস্নেহ' সমভাবে দিয়াছেন। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলি পরিস্ফুটিত এবং বুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জিত হয় নাই, তাহারা সেই স্নেহকে স্বার্থজড়িত করিয়া নিজ শিক্ষাহীনতার পরিচয় নিজেরাই দিয়া থাকেন।

পুত্র জন্মিলে পুত্রমুখ দেখা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু সেই পুত্র কত রোগ, বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পর পুত্রবধূর মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জানি না, সেই স্নেহের ও আদরের ধনকে কিরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ এবং অযত্ন করা যায়। সেকালের বৃদ্ধা শ্বশ্রূদিগকে দেখিয়াছি ও তাহাদিগের কথা শুনিয়াছি, পুত্র যদি বধূর সহিত সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলেই মহা অনর্থের ব্যাপার ঘটে। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা যে, পুত্র বধূকে ভালবাসিলেই মাতৃভক্তির হ্রাস হইয়া যাইবে। হায়! তাঁহারা জানেন না, 'দাম্পত্য প্রণয়' এবং 'মাতৃভক্তি' যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

পুত্র যদি মূর্খ হয়, (আমি এ স্থলে মূর্খ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরহিত মূর্খের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এম্ এ, বি এ, উপাধিধারী হইয়াও যাঁহারা মূর্খের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানরহিত নির্ব্বোধ, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) তাহা হইলে ত কথাই নাই, বালিকা বধূর যন্ত্রণার মাত্রা ষোল আনা বর্দ্ধিত হয়। স্নেহ ও করুণার পরিবর্ত্তে অসহ্য বাক্যবাণ ও নিগ্রহই সর্ব্বক্ষণ তাহার সহচর হয়। মাতৃপ্রীত্যর্থে বালিকাকে কর্কশ বাক্যে এবং অপ্রিয় ব্যবহারে জর্জ্জরিত করিয়া

সেই গুণধর পুত্র অনেক সময় মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। জননীও গর্ব্বের সহিত সকলের নিকট পুত্রের মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া ধন্য হন। এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতের গর্ভে তাহার যে কি বিষময় ফল নিহিত হইল, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না।

আর সে বালিকা বধূর দশা! তাহার একমাত্র সম্বল অহর্নিশি অশ্রুজল। অল্প বয়সে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, স্নেহ সহানুভূতির পরিবর্ত্তে সে স্বামী ও শ্বশ্রূ উভয়ের নিকট হইতে যন্ত্রণা ও বাক্যবাণ প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থলে জ্ঞানহীনা বালিকা যন্ত্রণা ও নিগ্রহ সহ্য করিতে না পারিয়া হয় তো আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করে। আর শ্বশ্রূদেবী পুত্রের আর একটী বিবাহ দিয়া, এবং সেই সঙ্গে ৪।৫ পাঁচ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা যৌতুক লাভ করিয়া আরও সুখী হন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়? নব বধূর উপর নিগ্রহ কি কম হয়? না, বরং মাত্রার আরও বৃদ্ধি হয়, এবং বার বার পুত্রের বিবাহ দিয়া অর্থ উপার্জ্জন ব্যবসার মধ্যে দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাতে কি পুত্র কখন শান্তি পায়? অবশ্য আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকল শ্বশ্রূই এইরূপ। যাহাদের স্ত্রীর সহিত 'প্রণয়' জন্মিয়াছে, তাহারা চিরদিনের মত মাতার দোষে শান্তিহীন হয়। এই সকল অশান্তির মূল কারণ একমাত্র হিন্দু রমণীর শিক্ষার অভাব।

পুত্র শিক্ষিত হইলেও শিশুকাল হইতে অশিক্ষিতা মাতার যে সকল অভদ্রোচিত ব্যবহার দেখিয়াছে ও শিখিয়াছে, তাহা শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুলিতে পারে না। শৈশবের শিক্ষা ভোলা এক প্রকার অসম্ভব। জানি না উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইলেও কেন লোকের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব হয়! মাতা পরম গুরু বটে, কিন্তু মাতৃবাক্য হইলেই যে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তাহা মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ইহাতে ভয়ানক ক্ষতি হয়, এমন কি বংশটী পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়, সেটাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সেই বংশের সন্তানেরাও যে নীচতা, হীনতা এবং অভদ্রোচিত ব্যবহার সকল শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আবার দেখিয়াছি অনেক শ্বশ্রূ-দেবীরা 'সুচি ব্যাধি'-গ্রস্তা হয়েন। তাঁহাদের বধূদিগের যন্ত্রণার কথা প্রত্যক্ষ না করিলে লিখিয়া বুঝান সম্ভব নহে। তাঁহাদের একমাত্র পবিত্র দ্রব্য গোময়! তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্যেই গোময় মিশ্রিত বারি ক্ষেপণ করিয়া সর্ব্বদা পবিত্রতা রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গে বধূদেরও দিনের মধ্যে ৩।৪ বার করিয়া সেই গোময়-মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া পবিত্র করিয়া লন। ইহার উপর বাটীর পুরুষদিগের কোন কথা বলিবার অধিকার নাই!

গৃহিণীর 'ব্রহ্ম অস্ত্র' সম্মার্জ্জনীর এতই প্রভাব যে, ভয়েতে কাহারও কোন কথা বলিতে সাহস হয় না। সুতরাং

পুত্রেরাতো কিছুই বলিতে পারে না। হিন্দুগৃহে পুত্রেরা নিজেই পরাধীন এবং জননীর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ। তাহাদের নিজেদের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা বলা একেবারেই অসম্ভব। গৃহিণীরা এটাও বোঝেন না যে, কালে ইহারও একটা বিষময় ফল ফলিবে। সেই বালিকা পুত্র-বধূরা বয়ঃস্থা হইয়া যখন ৪।৫টী সন্তানের জননী হইবেন, তখন তাঁহাদের মানসপটে যে 'সূচি ব্যাধির' ছায়া পড়িয়া যায়, তাহার বিষম কুফল এই হইবে যে, হতভাগিনীদিগকে নিজেদের 'ব্যাধি' লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা কখনইবা স্বামী পুত্রের সাহায্যের সময় পাইবেন, এবং কখনইবা তাঁহাদের সংসারের কর্ত্তৃত্বভার লইবার অবসর হইবে।

এতো গেল 'সূচি ব্যাধির' কথা। তাহার পর পিতা মাতার দেনা পাওনার বিষয় লইয়াও বধূর যে নিগ্রহ হয়, তাহা বর্ণনাতীত। অনেক স্থলে জনক জননী আদৌ বুঝেন না যে, তাঁহাদের সন্তানগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে সকলেই সংসারের সাহায্য করিতে প্রয়াসী। ইহা কাহারও বলিবার বিষয় নহে। যাহার যেরূপ সঙ্গতি, সে সেই রূপই দিবে। তাহাদের সহিত অর্থ লইয়া বিবাদ বড়ই নীচত্বের পরিচায়ক। এইরূপে অর্থের জন্য সন্তান-দিগের সহিত কলহ না করিয়া তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হইলে, অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে এমন অর্থ আনিতে পারিলে, তাহাদিগের বিবাহ দিলে কোন অনর্থই হয় না। যে কাপুরুষ নিজ স্ত্রীর ন্যায্য অভাব মোচন করিতে অক্ষম, এবং অর্থের জন্য যাহার স্ত্রীকে শ্বশ্রুর গঞ্জনা শুনিতে হয়, তাহার পক্ষে বিবাহ করাই বিড়ম্বনা মাত্র। আজ ভারতের এতাধিক দারিদ্র্যতাও সেই জন্য। ইংলণ্ডে এরূপ নিয়ম নাই বলিয়াই সে দেশের লোক এত উন্নত।

বধূ যদি ভদ্র বংশের এবং ভদ্র পরি-বারের কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন বড়ই দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। কেননা এ সকল বিষয়ে সে হয় তো একেবারেই অনভ্যস্ত। তবে অশিক্ষিতা মাতার কন্যা হইলে তাহার ততটা কষ্ট হয় না। কেননা সে পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া আছে এবং ভ্রাতৃবধূদের উপর জননীর ব্যবহার দেখিয়া হয় তো শ্বশ্রুর নিকট সেইরূপ ব্যবহার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকে। আর যে ভদ্র পরিবারের কন্যা শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়েই ভদ্রোচিত ভাব পাইয়াছে, তাহার পক্ষে এরূপ ব্যবহার নূতন ও অদ্ভুত এবং কষ্টকর। কেননা, যে যেরূপ ভাবে প্রতিপালিত হয়, এবং শিক্ষা দীক্ষা পায়, সে তাহার বিপর্য্যয় দেখিলেই নূতন ও অদ্ভুত মনে করে। সে যাহা কখনও কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই, সেই সকল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া যায়।

এ তো গেল মেয়েদের কথা, তাহা ছাড়া বধূকে পিত্রালয় পাঠাইবার সময় এক

ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বধূর কোন আত্মীয় বা ভ্রাতা আনিতে গেলে, তাহাকে অনেক সময় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিতে হয়। বধূর পিতা মাতা গৃহিণীকে যথাবিহিত সম্মান দেখাইয়া এবং রৌপ্য মুদ্রার শ্রাদ্ধ করিয়াও তাহার বিনিময়ে শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন না। আমার গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি যে, বহু ভদ্র পরিবারের ভিতর এই সকল নীচ ও ইতরজাতীয় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নব বধূর স্বামিগৃহে আগমনের পর অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারে ঝি ও পাচিকার সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং সেই ঝি ও পাচিকার কার্য্য নববধূ দ্বারাই সম্পন্ন করান হয়। কি ভয়ানক অত্যাচার! যত কিছু নীচ কার্য্য তাহা করিয়াও তাহার অব্যাহতি নাই। তাহার উপর আবার বাক্যযন্ত্রণা এবং প্রহার পর্য্যন্তও অদৃষ্টে লাভ হইয়া থাকে।

কোন বালিকার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, অর্থাৎ সে যদি স্বামীর স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে সকল নীচ কার্য্যে অভ্যস্ত থাকে, অর্থাৎ সে যদি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে ততটা কষ্ট পাইতে হয় না। স্বামীর স্নেহে শ্বশ্রূদেবীর বাক্য সুধা বর্ষণ সহিবার ক্ষমতা হয়। আর যাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ ‘স্বামিপ্রণয়’ও মিলে না, সে যদি নীচ কার্য্যগুলিতেও অনভ্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। ধনী এবং ভদ্র পরিবারের সন্তান হইলে, ধনী পিতা হয়তো কেবল মাত্র এম্.এ,বি,এ, পাস দেখিয়াই ভুলিয়াছিলেন, বংশ চরিত্র কিছুই দেখেন নাই।

অনেক বধূর পরিধান বস্ত্র এমন অব্যবহার্য্য ও মলিন দেখিয়াছি যে, তাহা ভদ্র লোকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারেন না। কিন্তু বাড়ীর কাহারও সে দিকে লক্ষ্য থাকা দূরের কথা, পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরাও একটা মহা অপরাধের বিষয় বলিয়া মনে করা হয়! বঙ্গদেশে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই ধোপার খরচে এত কার্পণ্য যে, সেরূপ অন্য দেশে খুব কমই দেখা যায়। মোট কথা সকল প্রকারের যত কিছু যন্ত্রণা দেওয়া যাইতে পারে, সেই সকলই বালিকা বধূর উপর দিয়া যায়।

বধূর প্রতি অত্যাচার প্রত্যেক হিন্দু গৃহের মধ্যেই দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানী মহিলাদিগের মধ্যে এরূপ ঘটে না। কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিয়াছি যে, বঙ্গগৃহ অপেক্ষা হিন্দুস্থানের বধূদিগের প্রতি যন্ত্রণার মাত্রা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বয়ঃস্থা গৃহিণীদের মুখে শুনা যায় আজ কালের বধূরা শ্বশ্রূ, দেবর ও ননদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মেও বড় শিথিলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সকল কথা সত্য হইতে পারে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নাই! শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে ভদ্র ও অভদ্র

পরিবারের কন্যাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়। কিন্তু বধূদিগের প্রতি শ্বশ্রূদিগের রূঢ় ব্যবহারই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। তাহার কোন ভুল নাই! কারণ যাহারা বালিকা বয়েসে শ্বশ্রূর নিকট যত অধিক যন্ত্রণা পাইয়াছে, তাহারাই বয়ঃস্থা হইয়া শ্বশ্রূর প্রতি তত শ্রদ্ধাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকে।

কর্ত্তব্যে শিথিলতার একমাত্র কারণ অশিক্ষিতা মাতার সন্তান বলিয়া শিক্ষার অভাব। অনেক মাতা মনে করেন যে, শ্বশুরালয় গিয়া কন্যাকে তো খাটিতেই হইবে, সুতরাং তাঁহার গৃহে তাহার আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনেই করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশিক্ষা এ সকলের একমাত্র কারণ।

হিন্দুসমাজে যদ্যপি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধান করা হয়, এবং ছাত্রজীবনে যুবকদিগকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিয়া, উপযুক্ত বয়সে উপার্জ্জনক্ষম হইলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে শিক্ষিতা রমণী বিবাহ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বধূযন্ত্রণা শেষ হয়। মোট কথা, বাল্যবিবাহ-প্রথা এককালে উঠিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। সকলেই জানেন যে, বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে বধূদিগের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচারের কথা শুনা যাইত। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজকাল ভারতের প্রত্যেক জাতিই পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু না কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আশা করি, হিন্দু ভগিনীগণ আমার এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সতর্ক হইবেন এবং ঘরে ঘরে, শিক্ষিতা মাতা ও শিক্ষিতা শ্বশ্রূগণ নিজ নিজ কন্যা ও পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দান করিয়া যন্ত্রণারূপ অত্যাচার হিন্দুর গৃহ হইতে উঠাইয়া দিবেন।

তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন যে, বধূর নিকট কিরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। তাঁহারা আরো দেখিবেন যে, প্রতি বঙ্গগৃহ কিরূপ সুখ ও শান্তির ভবন হইয়া উঠিবে।

বালিকা-বয়সে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় কখন বয়ঃস্থা হইলে প্রসারিত হইয়া শ্রদ্ধা প্রীতি দিতে পারে না। তাহারই মধ্যে শ্বশ্রূদেবীরা যেটুকু লাভ করেন, সে কেবল একমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এবং স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য বধূরা করিয়া থাকে।

ভগিনীগণ! আপনাদিগের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। হিন্দুগৃহে বধূর যন্ত্রণা বা শাস্তি যাহাতে লোপ পায়, সকলের সেই বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করাই আমার এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য! ভগবৎকৃপায় আমাকে কখন বধূযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু কয়েকটী পরিবারের মধ্যে যে সকল

দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনুষ্য সৃষ্টির উন্নত জীব হইয়া এ সকল যে বুঝে না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। স্নেহ মমতা পাইলে বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদান করিয়া থাকে, তবে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য তাহা কেন করিবে না? সিক্ত মৃত্তিকাতে যে ছাপ লাগান যায়, তাহা শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে চিরদিন রহিয়া যায়। অশিক্ষিত গৃহিণীরা যন্ত্রণা এবং দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা বালিকার কোমল হৃদয়ে যে ছাপ বসাইয়া দেন, তাহা তাহাদের জীবনের চির সহচর হইয়া যায়। সুতরাং তাহারাই আবার যখন শ্বশ্রুরূপে দণ্ডায়মান হয়, তখন শ্বশ্রুর নিকট যে ব্যবহার শিখিয়াছে তাহা বধূদিগের প্রতি করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, জননী ধৈর্য্যশালিনী ও মমতাময়ী হইলেও তাঁহার কন্যা বয়ঃস্থা হইলে কর্কশভাষিণী ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। তাহারও একমাত্র কারণ এই যে, নীচতার ভিতর থাকিয়া এবং সর্ব্বদা নানারূপ যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করিয়া তাহার স্বভাব বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। হিন্দুগৃহে দ্বাদশ বৎসরে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণরূপ হইয়া উঠে না। যে বয়সে পুতুলখেলার সময়, সেই বয়সেই তাহাদের বিষম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা সুশিক্ষার অভাবে কুশিক্ষাই পাইয়া থাকে। সে স্থলে কিরূপে ভবিষ্যতে এবং বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির উন্নতির আশা করা যায়? আর তাহার আশাই বা কোথায়?

যে হিন্দুধর্ম্মপ্রভাবে চৈতন্যদেব আপামর সাধারণকে প্রেম বিলাইয়াছিলেন, সেই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, ভগিনীগণ! আপনারা কোন্ প্রাণে স্নেহের পুত্তলি আদরের ধন পুত্রবধূদিগকে স্নেহের পরিবর্ত্তে কষ্ট এবং যন্ত্রণা দিয়া থাকেন? যে জাতি নিজ পরিবারের ভিতর স্নেহ, প্রেম দিতে অপারক, বিশ্বপ্রেম সে জাতি কোথা হইতে শিখিবে? সে জাতির উন্নতির আশাও দুরাশা মাত্র। জগদীশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ যেন গৃহের রমণীগণের শিক্ষা বিধানে সচেষ্ট এবং যত্নবান্ হইয়া ভগবৎকৃপায় হৃদয়ে শক্তি এবং উৎসাহ লাভ করেন। তাহা হইলে প্রতি হিন্দুগৃহ শান্তি ও সুখের আলয় হইয়া উঠিবে। ইতি

শ্রীমতী অ—সান্যাল।

চারিত্রিক ইতিকথা।*

অধুনা কবিবর মাইকেলের গ্রন্থাবলী সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সেজন্য বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যের সেবক ও পাঠক সকলেই ঋণী। বর্ত্তমান সংস্করণের পূর্ব্বে মাইকেল গ্রন্থাবলীর আর এক সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছিল। উহাতে "কুসুম কলিকা"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঘোষ মহাশয়ের লিখিত মাইকেলের কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। "বসুমতী" পুস্তক-বিভাগ হইতে মাইকেলের যে কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, উহার মধ্যেও সেই সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। সমালোচনাটী এক সময়ে বড় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। আজ পর্য্যন্ত সেরূপ পক্ষপাতশূন্য ও খাঁটি সমালোচনা খুব কম পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। এই "কুসুম কলিকা"-প্রণেতা প্রসন্ন বাবু কে, তাহার অনুসন্ধান করিতে বিরত হই নাই। কিন্তু "কুসুম কলিকা" কিম্বা তাহার রচয়িতা এতদুভয়ের কাহারও কোন সংবাদ কখনও পাইব এমন আশা ছিল না।

হঠাৎ কর্ম্মোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমায় যাইতে হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভূষণ বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে কাঁথিতে বাস করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার কোন কোন গ্রন্থের কোন কোন অংশবিশেষ রচিত হইয়াছিল, এ কথাও শুনিয়াছিলাম। কাঁথিতে গিয়া অবধি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন, এমন লোকের সন্ধান করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়।

প্রসন্নকুমার বাবু বয়সে প্রাচীন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতাতেই 'লণ্ডন মিশনরি কলেজে' এফ্, এ পড়েন। সেই সময়ে কবিবর হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রসন্ন বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু শুনিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কবিবর হেমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম।

হেমচন্দ্রের সহিত পরিচয়ের কিছুদিন পরে (সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা) প্রসন্ন বাবু তাঁহার দুই পুত্রের গৃহশিক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। এই সূত্রে হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু বৃদ্ধ বয়সে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যেও হেমচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও এমন সুন্দররূপে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যিনি তাহা শুনিতেন,

* "ইতি কথা" শব্দটী ইংরাজী anecdote শব্দের সহিত একার্থবোধক। প্রাচীন সাহিত্যিক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় "ইতি কথা" শব্দ প্রচলন করিয়াছেন। লেখক।

তাঁহাকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হইত। প্রসন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া অনেক দিন রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া তাঁহার নিকট অবিচ্ছিন্নভাবে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়াছি। আমার মনে হয় হেমচন্দ্রের প্রতিভা ও প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের সম্মান অমন করিয়া আর কেহ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যার ম্লান প্রদীপালোকে বসিয়া কত সময়ে দেখিয়াছি যে. সেই নির্জ্জন গৃহে হেমচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে শ্বেতশ্মশ্রু প্রসন্নকুমারের বার্দ্ধক্যসুলভ অবসাদ ও জড়তার ভাব তিরোহিত হইত ও তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব উৎসাহ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইত!

মাইকেলের কাব্য-গ্রন্থাবলীর সমালোচনার ভার হেমচন্দ্রের উপর পড়িয়াছিল। হেমচন্দ্র সেই ভার প্রসন্নবাবুর উপর দেন। প্রসন্ন বাবুর বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। বৃত্রসংহার কাব্য রচনাকালে প্রসন্নবাবু তাঁহার একজন প্রধান সহচর ছিলেন। প্রতিদিন যে অংশ রচিত হইত, সেটুকু সন্ধ্যার পর হেমচন্দ্র নিজে তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেন। অধিকাংশ সময় প্রসন্ন বাবু নীরবে শুনিয়া যাইতেন। হেমচন্দ্রের তাহা ভাল লাগিত না। তিনি সমালোচনা চাহিতেন। প্রসন্নকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সমালোচনার অতীত রাজ্যে বাস করিতেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের বারম্বার অনুরোধে তিনি অবশেষে সময়ে সময়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতেন। তখন হেমচন্দ্রের কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেরূপ অবস্থায় অপর কেহ হইলে নিজের কবিতা সম্বন্ধে লোকের মতামত জিজ্ঞাসা করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন মনে করিত, কিন্তু হেমচন্দ্রের সেরূপ দম্ভ সম্ভবপর ছিল না। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে সন্দিহান হইতেন। নিজের বিচার বুদ্ধিকে সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি নিজের মত, নিজের বিচার, বুদ্ধি ও নিজের কবিত্বশক্তিকে যতটুকু শ্রদ্ধা করিতেন, অপরের মত, বিচার, বুদ্ধি ও কবিত্বশক্তিকে ততোধিক শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাতেই তাঁহাকে অনেক সময়ে নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়া তুলিত। বঙ্গের অন্যান্য আধুনিক কবি অপেক্ষা তিনি বিনয়মহত্বে যে অনেক ঊর্দ্ধ লোকে বাস করিতেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অনেকেই জানেন হেমচন্দ্রের একটী প্রধান দোষ এই যে, তিনি সুরাপায়ী ছিলেন। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধও তাঁহার স্কন্ধে চাপাইরা থাকেন। প্রসন্ন বাবু হেমচন্দ্রকে যেরূপ মহৎ হৃদয়ের লোক বলিয়া বর্ণনা করিতেন, তাহা শুনিলে কালিদাসের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

অমিতব্যয়িতা এবং অতিরিক্ত দানশীলতার জন্যই যে কবিবর হেমচন্দ্র শেষজীবনে

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। প্রসন্নবাবুর নিকট শুনিয়াছি হেমচন্দ্র প্রতিভাশালী কবি না হইলেও, শুধু তাঁহার বিনয়, নম্র ব্যবহার ও দানশীলতার জন্যই আমাদের দেশের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি হইয়া থাকিতেন। কত দীন ছাত্র, কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, কত অনাথা বিধবা তাঁহার আশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? হেমচন্দ্র দান করিবার সময় অর্থের হিসাব দেখিতেন না। ওকালতিতে তাঁহার যেমন অর্থাগম হইত তেমনি অজস্রধারে তিনি অর্থব্যয়ও করিতেন। তাঁহার আয় ব্যয়ের হিসাব ছিল বলিয়া মনে হয় না, কোন হিসাব থাকিলে নিশ্চয় দেখা যাইত যে, তাঁহার খরচের অঙ্কগুলি জমার তুলনায় নিতান্তই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রসন্ন বাবু মাইকেলের গ্রন্থাবলীর যে সমালোচনা করিয়াছেন, উহা গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত হইবার পূর্ব্বে হেমবাবুর হাতে গিয়াছিল। হেমচন্দ্র উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার উপর যে ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, আমি সে গুরু ভার হইতে মুক্ত হইলাম। অধিকন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আমা অপেক্ষা উপযুক্ত লোকের দ্বারা সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।"

কবিবর নবীনচন্দ্র এক সময়ে প্রকাশ্যে হেমচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রও সে বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রসন্নবাবুর মুখে হেমচন্দ্রের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে উৎসুক হন। হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর নবীনচন্দ্র তদীয় সুহৃৎ ও হেমচন্দ্রের অনুজ ঈশানচন্দ্রের নিকট বলিয়াছিলেন "এমন লোকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আমি বাস্তবিক গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলাম।" নবীনচন্দ্র একদিন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন এ কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি হেমচন্দ্র সৌজন্য প্রদর্শনে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

হেমচন্দ্রের হৃদয় কত বড় ছিল তাহা একটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যখন প্রসন্নবাবু তাঁহার পুত্রদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদিন অপমানসূচক ব্যবহার করায় হেমচন্দ্রের এক পুত্রকে (শুনিয়াছি এই পুত্রের দেহান্ত হইয়াছে) তিনি বেত্রাঘাত করেন। বালক সামান্য প্রহারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠে, তাহাতে হেমবাবু অন্য গৃহ হইতে প্রসন্নবাবুকে একখানি চিরকুট লিখিয়া পাঠান। চিরকুট পাঠ করিয়া প্রসন্নবাবু শাস্তি বন্ধ করিয়া বালককে হেমচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রোদনপরায়ণ বালক, শিক্ষক জব্দ হইয়াছেন মনে করিয়া পিতার নিকট গেল। হেমচন্দ্রের নিকট গিয়া বালক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যেই একটী

মাত্র কথা উচ্চারণ করিয়াছে, অমনি হেমচন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া পুত্রের গণ্ডদেশে একটী চপেটাঘাত করিলেন। প্রসন্নবাবু তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া অধিকতর শাস্তি হইতে বালকটীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র কুপিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "আপনি কোন কথা বলিবেন না, ও আজ আপনাকে অপমান করিয়াছে, কাল আমাকে করিবে।"

বালক যাহা ভাবিয়া পিতৃসন্নিধানে গিয়াছিল তাহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিল। হেমচন্দ্র প্রসন্নবাবুকে বলিলেন "আপনি জানিবেন, আমাতে এবং আপনাতে কোন পার্থক্য নাই, আপনি আমার চাকর কিংবা অধীনস্থ ব্যক্তি নহেন। ভগবান্ আমার উপর এই পুত্রদের লালন পালন ও শিক্ষার ভার দিয়াছেন, কিন্তু বিষয়কর্ম্মে অনেকটা সময় দিতে হয় বলিয়া আমি নিজে উহাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে পারি না। আপনি আমার পরম সুহৃৎ যে সেই কঠিন কর্ত্তব্যপালনে স্বেচ্ছায় আমার সহায়তা করিতেছেন। আপনার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।"

যে দেশের ছাত্র ও ছাত্রের পিতা প্রাইভেট টিউটরকে ভদ্রবেশী ভৃত্য অপেক্ষা অধিক সম্মান করিতে জানেন না, সেই দেশে হেমচন্দ্রের মত লোকের জন্ম হইয়াছিল। প্রসন্নবাবু বলেন, "হেমচন্দ্রের মত জীবন্ত মানুষ খুব কম দেখিয়াছি।" হেমচন্দ্র যে জীবন্ত মানুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? জীবন্ত মানুষ না হইলে কি চক্ষু হারাইয়া, দারিদ্র্যের শিলাযন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াও পরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া লিখিতে পারিতেন —

"হেলিয়া আমার গায় লভিয়া আশ্রয়,
কতই লতিকা লতা ছিল সে সময়,
নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়েছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়।
দুর্গত আশ্রিত জন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।"

চিত্তবিকাশ।

হেমচন্দ্র শুধু কবি ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ লোক বঙ্গদেশে বিরল। এই দু'য়ের সমাবেশে তিনি আধুনিক বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের অনুলেপন দ্রব্য

প্রাচীন আর্য্যগণ বিবিধ প্রকার গন্ধদ্রব্য ও বিবিধ প্রকার অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা গাত্র ভূষিত করিতেন। তাঁহারা গন্ধদ্রব্য সকল ভাল বাসিতেন বলিয়া

দেবপ্রীতি উদ্দেশে ঐ গুলি দেবতাদিগকে নিবেদন করিতেন। শাস্ত্রে পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার দ্বারা যে পূজার বিধান আছে, সেই কয়েকপ্রকার উপচারের মধ্যেই গন্ধ উপচারটী আছে। পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করা না হইলেও কেবল গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করা হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে আর্য্য-দিগের প্রধান প্রীতিকর গন্ধ অনুলেপনটী দেবপূজার একটী প্রধান সামগ্রী ছিল।

প্রাচীন আর্য্যগণ স্নানের সময় উত্তম-রূপে অঙ্গসংস্কার করিতেন। ঐ অঙ্গ-সংস্কারকে পরিকর্ম্ম বলা হইত। একটী কাজ করিয়া প্রয়োজন বশতঃ তাহার অনুকূলে অন্য কাজ করাকে পরিকর্ম্ম কহে। ইহাই পরিকর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ। স্নানকালে পূর্ব্ব দিনের অনুলিপ্ত চন্দন বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এই জন্য স্নানাদি করিয়াই তাঁহারা ঐ গুলির প্রবোধন বা অনুবোধ করিতেন, অর্থাৎ যে সকল চন্দনাদির গন্ধ থাকিত না, আবার যত্নপূর্ব্বক সেই সকল গন্ধের উদ্দীপন করিতেন। এই জন্য এরূপ অনুষ্ঠানকে পরিকর্ম্ম বলা যাইত। কর্পূর, অগুরু, কস্তুরি ও কক্কোল সমভাগে একত্র করিলে যে দ্রব্য হয়, তাহাকে যক্ষকর্দ্দম বলে। ঐ সকল অনুলেপন যক্ষদিগের প্রিয় ছিল বলিয়াই হয়ত গুণানুসারে উহার নাম যক্ষ-কর্দ্দম হইয়া থাকিবে। ঐ অনুলেপনটী তৎ-কালে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। অনেক গুলি গন্ধ দ্রব্যের চূর্ণকে বাসযোগ কহে। পূর্ব্বকালে কেহ কেহ যক্ষকর্দ্দমের পরিবর্ত্তে উক্তবিধ বাসযোগ ব্যবহার করিতেন। সেকালে শরীরে ধার্য্য গন্ধ-দ্রব্য ও অনুলেপনদ্রব্য নানা প্রকার ছিল। যথা শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, সিলারস, মৃগনাভি, জাতিফলচূর্ণ, তাম্রপর্ণী (মুড়ামাংসী), পুষ্করমূল, বেণার মূল ইত্যাদি।

ঐ সকলের মধ্যে কোন কোনটী স্নানের পর গাত্র সুগন্ধ করিবার জন্য, কোন কোনটী নিজের ও অন্যের ঘ্রাণে-ন্দ্রিয়ের প্রীতি সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হইত। কোন কোনটী বা বিশেষ বিশেষ বিলাস বা বাবুগিরির জন্য মাখা হইত। কোন কোনটী শৈত্যনাশের জন্য, কোন কোনটী বা তাপনাশের জন্য, অঙ্গে লেপন করা হইত। কোন কোন গন্ধ-দ্রব্য দুর্ল্লভ ও দুর্মূল্য বলিয়া সাধারণ লোকে তাহা প্রস্তুত করিয়া বা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে পারিত না। কি ভদ্র, কি ইতর, কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই চন্দন,বেণার মূল প্রভৃতি অনেক-গুলি অনুলেপন দ্রব্য আদরপূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিতেন। কিন্তু প্রত্যেক গন্ধ-দ্রব্য ও প্রত্যেক অনুলেপন দ্রব্যই যে ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দনের অনেকগুলি গুণ বর্ণিত আছে। উহা বমি, জ্বর, কৃমি, তৃষ্ণা ও সন্তাপ শান্তি করে এবং মুখ ও অন্যান্য স্থানের রোগনাশ

করে। গাত্রে চন্দন লেপন করিলে তাহার সৌগন্ধে মনে এক প্রকার অনুপম আনন্দ উপস্থিত হয়। উহাতে এরূপ এক বর্ণনাতীত স্ফূর্ত্তি আনয়ন করিয়া দেয় যে, তাহা অনভিপ্রায়োপস্থিত বিমর্ষ-ভাবকে বহু দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। উহা যেমন বিষয়াভিলাষীর মনে রাগবিশেষ আনিয়া দেয়, তেমনি ঈশ্বরভক্তের হৃদয়েও ভগবৎপ্রেমের আবেশ জন্মাইয়া থাকে। তাহার কারণ সংক্ষেপে ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, মন প্রফুল্ল থাকিলে যিনি যে বিষয়ের অনুধ্যানেই নিবিষ্টপর থাকুন না, তিনি তাহাতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন। শ্বেত চন্দনের গাত্রসন্তাপ নাশ করিবার ক্ষমতা অনেকে উপলব্ধিও করিতে পারেন।

শ্বেত চন্দন যেরূপ তাপনাশ করে, তেমনি অগুরু চন্দন শৈত্যনাশ করে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে ;—

"চন্দনোড়ুম্বর দাহনির্ব্বাপণলেপানাং,
রাস্নাগুরূণী শীতাপনয়প্রলেপানাং
লোমজ্জোকো শীতং দাহত্বগ্দোষ-
স্বেদাপনয়নপ্রলেপনানাং।". ইত্যাদি।

অর্থাৎ দাহনাশক লেপন সকলের মধ্যে চন্দন ও উড়ুম্বর, শীতনাশক প্রলেপ সকলের মধ্যে রাস্না ও অগুরু, দাহনাশক, ত্বগ্দোষহারক ও স্বেদাপনয়ন প্রলেপন-সমূহের মধ্যে বেণার মূল শ্রেষ্ঠ।

বেণার মূল যে অত্যন্ত তাপনাশক তাহা আমরা অনেক দিন হইতে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম। এক দিন অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় যখন শরীরের ঘর্ম্ম ও তাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন বেণার মূল বাটিয়া গায়ে মাখিয়া দেখিলাম অত্যল্প কালের মধ্যে সেই অসহ্য উত্তাপের আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইয়া গেল। তখন হইতে শাস্ত্রোক্ত অনুলেপন সকলের গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। পুষ্করমূলেরও ঐরূপ গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। শীতের সময় অগুরু বা কৃষ্ণ চন্দন গায়ে মাখিয়া দেখিয়াছি যে, উহাতে শরীরের শৈত্য অনেকটা নাশ করে। ঐ সকল লেপন দ্রব্য ব্যয়সাপেক্ষ নহে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে পুষ্করমূল, বেণার মূল প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সহজলভ্য। কোন কোন অনু-লেপন দ্রব্য অল্প ব্যয়ে কিনিতে পারা যায়। সুতরাং সকলেই ইচ্ছা করিলে সহজলভ্য বা অল্পব্যয়লভ্য বিলেপন দ্রব্য সকল গায়ে মাখিয়া প্রীতি ও স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন।　　(ক্রমশঃ)

শিক্ষা

জগৎপাতা জগদীশ্বর মানবকে কতকগুলি বৃত্তি দিয়াছেন। সেই বৃত্তিগুলির যথাযোগ্য চালনার নাম শিক্ষা। চালনা না হইলে কোনও বৃত্তিই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না।

শিক্ষা দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তির চরমোৎকর্ষই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সুবিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি হীনচরিত্র বা স্বাস্থ্যহীন হইলে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই বলিতে হইবে।

বাল্যকালই সকল প্রকার শিক্ষার উপযুক্ত সময়। এই সময় মন অতি তরল থাকে, সুতরাং উহাকে ইচ্ছামত গঠিত করিতে পারা যায়। মানবচরিত্র কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র। অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা পরিবর্ত্তন করা বড়ই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কৃষক যেমন বীজের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে ফলের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিতে পারে, সেইরূপ বাল্যে অভ্যস্ত সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা দেখিলে মানবচরিত্র উন্নত কিম্বা কলুষিত হইবে, বুঝিতে পারা যায়।

বাল্যে যে সুশিক্ষালাভ হয়, তাহা সময়ে কতদূর কার্য্যকরী হয়, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

শৈশবে মাতা আমাদের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। কারণ জন্মগ্রহণের পর হইতেই অধিকাংশ সময় আমরা তাঁহারই নিকটে থাকি।

কেহ কেহ আবার স্বাবলম্বনপ্রভাবে বাল্যে সুশিক্ষা লাভ করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার উদাহরণস্থল। তিনি বাল্যে শিক্ষালাভের জন্য নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। অপরের বাসায় রন্ধনাদি কার্য্য করিয়াও নিজের পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করিতেন। বাল্যের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অবিচলিত অধ্যবসায় তাঁহার কার্য্যকারী জীবনের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

আবার বাল্যকালের কুশিক্ষা সমস্ত জীবনে কিরূপ আধিপত্য লাভ করে, ইতিহাসে তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মানবচরিত্রের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। কথাটা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাই, কেহ একটী বিষয় অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে, আবার কেহবা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারে না। ধ্রুব পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইয়াও ভগবানকে লাভ করিয়াছিল। আর কত মুনি কত ঋষি শত শত বৎসর তপস্যা করিয়াও তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হন নাই।

সে যাহাই হউক, বিশেষ যত্ন যে চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। আন্তরিক চেষ্টা করিলে প্রত্যেক লোকই ভাল হইতে পারেন। সকলেই মহৎ লোক হইতে না পারুন, কিন্তু বাল্যে সৎশিক্ষা লাভ করিলে যে জীবনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয়, এ কথা সকলেরই অনুমোদিত।

শারীরিক শিক্ষালাভ করিতে হইলে স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হয়। দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও মাদক দ্রব্য সেবন সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। অঙ্গ-চালনার প্রতি সকলের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের দেহটী একটী যন্ত্র-বিশেষ। যে কোনও অংশ চালনার অভাবে বিকল হইতে পারে। অতএব সকলেরই ব্যায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। কিন্তু অত্যধিক কিছুই ভাল নয়। ব্যায়াম না করা যেরূপ দূষণীয়, অত্যধিক ব্যায়ামও তদ্রূপ অনিষ্টকর। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে।

বাল্যকাল হইতে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি যদি সম্যক্ পরিমার্জ্জিত না হয়, তবে পশু ও মানবে অধিক প্রভেদ থাকে না। পুস্তক-পাঠ, সৎ-আদর্শানুসরণ প্রভৃতি এই শিক্ষার উপায়।

নৈতিক শিক্ষা (Moral and Religious training) ও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা না হইলে কোন শিক্ষাই ফলদায়ক হয় না। চরিত্রবল অনেকটা ধর্ম্মবলের উপর নির্ভর করে। মানব বিদ্বান্ ও ক্ষমতাশালী হইয়া যদি চরিত্রহীন বা নৈতিকবলহীন হয়, তাহা হইলে তাহার সকল শিক্ষাই ভস্মে পরিণত হয় এবং তাহাকে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

নেপোলিয়ন যুদ্ধের সময়েও বলিতেন—"Moral is to physical as ten to one" অর্থাৎ শারীরিক শক্তি অপেক্ষা নৈতিক বল দশগুণ প্রয়োজনীয়। নৈতিক বলের প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া কেহ যেন শারীরিক স্বাস্থ্য বিষয়ে উপেক্ষা না করেন। কারণ মন ও শরীরের অতি নিকট সম্বন্ধ, একটীকে অন্যটী হইতে পৃথক্ করা যায় না। যদি শরীর অসুস্থ থাকে, মানসিক তেজও নিস্তেজ হইয়া যায়।

মানসিক বলের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র অনুভূত হয়। মানব মানসিক তেজোবলে দৈবকেও প্রতিহত করিতে পারে। সাবিত্রী—সত্যবানকে, বেহুলা—তাহার স্বামীকে, মানসিক তেজোবলে মৃতাবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাট্ বাবর, মানসিক তেজোবলে স্বীয় পুত্র হুমায়ুনের ব্যাধি নিজ দেহে সংক্রামিত করিয়া পুত্রবাৎসল্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার আরও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তিই সমীচীন। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, আজকাল লোক ইচ্ছাশক্তিবলে মৃত ব্যক্তির আত্মা আনয়ন

করিয়া ইহপরলোকের সংবাদ আদান-প্রদান করিতেছে, দেখিতে পাইতেছি। অভ্যাস এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক তেজ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়।

নিম্নলিখিত উপায়গুলি ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। এগুলি পালন করিলে শরীর ও মনের উন্নতির অনেক সহায়তা হইতে পারে :—

১। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, অর্থাৎ ৪ দণ্ড রাত্রি থাকিতে অন্ধকার, ঝড়, বৃষ্টি বা নিদ্রা থাকা সত্বেও শয্যাত্যাগ।

২। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কিয়ৎক্ষণ নিম্নলিখিত প্রকারে চিন্তা করা—"আমি পরমাত্মার অংশ। আমি এই দেহ নয়। এই ঘর, বাড়ী, ধন, জন প্রভৃতিও আমার নয়। আমি কতকগুলি কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছি। আমাকে কোনও প্রলোভনে টলাইতে পারে না।"

৩। যে সময়ের যে কাজ, সেই সময়ে তাহা করা।

৪। যখন যে কার্য্য করিবে, সেই কার্য্য একমনে করা ও অন্য দিকে মন না দেওয়া।

৫। সর্ব্বদা একটা আয়োজনের ভাব পোষণ করা, অর্থাৎ অলস হইয়া বসিয়া না থাকা। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে নানাপ্রকার কুচিন্তা আসিতে পারে।

৬। প্রত্যহ অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ ভগবৎ-উপাসনা ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা।

৭। ন্যায়বিগর্হিত কোন কার্য্য না করা।

বাল্যকালই উপরি-উক্ত উপায়গুলি অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময়।

শিক্ষার শেষ নাই। কেহ বলিতে পারেন না যে, তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। যিনি তাহা বলেন, তিনি অহঙ্কারী। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি বিনয়ী। তাহার জ্ঞান-লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। অসীম ধীশক্তিশালী নিউটন (Newton) বলিয়াছিলেন—"আমি বহু চেষ্টায় জ্ঞানসমুদ্রের একটী বালুকাকণামাত্র সঞ্চয় করিয়াছি।" যাহার শিক্ষার সম্পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, তিনি মনুষ্য নন, দেবতা। দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণাবলী একাধারে তাঁহাতে বিদ্যমান।

ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৯৯ জন লোক অশিক্ষিত। কারণ পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষালাভের বিশেষ সুবিধা এদেশে নাই।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষার উৎকর্ষে শিল্প-বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতেছে। আর ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাবে লোকে গৃহবিবাদ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাব, এবং শিল্পবাণিজ্যের অবনতির নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ পাইতেছে।

শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষায় বালিকাদের কোমল অন্তঃকরণ হইতে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

যে ভারতবর্ষ এককালে শিক্ষা দীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যে ভারতবাসীর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাব চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাদের বংশধরেরা আজ শিক্ষার অভাবে চরিত্রহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর

হইতেছে। কালের কি অপার মহিমা! আশ্রমচতুষ্টয়ের ব্যবস্থা যে কি সুন্দর ছিল, যিনি ধীরচিত্তে দেখিবেন তিনিই তাহার মহত্ব স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বকালে লোকে ৩০।৩৫ বৎসর অবধি গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পাঠাভ্যাস করিত। তাহার পর বিবাহাদি করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবার উপযুক্ত হইত। সর্ব্বশেষে অপর দুই আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিত। আর আজকাল যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছাচারী হইয়া দিন দিন ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে। দেশের দরিদ্রতার ইহাও একটী অন্যতম কারণ।

শ্রীকৃষ্ণধন বসু।

নূতন সংবাদ

১। সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে প্রত্যেক বৎসর প্রায় (৮০০০০০০ × ২৮) বা ২২৪০০০০০০ (বাইশ কোটী চল্লিশ লক্ষ) মণ কাগজ ব্যবহৃত হয়।

২। সম্প্রতি বংশের (বাঁশের) কাগজ প্রস্তুতকরণপ্রণালী আবিস্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রিয়ার্ট নামক এক ইংরাজ দশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে এই প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। বংশগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মণ্ডে পরিণত করিয়া তৎপরে তাহা হইতে অতি উত্তম, স্থায়ী ও ব্যবহারোপযোগী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই কাগজে লেখা ও ছাপা অতি সুন্দর হয়।

৩। আমেরিকায় এক প্রকার নূতন অস্ত্র-চিকিৎসা হইয়া গিয়াছে। কোনও রোগীর নাসিকা পচিয়া গিয়াছিল। চিকিৎসক মহাশয় এক ব্যক্তির পায়ের হাড় লইয়া এক কৃত্রিম নাসিকা প্রস্তুত করেন, এবং ঐ রোগীর বাহুর লোমশূন্য স্থানে উহা বসাইয়া দেন। কয়েক মাস অতীত হইলে, সেই কৃত্রিম নাসিকার উপর মাংস জন্মে। অতঃপর চিকিৎসক মহাশয় উক্ত স্থান হইতে নাসিকাটী কাটিয়া লইয়া যথাস্থানে সংস্থাপিত করেন। এক্ষণে সেই নাসিকাটী আর কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না।

৪। ভারতহিতৈষী ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিপনের প্রস্তর মূর্ত্তি ইংলণ্ডে নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা এই বৎসরের মধ্যেই গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৫। পুত্রের পীড়াবশতঃ স্যর্ এড্ওয়ার্ড বেকার তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাতে এক্ষণে মাননীয় ডিউক সাহেব তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতেছেন।

৬। স্পেন দেশে ক্যাপিকোরিয়া প্রদেশের সোনামানামক নগরের গৃহগুলি সব কাষ্ঠনির্ম্মিত। তথায় অগ্নি লাগিয়া সহর পুড়িতে আরম্ভ করিলে, জলদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা হয়, কিন্তু

জলাভাব হওয়ায় নগরবাসিগণ মদের ডিপো হইতে মদ লইয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। ইহাতে ২৪০০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৭। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সামারসেট সায়ারের গ্লাষ্টনবেরী নগর হইতে সুরে প্রদেশের কিংষ্টন নগর পর্য্যন্ত একজন একটী বিড়ালকে লইয়া যান। কিংষ্টনে পৌছিয়া তিনি বিড়ালটীকে আর দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট পত্র আসে যে, বিড়ালটী গ্লাষ্টনবেরী নগরে ফিরিয়া গিয়াছে। কিংষ্টন নগর গ্লাষ্টনবেরী নগর হইতে ১৩৩ একশত তেত্রিশ মাইল দূর। বিড়ালের অদ্ভুত শক্তি!

৮। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ২৪ পরগণার বরিশা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার অত্যন্ত পারদর্শিতা ছিল। গোয়ালিয়র, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। বঙ্গদেশে ও যুক্তপ্রদেশে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

৯। শুনা যাইতেছে, দিল্লীর দরবারে বাদসাহী মেলা বসিবে। সাধারণ লোকে এই মেলায় আনন্দ উপভোগ করিবেন। ঝিন্দের রাজা উক্ত মেলায় ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল স্থাপনের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

১০। উদারচেতা বরোদারাজ গাইকাড় যথার্থই প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি দেখিতে ইচ্ছুক এবং তজ্জন্যই তিনি প্রজাহিতকর নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় রাজ্য আদর্শরাজ্যে পরিণত করিতেছেন। প্রজাগণ যদি সকলেই শিক্ষিত হয়, তাহা হইলে দেশের উন্নতি অনিবার্য্য, এই জন্যই তিনি স্বরাজ্যে প্রজাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার করিতে অত্যন্ত প্রয়াস পাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার রাজ্যে আরও অধিক বিস্তৃতভাবে লোকের জ্ঞানানুরাগবর্দ্ধনের জন্য "Free Reading-room" বা বিনামূল্যে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এখানে তাঁহার প্রজাগণ বিনাব্যয়ে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানোন্নতি করিতে পারিবে। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে এইরূপ এক একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রায় এক মাস হইল গাইকাড় এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই বরোদা রাজ্যে ২৪১ দুই শত একচল্লিশটীর উপর পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। বরোদাধিপতি আদর্শস্থানীয়। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

পুস্তকাদি সমালোচনা

"ঘরের কথা"—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত। মূল্য ৵৹ আনা মাত্র। এই পুস্তকখানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাতে কয়েকটী বঙ্গীয় পারিবারিক চিত্র সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে লেখার মৌলিকত্বও আছে।

"সরোজিনীর শুচিবাই" প্রভৃতি কয়েকটী গল্প অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দু পরিবারের মধ্যে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকদিগের শুচিবাই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে বিষময় ও শোচনীয় ফল উৎপাদন করে। আমরা আশা করি, আমাদিগের গৃহলক্ষ্মীরা এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করেন। গ্রন্থকার একজন প্রবীণ লেখক, ইনি বঙ্গসাহিত্য জগতে অপরিচিত নহেন।

বামারচনা।

চাঁদের প্রতি কুমুদিনী।

ওগো - ত্রিদিবের শশধর !
চাহি তব মুখ পানে।
সারা নিশি মগ্ন রই
তোমারি মহিমা ধ্যানে।

তুমি—প্রভাতে ফেলিয়া যাও—
বিষাদ আঁধারে রাখি।
নয়ন মুদিয়ে শুধু
তোমারে হৃদয়ে দেখি।

আমি—দেখিতে তোমার ওই,
ভুবনমোহন হাসি,
আপনা ভুলিয়ে সথে !
জেগে থাকি সারা নিশি।

ওগো—মলিন ধরায় আমি,
স্বরগে তোমার স্থান।
আদরে লবে কি দেব !
মোর এই ক্ষুদ্র প্রাণ ?

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

নিবেদন।

(১)

তোমার এ প্রেম রাজ্যে আমি অভাজন,
নাহি জানি পূজা ধর্ম্ম,
না জানি করিতে কর্ম্ম,
কেবল স্বার্থের মাঝে আছি নিমগন।
পাপে তাপে জর্জ্জরিত,
সদাই আমার চিত,

শুধু "দাও" "দাও" শব্দ অন্তরে আমার,
মেটে না আকাঙ্ক্ষা আশা,
প্রাণ ভরা শুধু তৃষ্ণা,
বাসনা জাগিয়া হৃদে উঠে অনিবার।

(২)

কিনা তুমি দিয়াছ গো এ অধম জনে?
দেছ প্রাণ, দেছ হিয়া,
মরমে মমতা দিয়া
গঠিয়াছ আমারেত তুমি সযতনে।
কিন্তু নাথ! কেন বল,
অন্তর না তৃপ্ত হ'ল,
এ দুরাশা কেন হরি! দিলে গো আমায়?
দাও নাই রত্ন ধন,
তাহাতে কি প্রয়োজন?
ধনেই কি মানবের সব জ্বালা যায়?
অতৃপ্ত বাসনা হেন,
আমারে গো দিলে কেন?
দয়া কর দয়াময় অভাগা অধমে
দাও প্রীতি ভালবাসা,
মুছে দাও এ দুরাশা
শান্তির প্রবাহ সদা ঢাল এ মরমে।

(৩)

আমারে যা দেছ নাথ! দিব তা তোমায়
ভক্তি পুষ্প উপহার,
লহ প্রেম অশ্রুধার,
আমার পরাণ মন নিবেদি ও-পায়।
যাহা মোরে দাও নাই,
দাও মোরে চাহি তাই,
দাও শান্তি তৃপ্তি প্রীতি মোরে ভগবন্!
কাতর না হই দুঃখে,
ব্যথা সহি হাসিমুখে,
দাও সেই শক্তি মোরে হৃদয়রঞ্জন!
দিবা নিশি অবিরাম,
এ হৃদয়ে প্রাণারাম!
পাই যেন হেরিবারে ও-পূত চরণ।
না ভুলি আপন ধর্ম্ম,
তোমার চরণে মতি থাক্ অনুক্ষণ।
সংসারের তাড়নায়,
যেন না ভুলি তোমায়,
দয়াময়! অভাগীর এই নিবেদন।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

পিতা।

সারা জীবনের পথে
থাক তুমি সাথে, সাথে,
তবু কেন প্রলোভন আসি,
হৃদয়ের দৃঢ় বাঁধ
শিথিল অবশ করে,
কেন ফেলে এ জীবন গ্রাসি?

কত প্রতিজ্ঞার ডোরে
বেঁধে রাখি আপনারে,
সংযমের সুদৃঢ় বাঁধন,
একটী নিমেষে হায় হায়!
কোথায় পলায়ে যায়,
জীবনের কঠিন সাধন।

বসে বসে আনমনে
ভাবিতাম সংগোপনে,
অপূত বাসনা, পাপ কাজ,
কোন দূষা চিন্তারাশি,
ম্লান করিবেনা আসি,
আসিবেনা হৃদিমাঝে কোন রূপ লাজ।

ফুল্ল কুসুমের মত
লয়ে সুবাসনা শত
আমি রব দুয়ারে তোমার,
আদেশ বহিয়া শিরে
বেড়াইব বিশ্বে ফিরে
তব কাজে, দেবতা আমার।

এরূপে আপনা ধ্যানে
তৃপ্তি পাই সংগোপনে
আপনারি আরাধনা করি।
তাই প্রভু বারে বারে
পরীক্ষায় ফেলে মোরে
আমার সে ধ্যান ভাঙ্গ হরি।

অতি তুচ্ছ প্রলোভনে
ভেঙ্গে চুরে কোন্ খানে
পড়ে যাই, কোন্ অন্ধকূপে,
হৃদয় আকুল পারা
আঁখি হতে তপ্ত ধারা
দাঁড়াতে পারি না কোন রূপে।

আমার সংযমশিক্ষা
আমার আমাতে দীক্ষা
আমি-ময় জগত আমার,
বাঁচাতে পারে না মোরে
হাতখানি রাখ ধরে
তুমি প্রাণনার বাঁচাও এবার।

তুমি এস অন্তঃপুরে
তুমি থাক বিশ্বভরে,
লহ তুমি জীবনের ভার।
দেবতা আমার।

সরলা দত্ত।

দীপ্ত আঁধার।

বহু বর্ষ কাটায়েছি লয়ে শুধু আপনারে,
মিথ্যা সুখ মিথ্যা দুঃখে করেছি যাপন
হে জননি! শুধু মিথ্যা স্বার্থ অন্ধকারে
ধাতার অমূল্য দান মানবজীবন।
অশ্রান্ত দুরাশা শুধু অবশ অন্তরে
অবিরাম নিষ্ফলতা আনিয়াছে ভরে।
কণ্টকবিকীর্ণ পথে কত দিন ধরি'
অসাড়, আবিলাভরা জীবন বহিয়া
বিপথে চলেছি, শত বেদনায় করি
ভারাক্রান্ত প্রাণ, শত হীনতা সহিয়া।
হে অভয়ে, জ্যোতির্ম্ময়ি! কোন্ পুণ্যফলে
বিশ্বজননীর বেশে তুমি দেখা দিলে?
তোমার প্রদীপ্ত আলো অন্ধ আঁখি মোর
অপূর্ব্ব আনন্দালোকে দিল ফুটাইয়া।
অসীম করুণা তব পলকে কেমনে,
কোন্ সে অজ্ঞাত স্বর্গে নিল উঠাইয়া
মৃত্যু ভারাক্রান্ত চির-অচেতন প্রাণ,
জাগায়ে তুলিলে করি কি অমৃত দান।

"আমি"র দুশ্ছেদ্য পাশ ছিঁড়ি অনায়াসে
জাগিব কি নব বলে হয়ে বলীয়ান্ ?
তোমার মহিমাগীতি ধ্বনিয়া আকাশে
গাহিয়া উঠিছে যেন সকল পরাণ।
ইহলোক, পরলোক, জীবন মরণ,
ব্যাপিয়া দেখিতে পাই অভয় চরণ।

কুটীরে।

জননী আমার শক্তিরূপিণি !
এস মা ! কুটীরে আজি,
ভক্তি পুলকে উঠিবে ফুটিয়া
সুরভি কুসুমরাজি।

পুষ্পিত মম হৃদি কুটীরে,
বাজিবে মোহন বাঁশী।
প্রীতি সাধনার অশ্রু শিশিরে
সেফালি ঝরিবে হাসি।

নিভন্ত মম দীপটী প্রাণের
জ্বলিয়া উঠিবে পুনঃ,
অঞ্জলি হ'য়ে ঝরিবে চরণে,
মরমের প্রেম চন্দন।

পূজা অবশেষে যেন মা ! তোমার
স্নেহের আশীষ ধরি,
জীবনের ব্রত সাধিবারে পাই
তোমারি করুণা স্মরি।

তোমার মোহন অঞ্চলে মাগো !
প্রেম পুলক কিরণে
আবরি রেখ মা ! সন্তানে তব,
নিত্য কল্যাণ সাধনে !

শ্রীমতীপ্রিয়বালা রায়

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

৯
বামাবোধিনী পত্রিকা

No. 576. August, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৭৬ সংখ্যা। } শ্রাবণ, ১৩১৮। আগষ্ট, ১৯১১। { ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভ্যর্থনায় ছাত্র ও ছাত্রী—যে দিন রাজা ও রাণী কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন রেড রোডের পার্শ্বে ২৪ সহস্র ছাত্র এবং ছাত্রীকে সমবেত করা হইবে। ৮ বৎসরের ন্যূন কিম্বা ১৪ বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্ক ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না। প্রত্যেক স্কুলের পৃথক্ পৃথক্ পতাকা থাকিবে। কলিকাতার কোন্ স্কুল হইতে কত ছাত্রী উপস্থিত হইবে, তাহার সংখ্যা করা হইতেছে।

২। কংগ্রেসের সভাপতি—এ বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইবে। তাহাতে পার্লামেণ্টের সভ্য ভারতহিতৈষী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

৩। ভূপালের বেগম সাহেবা—ভূপালের বেগম সাহেবা রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে বিলাতে গমন করিয়াছিলেন। ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি সম্প্রতি কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে অবস্থান করিতেছেন। মুসলমান মহিলাদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাতগমন করিলেন।

৪। মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ্—কলিকাতার গড়ের মাঠে ইষ্টইয়র্ক-পল্টনের সহিত মোহনবাগান ফুটবল্ খেলওয়াড়দিগের যে খেলার বাজী হইয়াছিল, তাহাতে দর্শকদিগের নিকট ৬৯১৪৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছে।

এই টাকা দাতব্য ফণ্ডে দান করা হইবে, শুনা যাইতেছে। ইহা অতি আনন্দের বিষয়।

৫। বেথুন-স্মৃতি-সভা—পরলোকগত মহাত্মা-ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের স্বর্গারোহণের দিনে বেথুন কলেজ-গৃহে তাঁহার সম্মানার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। তাহাতে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী মহাশয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রভৃতি সভায় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত থাকিয়া মহাত্মা বেথুন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নারীহিতৈষী বেথুন সাহেব স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ভারতরমণীগণ এ জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবিকার উপায়।

আজকাল আমাদের দেশে নারী-জাতির কর্ম্মের জন্য দুই চারিটী নূতন পথ খোলা হইতেছে, ইহা অতিশয় শুভ চিহ্ন। ঐরূপ কাজের নিমিত্ত ভারতমহিলাদের যে উপযুক্ত সময় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বহুদিন হইতে হিন্দু-মহিলাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা ধনী লোকের স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব দাস দাসীতে সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই আদর যত্নে জীবন কাটান। কিন্তু অভিভাবকহীন হইলে ভদ্র গরীব স্ত্রীলোকদিগকে জীবিকার জন্য যে কত ঘৃণা ও অবমাননা সহিতে হয়, তাহা ভাবিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। অভিভাবক হারাইলে কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া থাকা বা পাচিকা-বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা ব্যতীত ভদ্র বংশের অনাথাদের আর কোনও উপায় থাকে না। ঐরূপ অবস্থায় আত্মীয় স্বজনের বা পরের দাস্য করায় তাঁহাদের মনে যে কতদূর লজ্জা ও অপমান বোধ হয়, তাহা ঐ প্রকার অবস্থায় না পড়িলে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

সুখের বিষয়, এখন দরিদ্র ও বিধবা নারীদিগের কার্য্য করিবার নিমিত্ত, কার্য্যক্ষেত্রে দুই একটী নূতন উপায় হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ঐ অভিনব উপায়গুলি নিজেদের উপযোগী করিয়া লইবার পক্ষে অবরোধপ্রথা এক মহা প্রতিবন্ধক। ডাক্তার, ধাত্রী বা হাঁসপাতালের সেবিকা হইতে হইলে

বাহিরে যাইতে হয়, যখন তখন অন্তঃপুর হইতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করিতে হয়, এবং প্রকাশ্যে পুরুষের সম্মুখে বাহির হইয়া পরীক্ষা দিতে হয়—ঐ সকল কারণে উহা এখন সকল হিন্দু নারীদিগের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। আর আমরা যতদিন বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিব, ততদিন উহাদ্বারা ভারতমহিলাদিগের জীবিকার আশা করা বৃথা। ভাগ্যক্রমে অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের নিঃস্ব বিধবারা সচরাচর একেবারে অনাথা হইয়া পড়েন না; তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা বা অপর কোন আত্মীয় তাঁহাদিগকে নিজ পরিবারে রাখিয়া ভরণপোষণ করেন এবং বিধবারাও উহার জন্য তাঁহাদের গৃহকর্ম্ম সকল করিয়া কাল যাপন করেন। অধিকাংশ স্থলে ঐরূপ জীবন বিধবার পক্ষে কষ্টকর না হইয়া বরং সুখের হয়। কিন্তু যাঁহাদের সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, বা যাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে বিমুখ বা অপারক, তাঁহাদের জীবনে কি রাঁধুনীগিরি করা বই আর কোন জীবিকার উপায় নাই? অবশ্য আছে। কিন্তু জীবিকার সে উপায় বাল্যকালের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। সেই কারণে গৃহস্থ পিতামাতারা বালিকাদিগকে যাহাতে কোন না কোন শিল্প কার্য্যে বা ব্যায়ামে সুশিক্ষিতা করিতে পারেন, সে বিষয়ে যেন যত্নের ত্রুটি না হয়।

ভবিষ্যতে কাহার জীবনে কি ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না, সেইজন্য জীবনের প্রারম্ভ হইতেই বালিকাদিগকে সকল প্রকার বিপদ আপদের জন্যও প্রস্তুত করা কি সুবুদ্ধি ও স্নেহশীল পিতা মাতার কর্ত্তব্য নয়? বাল্যকাল হইতে কন্যাদিগকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দাও, সকল কাজ নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতে শিখাও। দেখো, যেন তাহারা কোন কাজ অর্দ্ধেক শেষ করিয়া ফেলিয়া না রাখে, বা কোন দ্রব্য মন্দরূপে প্রস্তুত না করে। যে কোন কাজ হউক, বাল্যকালে উহাতে নিয়মিত শিক্ষালাভ হইলে পরজীবনে উহাদ্বারা নিশ্চয়ই জীবিকা উপার্জ্জন করিবার সুবিধা হইবে।

বাল্যকালের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অনুশীলন ও অভিনিবেশের অভ্যাস প্রাপ্তবয়সে আমাদের জীবনের প্রধান সম্বল হয়। তাহা হইলে আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া উপস্থিত বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলে বা দুর্ভাগ্যক্রমে অসহায় হইয়া পড়িলে, আর সংসারে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয় না। দুঃখ যন্ত্রণা তখন আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার পরিবর্ত্তে অধিকতর দৃঢ় করে, কাজ আমাদের সান্ত্বনা স্বরূপ হয়। আমরা নিজেই পরিবারের কাণ্ডারী হইয়া আবার দাঁড় বাহিয়া চলিতে পারি, আমাদের অনাথ ভাইভগ্নীগণ আশ্রয় পায়, শিশুসন্তানেরা আহার পায় ও আত্মীয়গণ আমাদিগকে সম্মান করিয়া চলে।

দুইটী বন্ধু।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মের ছুটী ফুরাইয়া গেল, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আবার সকলে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। আমাদের সুরেশচন্দ্রও আসিয়া ভূপেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইলেন। সুরেশকে নিকটে পাইয়া ভূপেন্দ্রনাথ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। সুরেশচন্দ্রের নিকট সকল কথা অকপটে ব্যক্ত করাতে তাঁহার হৃদয়ের ভারের লাঘব হইল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন "ভাই, এ জগতে কেবল স্বার্থ, এখানে প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, দয়া ধর্ম্ম নাই, এখানে মানবের সাধ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন! লোকে কেবল স্বার্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, স্বার্থ ভিন্ন পরার্থে কেহ কখনও কোন কার্য্য করিতে চাহে না। এমন কি স্বার্থের জন্য পিতামাতাও আপন সন্তানের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

তাহার প্রমাণ, তোমার পিতাকেই দেখ। তোমার জীবনের সুখশান্তি সকল নষ্ট করিয়া, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার বিবাহ দিয়া, তিনি বিপুল অর্থ হস্তগত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কি কোনও উপায় নাই?"

সুরেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "কি বলিব? পিতার অবাধ্য হওয়া কুলাঙ্গার পুত্রের কার্য্য। সংপুত্র সর্ব্বদা নতশিরে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিবেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার তুল্য মহাগুরু জগতে কে আছেন?

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥'

অতএব পিতৃ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।"

ভূপেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন "তবে তুমিও কি বল ১৫ হাজার টাকার জন্য ঐ কাণা মেয়ে বিবাহ করিব? টাকা লইয়া বিবাহ করা আমি চির দিনই ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাহার পর তোমার নিকটে যে অবধি তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি যে, কখনও টাকা লইয়া বিবাহ করিব না। এই প্রথা উঠাইবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর আমিই টাকা লইয়া বিবাহ করিলে লোকে আমায় কি বলিবে? আমি যদি নিজে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া বিবাহ করি, তবে অপরকে কি প্রকারে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইব? আমি নিজেই যদি কুকার্য্য করি, তবে অপরকে

কিরূপে সদুপদেশ দিব? আর কেই বা আমার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবে? নিজে সৎ না হইলে অপরকে কখনও সৎপথে আনা যায় না। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে সক্ষম হয়?

এ পর্য্যন্ত কোন দিন পিতৃবাক্য অবহেলা করি নাই, কিন্তু এখন আমি যে কি করিব, তাহা আমার চিন্তার অতীত, তাই তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছি। তুমিও কি এখন টাকা লইয়া এ বিবাহ করিতে বল?"

সুরেশ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "ভূপেন্! এ যদি দরিদ্রের কন্যা হইত, এবং অর্থাভাবে 'কাণা' বলিয়া লোকে ঘৃণা করিয়া উহাকে বিবাহ করিতে না চাহিত, তাহা হইলে আমি তোমায় ইহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু যখন এই কন্যা প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারিণী, এবং এই ধনলাভের নিমিত্ত অনেকে ইহাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছে, তখন এ স্থলে যে তুমি ইহাকে বিবাহ কর, এমন ইচ্ছা আমার কখনই হইতে পারে না। তোমার মতামত সম্বন্ধে তোমার পিতাকে কোনও কথা বলিয়াছিলে কি?

ভূপেন্দ্র। না, তিনি যখন আমার মতামত সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তখন আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে কি বলিব?

সুরেশ। আমার বিবেচনায় তাঁহাকে একবার বলিয়া দেখা ভাল।

ভূপেন্দ্র। না ভাই, তাঁহাকে কোনও কথা বলিতে আমার সাহস হয় না, এবং তাঁহাকে বলিলেও কোন ফল হইবার আশা নাই। আমি মনে মনে একটী পরামর্শ স্থির করিয়াছি, অবশেষে তাহাই করিব।

সুরেশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পরামর্শ?"

ভূপেন্দ্র। পলায়ন।

সুরেশ। সে কি? কোথায় পলাইবে?

ভূপেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি মনে ভাবিয়াছি যখন এই বিবাহের সময় উপস্থিত হইবে, আমি তখন দুষ্ট বালকের ন্যায় এক দিকে চলিয়া যাইব।"

সুরেশ বলিলেন, "না ভাই, এ কথা ন্যায়সঙ্গত নহে। বিবাহের সময় তুমি পলাইয়া যাইবে, আর সেই নিরপরাধা বালিকার জাতিনাশ হইবে। সমাজের চক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষে সে পতিতা হইবে, এমন কাজ করিও না।"

ভূপেন্দ্র। আমি এরূপ পাষণ্ড নহি যে, যাহাতে সে বালিকার কোন অনিষ্ট হয়, এমন কার্য্য করিব! তাহার অপরাধ কি?

পিতা অগ্রহায়ণ মাসে আমার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, আমি তৎপূর্ব্বে কোথাও চলিয়া যাইব; অবশ্য যখন যাইব, তোমাকে বলিয়া যাইব।

সুরেশ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ পরামর্শ মন্দ নহে বটে, কিন্তু আমার

মতে, একবার তোমার পিতাকে সকল কথা খুলিয়া বলা উচিত। একান্তই যদি তিনি তোমার কথায় অসম্মত হন, তখন যাহা ইচ্ছা হয় করিও।"

ভূপেন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "পিতাকে বলিলে কোনও ফল হইবে না, বরং মাতাকে একবার বলিয়া দেখিব।"

ইহার কয়েক দিবস পরে এক দিবস অপরাহ্নে ভূপেন্দ্রনাথ মাতার নিকট বসিয়া জলযোগ করিতেছিলেন। হরিমোহন বাবু যে প্রকৃতির লোক, গৃহিণী সেরূপ ছিলেন না, তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি একটু সুমার্জ্জিত এবং প্রাণে একটু স্নেহ মমতা ছিল। তিনি হরিমোহন বাবুর ন্যায় কেবলই "বিষয়" চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন না, সন্তানগণের সুখ দুঃখ দেখিতেন।

ভূপেন্দ্রনাথ ইদানীং চিন্তা-স্রোতে দেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিসে স্বদেশের ও সমাজের হিতসাধন করিবেন, কিরূপে সমাজ হইতে কন্যার পন উঠাইতে পারিবেন, এই তাঁহার হৃদয়ের মূল মন্ত্র হইয়াছিল! তিনি নিজেও কি প্রকারে এই বিবাহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, সে চিন্তাতেও কাতর ছিলেন। এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় বেশবিন্যাসে যত্ন নাই, পরিচ্ছদপারিপাট্যে ইচ্ছা নাই। মস্তকের কেশগুলি সর্ব্বদাই অবিন্যস্ত থাকে। তাঁহার সুন্দর বদনমণ্ডলে ঈষৎ কালিমার রেখা পড়িয়াছে এবং গৌর কান্তিও অল্প ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে।

গৃহিণী পুত্রের এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও কারণ অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। জিজ্ঞাসা করিলে ভূপেন্দ্র "কিছুই হয় নাই" বলিয়া উত্তর দেন। গৃহিণী ভাবিয়াছিলেন "বোধ হয় পাঠের জন্য রাত্রিজাগরণ করিয়া পুত্রের এরূপ হইতেছে।"

অদ্য তিনি পুত্রকে জলখাবার দিয়া, একখানি তালবৃন্ত লইয়া নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে পুত্রকে বাতাস করিতেছিলেন। তাহার পর পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "হাঁ বাবা, চুলগুলি যে জটা বেঁধে যাচ্ছে, আঁচড়াও না কেন?"

ভূপেন্দ্র ঈষৎ বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিলেন, "যমের বাড়ী গিয়ে আঁচড়াব।"

শুনিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "বালাই, ষাট্, ও কথা কি বলতে আছে বাবা, তুমি আমার রাজ্যেশ্বর! তোমার কিসের অভাব?"

ভূপেন্দ্র কিঞ্চিৎ অভিমানসূচক স্বরে কহিলেন "হাঁ,—অভাব নাই বলিয়াই ১৫ হাজার টাকায় একটা কাণা মেয়ের বাপের কাছে আমার বিক্রয় করিবে?"

গৃহিণী চমকিত হইলেন। তিনিও এক এক বার এই বিবাহের কথা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, এবং এমন ছেলের "কাণা বৌ" হবে ভাবিয়া কিছু ক্ষুণ্ণও হইতেন, কিন্তু আবার অগাধ বিষয় সম্পত্তি পাইবার কথা ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "সে কি বাবা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? সেত তোমার দাসী আসিবে, তার বাপের কাছে তোমায় বিক্রি আবার কি?"

ভূপেন্দ্র। বিক্রি নয়ত কি মা? এতগুলি টাকা লইয়া তবেত তাহার সহিত আমার বিবাহ দিতেছ? সে দাসী নহে, প্রকৃত পক্ষে আমিই তাহার ক্রীতদাস হইব। তুমি বল দেখি মা, যদি তাহার বাপ এই অর্থরাশি দিতে সক্ষম না হইতেন, তবে কি ঐ কাণা মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে?

গৃহিণী। তা' কেন দেব? বিষয় সম্পত্তির জন্তই তো' কর্ত্তা ওখানে বিবাহের কথা স্থির করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্র। ছিঃ—পরের ধনে লোভ করা অধর্ম্মের কার্য্য! টাকা লইয়া ছেলের বিবাহ দেওয়া কতদূর ঘৃণিত কর্ম্ম, তাহা তোমরা বোঝ না! ইহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে।

গৃহিণী। তা' বাছা আমরা তো' আর একা নিচ্ছিনে, সকলেই তো' আজকাল এই রকম নিচ্ছে।

ভূপেন্দ্র। ঐ তো হয়েছে দোষ! 'অমুক কচ্ছে, আমিও করিব'। কিন্তু মা, সকলে যদি কুকার্য্য করে, তোমাকেও কি কুকার্য্য করিতে হইবে? তোমাকেও কি মা, কোনও সৎকর্ম্ম করিতে নাই? আর দেখ মা, সকল লোকেরই অভ্যাস, দেখাদেখি কার্য্য করা। আজ যদি তুমি একটী সৎকর্ম্ম কর, তবে তোমার দেখিয়া কাল আর একজন তাহা করিবে। তাহা দেখিয়া অপর একজন করিবে, এইরূপে জগতের অনেক দুষ্কর্ম্ম দূর হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সদনুষ্ঠান হইতে পারে।

গৃহিণী। তা বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা আর কি সৎকর্ম্ম করিতে পারি?

ভূপেন্দ্র। কি সৎকর্ম্ম করিতে পার? তোমরা না পার কি মা? স্ত্রীলোকের ন্যায় সদ্‌গুণ অনেক পুরুষের নাই। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মবিশ্বাস, স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা পুরুষ অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক! স্ত্রীলোকের স্নেহ মমতা অপরিসীম। যাহারা 'মেয়েমানুষ' বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা দাম্ভিক মাত্র! তোমরা যদি মা, আগ্রহপূর্ব্বক কোনও সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তবে অবশ্যই তাহা সফল হইবে। আর দেখ মা, টাকা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় যে পাপ হয়, তাহা বেশ বোঝা যায়, কারণ, কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে। দুই চারি জন ধনী লোক ছাড়া কন্যার বিবাহে অধিক অর্থ ব্যয় করিতে কেহই সক্ষম নহে। কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতে হইলে সকল লোকেরই অর্থ চাই, সুতরাং ঋণ করিয়া হউক বা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া হউক, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে হইবে। এইরূপ অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিলে অধর্ম্ম হয় না? ধিক্ সমাজকে, আর সহস্র ধিক্ আমাদিগকে যে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও

আমাদের জ্ঞান জন্মে না, আমাদের দয়াও হয় না।

ভূপেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনিয়া গৃহিণীর অন্তরে প্রকৃতই আনন্দ জন্মিল। তিনি হরিমোহন বাবুর ন্যায় একেবারে অন্তঃসারশূন্যা হৃদয়হীনা রমণী ছিলেন না। হায়! আজি কাল হরিমোহন বাবুর ন্যায় স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে, তাই আজি বাঙ্গালার কন্যা-কর্ত্তারা কন্যা লইয়া প্রমাদ গণিতে-ছেন।

গৃহিণী মিষ্ট স্বরে পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "তা' তুমি কি করিতে বল ?"

ভূপেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "আমার কথা কি আর তোমরা শুনিবে ?"

পুত্রের ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি ভাবিলেন, "যাক্ টাকা, আমার ভূপেন যাহাতে সুখী হয়, তাহা আমাকে করিতেই হইবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, আমার নিকট তোমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বল, লজ্জা করিও না।

ভূপেন্দ্র বলিলেন—আমার ইচ্ছা আমি ঐ কাণা মেয়েকে বিবাহ করিব না, এবং অন্য কোথাও টাকা লইয়া বিবাহ করিব না। এই কথা বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ মাতার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া সান্ধ্য বায়ুসেবনার্থে বরাবর গঙ্গার ধারে গমন করিলেন। একাকী লক্ষহীন হইয়া চলিলেন, ভাবিলেন বাহিরের বায়ুসেবনে হয়ত একটু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার চিন্তাস্রোত কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

এ দিকে গৃহিণী যথাসময়ে হরিমোহন বাবুর নিকট ভূপেন্দ্রনাথের মনোভাব জানাইলেন, নিজেও "কাণা পুত্রবধূ না হয়," একটু অনুরোধ করিলেন ?

তিনি কহিলেন "অমন ছেলের আবার বিবাহের ভাবনা? আমার হিরার টুকরো ছেলে! আর কাণা বৌ হবে! কি ঘেন্নার কথা, তুমি একটী ভাল মেয়ে দেখ।"

গৃহিণীর এই কথা শুনিয়া হরিমোহন বাবু একেবারে "তেলে বেগুনে" জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি ? এমন সম্বন্ধ ভূপের পছন্দ নয় ? ভূপেটা একেবারে অধঃপাতে গেছে। তার হিতাহিতজ্ঞান রহিত হইয়াছে! এখনকার ছেলেগুলো দু'পাতা ইংরাজী পড়ে একেবারে ব'য়ে যায়, লজ্জা সরম নাই, পিতামাতার নিকটে অম্লানবদনে বিবাহের কথা বলে! ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জার কথা! অমন একটা হাকিমের একমাত্র জামাই হবে, ভবিষ্যতে তার সকল বিষয়ের মালিক হবে, একি কম সৌভাগ্য নাকি ? এমন কি লোকের ভাগ্যে ঘটে ? আমি অনেক ভেবে তবে এ সম্বন্ধ স্থির করেছি। তোমরা 'কাণা' 'কাণা' করে অস্থির হচ্ছ। সেত অন্ধ নয়! আর যদি সে অন্ধও হইত, তথাপি তাহার বিবাহের ভাবনা থাকিত না। সে যে সম্পত্তির মালিক, কত বড় লোকের ছেলে তার লোভে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উমেদারি করিতেছে। ভূপে'র ভাগ্য

ভাল যে সে বিনোদ বাবুর জামাই হবে। তোমরা মেয়ে মানুষ বোঝ কি?” হরিমোহন বাবু বড় রুক্ষস্বরে এই কথাগুলি বলিলেন। বলিতে পারি না, যদি তিনি শান্তভাবে গৃহিণীকে এই কথা বুঝাইতেন, তাহা হইলে কি ফল হইত! কর্ত্তার রুক্ষ ভাষা শ্রবণ করিয়া গৃহিণীও বড় চটিয়া গেলেন এবং রাগান্বিত হইয়া উত্তর দিলেন “তোমার নিজের বিষয়ের অভাব নাই, ভূপেন যদি বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, তবে অমন বিষয়ে দরকার কি? যার জন্য বিষয়, সেই যদি বিষয় নিয়ে সুখী না হয়, সেই যদি বিষয়ের লোভে কাণা মেয়ে বিবাহ করিতে না চায়, তবে জোর ক’রে কাণা মেয়ের সঙ্গে তার বে’ দাওয়া কেন?”

কর্ত্তা মহাক্রুদ্ধ হইলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কটীর বস্ত্র খসিয়া পড়িত। তিনি বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে কহিলেন, “একশ’ বার ‘কাণা’ ‘কাণা’ কোরনা বলছি! আমার যা খুসী তাই করিব, আমার ছেলের আমি বিয়ে দেব, তুমি কথা কইবার কে?”

গৃহিণীরও ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন “বটে, তোমারি ছেলে, আর আমার কেউ নয়? আচ্ছা, আমিও বলছি কখনই তুমি ওখানে আমার ভূপেনের বে’ দিতে পারবে না।”

হরিমোহন। নিশ্চয়ই দেব। কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা রদ করে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা দিয়ে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না। বিশেষতঃ ঐ নগদ টাকাটায় চোরবাগানে একখানা বাড়ী কিন্‌বো ঠিক করে রেখেছি। বিনোদ বাবু এখনি আমায় ১২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন, আমি কেবল ভদ্রতার অনুরোধে এখন লই নাই, বিবাহের রাত্রে লইব বলিয়াছি। কটা মাস গেলে বাঁচি, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই লগ্ন স্থির করিব। যে তোমরা পেছু লেগেছে, আর দেরি করা হবে না।

গৃহিণী কর্ত্তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শুনিয়া একটু ভীত হইলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন, “দেখ তুমি আর পাঁচটী ছেলের বে’ দিয়েছ, যা ইচ্ছা করিয়াছ, আমি কোনও কথা বলি নাই, বাড়ী কিন্‌তে হয়, তোমার নিজের টাকায় কেন, তোমার পায়ে পড়ি, ভূপেন যদি ওখানে বে’ ক’রে অসুখী হয়, তবে তার ওখানে বে’ দিও না। আমারইখেদ হ’চ্ছে যে, অমন ছেলের কাণা বৌ হবে, লোককে কি ক’রে বৌ দেখাব?”

হরি। কি? আবার “কাণা” “কাণা’ কোচ্ছ?

গৃহিণী। খুব কচ্ছি, কাণা তা’ কাণা বোল্‌বো না?

হরি। আমি যদি হরিমোহন দত্ত হই, তবে নিশ্চয় ঐখানে ভূপে’র বে’ দেব, কারো কথা শুনবো না।

গৃহিণী। ভগবান্ সাক্ষী, আমি যদি যথার্থ তোমার ধর্ম্মপত্নী হই, তবে কখনই ওখানে ভূপেনের বে’ দিতে দেব না।

এই বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

(৬)

আশ্বিন মাস। শারদীয় মহৎসবে বঙ্গ-ভূমি আনন্দোচ্ছ্বাসে উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে, মুমূর্ষু বাঙ্গালিকুল আজি যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। আফিষ, স্কুল, কলেজ সব বন্ধ হইল, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে গৃহ-গমনের উদ্যোগ করিতেছে। আফিষের বাবুরা পূজার বাজার করিবার নিমিত্ত ব্যস্তভাবে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ফর্দ্দ হাতে করিয়া এ দোকান, ও দোকান করিতেছেন। সকলেই নিজ নিজ পুত্র,কন্যা, জামাতা প্রভৃতির জন্য মনোমত বসনভূষণ ক্রয় করিতেছেন। বঙ্গ রমণীকুল এই সময়ে পতি পুত্রের মুখ দর্শন করিতে পাইবে বলিয়া আনন্দে ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে দিন গণিতেছেন।

সুরেশচন্দ্রেরও কলেজ বন্ধ হইল, কিন্তু তাঁহার গৃহে যাইবার সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ নাই। তাঁহাদের সেই দারিদ্র্য-নিপীড়িত, দুঃখক্লিষ্ট পরিজনের কথা মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত। তাঁহার পিতার সেই বিষাদাচ্ছন্ন বদনমণ্ডল, জননীর কষ্টসহিষ্ণু, নির্ম্মল প্রতিমূর্ত্তি, ভগ্নীগণের মলিন বেশ, এ সকল দেখিলে তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, সেই কারণে তিনি গৃহে যাইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। আর তাঁহার গৃহই বা কোথা? এক প্রবাস হইতে অন্য প্রবাসে গমন মাত্র। কিন্তু তাঁহার মাতা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বর্দ্ধমানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাহাতে তিনি কিছু চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

মাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, সুরেশ এমন কার্য্য জীবনে কখনও করেন নাই। তাই তিনি কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময় ভূপেন্দ্রনাথ সুরেশ-চন্দ্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিন্তা-স্রোতে বাধা দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভূপেন্দ্রের বাটীর অতি সন্নিকটে, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটেই সুরেশের বাসা।

ভূপেন্দ্রনাথ আসিয়াই কহিলেন "চল সুরেশ, দিন কতক এক দিকে বেড়াইয়া আসা যাউক। ছুটীতে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে বড়ই কষ্ট হয়, কলিকাতায় আমার আদৌ মন টিকিতেছে না, চল দুদিন ঘুরিয়া আসি।"

সুরেশ। কোথায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ?

ভূপেন্দ্র। ইচ্ছা কোথাও করি নাই, হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া স্থির করিয়া ফেলিব।

সুরেশ। সে কি কথা, কোথায় যাইবে পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিবে না?

ভূপেন্দ্র। তুমিই বল না কোথায় যাওয়া যাবে?

সুরেশচন্দ্র ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন "চল না দিন কয়েক বর্দ্ধমানে বেড়াইয়া আসিবে। সেখানেও দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। কিন্তু ভাই আমরা নিতান্ত দরিদ্র, অতি সামান্য

গৃহে থাকি, এমন কি কুঁড়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমার ন্যায় ধনবান্ ব্যক্তির সে গৃহে বাস করা নিতান্ত কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই, তবে বন্ধু বলিয়া কৃপা করিয়া যদি—"

ভূপেন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন "ওকি কথা ভাই, তুমি আর আমি একইরূপ মনে করিও, ওরূপ কথায় আমি বড়ই দুঃখিত হই। অনেক দিন হইতে আমারও বাসনা ছিল যে, তোমার পিতামাতার চরণদর্শন করিব, আজি তাহা সফল হইল। চল কালই আমরা বর্দ্ধমানে যাইব।"

তাহাই স্থির হইল। তৎপরদিবস দুই বন্ধুতে হৃষ্টচিত্তে বর্দ্ধমানে গমন করিলেন। "বর্দ্ধমানে বেড়াইতে চলিলাম, দশ প'নের দিন সেখানে দেরি হইবে" বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ পিতামাতার নিকট বিদায় লইলেন। মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্গের সহিত তিনি এরূপ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

আজি প্রায় এক সপ্তাহ হইল ভূপেন্দ্র বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। এই সপ্তাহকাল তাঁহার বড়ই শান্তিতে অতিবাহিত হইল। সুরেশের মাতার স্নেহ ও যত্ন, পিতার সদ্ব্যবহার ও সৌজন্য এবং ভগ্নীগণের অকৃত্রিম মমতা ভূপেন্দ্রনাথকে বিমোহিত করিল। ভূপেন্দ্র ভাবিলেন "যদি ভূতলে স্বর্গ থাকে, তবে সুরেশের এই গৃহ!" বাস্তবিক ইঁহাদের সংসার বড় শান্তিপূর্ণ। এখানে হিংসা দ্বেষ নাই, কলহ বিবাদ নাই, কপটতা নাই, সকলই সরলতাময়, এত যে দুঃখ দারিদ্র্য বাহিরে তাহার কিছুই কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সুরেশের জননীর গুণে গৃহে শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে। সেখানে অশান্তির লেশমাত্র নাই।

সুরেশের জননী যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। তিনি সমুদায় গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে করেন। বাটীখানি সামান্য, মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়। অন্দরে দুইখানি শয়নগৃহ, একটী রন্ধনশালা, বাহিরে একটী বসিবার গৃহ। সকল ঘরগুলিই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যৎসামান্য গৃহসজ্জা, কিন্তু তাহা পরিচ্ছন্ন ও পরিকৃত।

সুরেশের মাতার নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী! তিনি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, ধৈর্য্যশীলা, এবং সন্তানবৎসলা। এক অর্থ ছাড়া তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। পৃথিবীর যাবতীয় সদ্গুণরাশি যেন তাঁহার একায়ত্ত! এ দেশে বিধবাগণ সচরাচর যেরূপ ঘৃণাস্পদ এবং অনাদৃত হয়েন, তাঁহার নিকট সেরূপ দেখা যাইত না। তিনি পক্ষপাতহীন হইয়া সকলকে সমভাবে স্নেহ করেন। তিনি বলেন "বিধবারা সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত, অতএব তাহারা যাহাতে একটু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে, তাহা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে বাক্য দ্বারা বা অন্য কোনও প্রকারে যন্ত্রণা দিলে ভগবান্ অসন্তুষ্ট হয়েন।"

গৃহকর্ম্মান্তে তিনি কন্যাগণকে লইয়া রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ করেন। সর্ব্বদাই সৎ কথা ও সৎ প্রসঙ্গ লইয়া তিনি গৃহকর্ম্মের অবশিষ্ট কাল কাটাইতেন। ভূপেন্দ্রনাথকে পাইয়া তাঁহারা সকলে বড়ই আনন্দিত হইলেন। সুরেশের মুখে পূর্ব্বে ভূপেন্দ্রের বহুতর প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখন সেই ভূপেন্দ্রকে নিকটে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

ভূপেন্দ্রনাথও তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বড় সুখী হইলেন। তিনি নিজেদের বাটীতে যেরূপ যত্ন পাইতেন না, সুরেশের বাটীতে তাহা পাইলেন। ভূপেন্দ্র ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তান, তাঁহাদের বাটীর ধরণ করণ সমস্তই স্বতন্ত্র। সকল কার্য্যের ভার দাস দাসীর উপর নির্ভর করে। একত্রে এক বাটীতে বাস, কিন্তু কেহ কাহারও সংবাদ প্রত্যহ পান না। সুরেশের মাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, নিজে নিকটে বসিয়া সযত্নে যে সামান্য শাকান্ন ভূপেন্দ্রকে খাইতে দেন, ভূপেন্দ্রের তাহা উপাদেয় বোধ হয়। ভূপেন্দ্র মনে করিলেন, "সুরেশের মাতা স্বর্গের দেবী।" তিনি মনে ভাবিলেন, "আহা, এই পরিবার কত সুখী। আমি হতভাগ্য, যদি এইরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে কত সুখী হইতাম।"

জগতের কি আশ্চর্য্য নিয়ম! আমার অবস্থা দেখিয়া অপরে প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু আমি আমার সে অবস্থাকে অতিশয় দুঃখময় ও তৎপরিবর্ত্তে অপরের জীবন সুখময় মনে করি। আবার সেও হয়ত নিজের অবস্থাকে দুরবস্থা মনে করে। ভূপেন্দ্র ও সুরেশের ঠিক তাহাই হইয়াছে।

সুরেশ জানেন ভূপেন্দ্র জগতে অতুল সুখের অধিকারী। আবার আজি ভূপেন্দ্র ভাবিতেছেন "সুরেশই জগতে প্রকৃত সুখী।"

আর একটী সরলতার প্রতিমা দেখিয়া ভূপেন্দ্রনাথ একেবারে মুগ্ধ হইলেন। এটী সুরেশচন্দ্রের একাদশবর্ষীয়া কনিষ্ঠা ভগ্নী। বালিকাটিকে দেখিলে যথার্থই অন্তরে আনন্দ জন্মে। প্রস্ফুটিত চাঁপা ফুলের ন্যায় বর্ণ, শারদীয় শশীর ন্যায় মুখচন্দ্রমা, বিশাল পদ্মের ন্যায় চক্ষু—স্থির, কটাক্ষহীন, প্রকৃতিদর্পণে সেরূপ শোভা অতুলনীয়। খগরাজবিনিন্দিত সুন্দর নাসিকা, পাতলা অথচ ক্ষুদ্র কর্ণ দুটী, ভ্রমরকৃষ্ণ যুগ্ম ভ্রূ, শুভ্র বর্ণ, উজ্জ্বল মুক্তাবলীর মত দন্তশ্রেণী, নিবিড় কাদম্বিনী সদৃশ সুবিস্তৃত সুচিক্কণ ও সুকুঞ্চিত কেশরাশি। সেই কেশরাশি যখন এলায়িত থাকে, তাহা কপোল, বাহু, পৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এ সৌন্দর্য্যপ্রতিমার শোভা অতুলনীয়া, সে অনির্ব্বচনীয় সরল মুখখানিতে বালিকার সমগ্র প্রকৃতিখানি খোলা রহিয়াছে। অঙ্গে আভরণ অতি সামান্য। নাসিকায় সামান্য একটী মুক্তা ঝুলিতেছে, কর্ণে সুবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দুইটী কৃত্রিম পুষ্প, মণিবন্ধে দুইগাছি নীলবর্ণ কাচের চুড়ী। ইহাতে সৌন্দর্য্য যেন আরও শত গুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সেই সুবর্ণবিনিন্দিত অঙ্গের নিকট আপনার গৌরব হ্রাস হইবে ভাবিয়া আতঙ্কে সুবর্ণ যেন সে অঙ্গে উঠিতে সাহস পায় নাই।

বালিকার নাম শোভা পূজার বন্ধে দাদা গৃহে আসিয়াছেন, শোভার আনন্দ দেখে কে? সুরেশচন্দ্র যে দিন বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, শোভা দৌড়াইয়া আসিয়া সুরেশের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "দাদা, আমার জন্যে কি এনেচ?" পরে দাদার পশ্চাতে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। ভূপেন্দ্রনাথের প্রাণে সেই মুহূর্ত্তে বিজলী খেলিয়া উঠিল।

শোভা যে এরূপে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইবে, সুরেশের তাহা জানা ছিল, তাই আসিবার সময় শোভার জন্য একখানি নূতন কাপড় ও তিনটী বন্দেমাতরম্ হেয়ার পিন আনিয়াছিলেন। তিনি সেগুলি শোভার হস্তে প্রদান করিলেন। শোভা তাহা লইয়া প্রীত হইয়া ভগ্নীগণকে দেখাইতে গেল।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি! দাদার সঙ্গে কে এসেছে জান"? জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ঈষৎ হাস্য ও সপরিহাস করিয়া কহিল "জানি, তোর বর"। এই কথায় শোভা বড়ই লজ্জিত হইল, এবং সেই কোমল হস্তের একটী কিল দিদির পৃষ্ঠে পতিত হইল।

ভূপেন্দ্রনাথকে দেখিয়া প্রথম প্রথম শোভা বড়ই লজ্জিত হইত, এবং সুরেশের সঙ্গে সর্ব্বদাই ভূপেন্দ্রনাথ থাকিতেন বলিয়া সুরেশের নিকটেও আসিতে ইতস্ততঃ করিত। কিন্তু বালসুলভ চপলতা বশতঃ শীঘ্রই তাহার সে ভাব দূর হইল। ভূপেন্দ্রনাথ সেই দেববালার সহিত কথা কহিয়া, তাহাকে গল্প শুনাইয়া, পাঠ বলিয়া দিয়া অপার আনন্দানুভব করিতেন।

সুরেশ বাটী আসিলেই নবীন বাবু শোভার বিবাহের কথা বলিয়া থাকেন, এবারেও বলিলেন, কিন্তু এখন শোভার বিবাহ দিতে সুরেশের আদৌ ইচ্ছা নাই। তিনি পিতাকে বুঝাইয়া কহিলেন "আমি উপাৰ্জ্জনক্ষম হইয়া দেখিয়া শুনিয়া শোভার বিবাহ দিব, সেজন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। শোভার ন্যায় অমূল্য রত্ন অপাত্রে অর্পণ করিয়া তাহাকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিবেন না।"

অগত্যা নবীন বাবু নিরস্ত হইলেন। তাঁহার নিজের বিবাহ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপযুক্ত সৎপুত্রের পরামর্শের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেল। সুরেশচন্দ্র পিতামাতার চরণবন্দনান্তে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিলেন। ভূপেন্দ্রও বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় ধনীর সন্তানের এরূপ অমায়িকতা দেখিয়া

সুরেশের আত্মীয়বর্গ একেবারে বিমোহিত হইয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রের বিরহে সকলেই কাতর হইলেন। ভূপেন্দ্র মিষ্ট ব্যবহারে সকলেরই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথকে আবার বর্দ্ধমানে আসিবার নিমিত্ত সুরেশের মাতা অনেক অনুরোধ করিলেন। ভূপেন্দ্রও সম্মতি জানাইলেন।

নবীন বাবু সাশ্রুনয়নে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন। শোভা মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, দাদার জন্য তাহার বড়ই মন কেমন করিতে লাগিল, আবার কে জানে কেন দাদার বন্ধুর জন্যও তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল। শোভা মনে ভাবিতে লাগিল "উনিতো আমাদের কেহই নন, কেবল দাদার বন্ধু. তবে তাঁহার জন্য আমার এত মন কেমন করে কেন?"

কিন্তু বালিকা এ "কেন"র উত্তর দানে সক্ষম হইল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইল না, কিন্তু বড়ই কাতর হইল। তাহার আর খেলাধুলা ভাল লাগে না, ছুটাছুটী ভাল লাগে না, খেলাঘরের হাঁড়ি বেড়ি আর সে স্পর্শ করে না, পুতুলগুলি বাক্সমধ্যে চাবিবদ্ধ হইয়া রহিল।

বালিকা অন্যমনে উদাসপ্রাণে কি জানি কিসের চিন্তায় সর্ব্বদা মগ্ন থাকে। কয়েক দিন পরে শোভা ভূপেন্দ্রের লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পত্র পাইল। পাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন এত লোক থাকিতে শোভাকে পত্র কেন? তাই তাঁহাদের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

কলিকাতা,

স্নেহের শোভা! ৬ই কার্ত্তিক।

আমরা নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়াছি ও ভাল আছি। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়া সর্ব্বদাই বড় মন কেমন করিতেছে। জানি না, আবার কবে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! আমার অশান্তিময় জীবন তোমাদের কাছে বড়ই শান্তিতে ছিল। তুমি আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে। পিতামাতা ও ভগ্নীগণকে আমার প্রণাম জানাইবে। তোমার দাদা ভাল আছেন। ইতি

তোমার শুভার্থী
ভূপেন্দ্রনাথ।

শোভা পত্রখানি পাঠ করিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

ভুত না মানুষ ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নন্দকের দুরবস্থা।

প্রায় চারি দণ্ড বেলায় সময় নন্দক চণ্ডদেবের গৃহাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তৎকালে নবীন অর্কের কিরণসম্পাতে প্রভাতপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি উথলিয়া উঠিতেছিল। তখনও পর্য্যন্ত তপনদেব আপনার তেজ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কেবল পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইয়া চক্ চক্ করিতেছিলেন।

নন্দক চণ্ডদেবের শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিতর হইতে শয়নকক্ষের দ্বার বন্ধ ছিল। এই অবসরে নন্দক ক্ষণকাল তথায় অবনত মস্তকে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার চিন্তার স্রোত শুধু চণ্ডদেবের সেই হস্তের ক্ষতের উপরেই পতিত ছিল। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন এ ক্ষতটী কিসের ক্ষত। যৎকালে নন্দক চন্দনীর অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সেই দিকে ধাবিত হইতেছিলেন, তৎকালে তাহার উন্মুক্ত অসি এক জন অশ্বারোহীকে আঘাত করিয়াছিল। নন্দক আজও পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন, "তবে কি সেই অশ্বারোহী চণ্ডদেব ?" সত্য সত্যই কি চণ্ডদেব চন্দনীকে হত্যা করিয়াছে ? হঠাৎ নন্দকের আপাদমস্তক ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে তিনি সংযত হইয়া ভাবিলেন, "না তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয় ? আমি ত গমনকালে তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া গিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে তিনি কিরূপে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ? আবার ভাবিলেন হাঁ তাহা হইতেও পারে। হয়ত আমি যে উপায়ে সেখানে গিয়েছিলাম, তিনিও সেই উপায়েই সেইখানে গমন করিয়াছিলেন।" নন্দক এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা গৃহাভ্যন্তরে মানুষের পদসঞ্চারের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। "একি !" বলিয়া নন্দক লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল ও নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি প্রাণপণে দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তদ্দণ্ডেই তিনি ভৃত্যবর্গকে লৌহদ্বার ভগ্ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ভৃত্যেরা লৌহদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা সেই দ্বারের উপরে পুনঃপুনঃ অস্ত্রাঘাত করিল, এবং লৌহময় কবাট

ঝন্ ঝন্ শব্দে পুনঃপুনঃ সেই আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল। কিন্তু শীঘ্র যে তাহা ভগ্ন হইবে এমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ক্রমে ক্রমে নন্দক ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রোধে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা করিলেন, "দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেল।"

যখন পাঁচজন ভৃত্য পাঁচখানি হাতিয়ার লইয়া সম্মুখস্থ দেওয়াল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন সহসা ঘরের দরজা মুক্ত হইল। ঘর হইতে এক বিকটাকার জীব বাহির হইয়া যতদূর সম্ভব দ্রুত-গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। এতাদৃশ ভীষণ আকৃতি দর্শনে ভৃত্যগণ চমকিয়া ও শিহরিয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই তাহারা ভয়ে মৃতবৎ হইয়া পড়িল।

চণ্ডদেবের পূজার গৃহে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সেই মৃতদেহ চণ্ডদেব অনুপস্থিত থাকাতে তিন দিন ঘরের মধ্যে বদ্ধ ছিল। তজ্জন্যই গৃহের সমুদায় লোক অতিশয় শঙ্কিতভাবে এ গৃহে বাস করিত, এবং সামান্য কারণেই ভীত হইত।

কিন্তু নন্দক বিচলিত হইলেন না। গৃহদ্বার মুক্ত পাইয়া তিনি পলকমধ্যে গৃহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন চণ্ডদেব মেজের উপরে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। নন্দক সেই মুহূর্ত্তেই ঝড়ের মত ছুটিয়া সেই জীবাকৃতি ভূত অথবা ভূতাকৃতি জীবটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। গমনকালে ভৃত্যদিগকে বলিয়া গেলেন "ইঁহাকে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাও, ভয় নাই"।

ভৃত্যগণ নন্দকের ইঙ্গিতানুসারে চণ্ড-দেবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

পাঠিকাগণ! এই অবসরে একবার যদি সেই কিম্ভুতকিমাকার জীবটীর রূপ বর্ণনা শুনিতে চান, তবে আমার সঙ্গে আসুন। আজ যে জীবটী চণ্ডদেবের এরূপ অবস্থা করিয়া পলাইল, তাহাকে দেখিলে পৃথিবীর জীব বলিয়া উপলব্ধি করা কঠিন। তাহার মস্তক অতি প্রকাণ্ড, বদন বিস্ফারিত, জিহ্বা, চক্ষু সমুদায়ই প্রকাণ্ড। চক্ষু প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তাহাতে পলক নাই, দৃষ্টি নাই। তাহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড একটী লাঙ্গুল, ও তাহা দ্বারা সমস্ত শরীর জড়িত। পৃষ্ঠের দুই দিকে দুইখানি প্রকাণ্ড পাখা রহিয়াছে। শরীরটাকে শরীর বলিয়া বুঝা যায় না, বোধ হয় যেন অমাবস্যার অন্ধকারের একটী উচুনীচু স্তূপ বায়ু-বেগে চলিতেছে। কিন্তু সে ঘন বন-পথ ধরিয়া চলিতেছিল, তাহাই মানুষের সৌভাগ্যের বিষয়, নচেৎ ইহা যাহার নেত্রপথে পতিত হইত, সেই ভীত ও চকিত হইত। ইহার নাম যে কি, তাহা আমরা এখন পর্য্যন্তও অবগত হইতে পারি নাই। অতএব আমরা তাহাকে ভূত বলিয়াই উল্লেখ করিব। ভূত বনপথ দিয়া চলিয়াছে; ভূত চলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ভূত প্রাণপণে চলিয়াছে। উড়িবার সময় তাহার পাখা

পাখীর ন্যায়ই সঞ্চালিত হইতেছিল, এবং গমনকালে লেজটী কখন কখন আস্তে আস্তে দেহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল, কখন কখন পুনরায় দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া পূর্ব্ববৎ রাখিতেছিল। ভূত চলিতে চলিতে কখন বসিতেছিল, কখন শুইয়া পড়িতেছিল এবং কখন কখন নিবিড় বনের মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল। আবার তথা হইতে বহির্গত হইয়া উড়িতে লাগিল। ভূত চলিল, সঙ্গে সঙ্গে নন্দকও চলিলেন।

ভূত সহসা অদৃশ্য হইল, নন্দক আর তাহাকে দেখিতে না পাইয়া একটী বটবৃক্ষ-মূলে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নিদ্রা তাঁহাকে ভাবনা, শোক ও দুঃখের অতীত একটী রাজ্যে লইয়া গেল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়, নন্দক জাগ্রত হইয়াই সম্মুখে নানাবিধ ভোজনোপযোগী ফলমূল দেখিতে পাইলেন। এ সব কোথা হইতে আসিল এবং আহার করা উচিত কি অনুচিত, তাহা আর তাঁহার বিবেচনা করিবার সময় হইল না। তিনি ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, দৃষ্টিমাত্রই ফলগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র নদী কল্‌কল্‌ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি তাহা হইতে জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। তখন তাঁহাকে বেশ সুস্থ দেখাইতে লাগিল এবং তিনি পুনর্ব্বার গমনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঠিক সেই সময়েই ভূতও পুনরায় বাহির হইয়া নন্দকের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। পক্ষপুটে তাহার সমস্ত শরীর আবরিত ছিল। পশ্চাৎ হইতে নন্দক স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলেন যে, ভূত মাটীর উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নন্দক ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। উভয়েই চলিলেন, কাহারও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ভূত কখন দক্ষিণে, কখন বামে, কখন মহাবেগে, কখন মৃদুবেগে যাইতেছে। কিন্তু মহাবুদ্ধিমান্‌, মহাতেজস্বী, মহাকৌশলী ও সাহসী নন্দক ধরি ধরি করিয়াও ভূতকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন তাহারা একটী উচ্চ পাহাড়ের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নন্দক বলিষ্ঠ যুবক হইয়াও তৎকালে একটু বিরক্তি ও ক্লান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার গতি কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ভূত ধীরে ধীরে উচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িল, নন্দক পাহাড়ের পাদদেশে পড়িয়া রহিলেন। তৎকালে অন্ধকারের সীমা পরিসীমা ছিল না এবং অন্ধকারের কাল-গর্ভে মা বসুমতী ক্রমে ক্রমে লুক্কায়িতা হইতেছিলেন। কিন্তু ঘন ঘটার মধ্য হইতে যে বিদ্যুচ্ছটা চমকিত হইতেছিল, তদ্দর্শনেই তাহারা দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছিল।

ভূত পাহাড়ের উপর উঠিল দেখিয়া নন্দকের চৈতন্যোদয় হইল, এবং বিষম অনুতাপ ও লজ্জায় তিনি বসিয়া পড়িয়া নিজে নিজেকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন, "আমাকে ধিক্ যে আজ আমাকে সারাটা দিনই একটা ক্ষীণজীবী ভূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে হইল। সমস্ত দিনের মধ্যেও আমি তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। উপরন্তু, সেই আমাকে অতিক্রম করিয়া গেল। অথবা আমি ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ তাহাকে ধরি নাই। এই গভীর বনমধ্যে একাকী একটা ভূতকে আক্রমণ করিতে হয় ত আমি ভীত হইতেছিলাম, হয়ত সেই জন্যই ধরি-ধরি করিয়াই ধরিতে পারিতে-ছিলাম না। সে যাহা হোক্, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই দুষ্ট ভূতের গমনের সীমা কতদূর তাহা আমি দেখিব।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিলেন, কিন্তু ভূতের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও ভূতকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল ধবল-বসন-পরিহিত একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। মনুষ্যমূর্ত্তি যে স্থানে বসিয়াছিল, তাহার নিম্নেই একটা সমুদ্রবৎ গর্ত্ত। নন্দক দেখিলেন ভূত যদি আর একপদও অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সেই সমুদ্রে পতিত হইবে। নন্দক বুঝিলেন সে স্থানে পড়িলে ভূত হোক্, মানুষ হোক্, দেব বা দানব যাহাই হোক্, কাহারও নিস্তার নাই, এককালে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। নন্দক আরও দেখিলেন যে, সেই ভীষণাকৃতি গহ্বরের ভিতর স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড পর্ব্বতপ্রমাণ এক একটী বালুকাস্তূপ রহিয়াছে এবং এই স্তূপের একটী এই পাহাড়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নন্দক তখন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় হইয়াছেন। মৃত্যুর ভয় ও জীবনের বাসনা তাঁহাকে ভীত বা বিস্মিত করিতে সমর্থ হইল না। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই ভূতকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মনুষ্যমূর্ত্তিটী শীলাবৎ অচল অবস্থায় উপবিষ্ট রহিল, পলাইবার কিম্বা আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা করিল না। নন্দক মহাবলে মনুষ্যমূর্ত্তিটীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তখন মূর্ত্তিও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং পাহাড় হইতে সেই সমুদ্রবৎ গহ্বরের দিকে নিপতিত হইল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় নন্দক বিচলিত হইলেন এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিলেন যে, তাহার জীবনের এইখানেই শেষ।

তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, আকাশে ঘন ঘটার চিহ্নমাত্র নাই। মধুর বাতাসে ছোট বড় লতা ও পত্রগুলি নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছিল। এই আশ্চর্য্য কার্য্য-কারণময় পৃথিবীর কি বিচিত্র রচনা-কৌশল! ঊর্দ্ধে অসংখ্যজ্যোতিকমণ্ডিত

গগনমণ্ডল, নিম্নে অসংখ্য-পুষ্প-পরিপূর্ণ অসীম বন, উত্তালতরঙ্গময় মহাসাগর, অভ্রভেদী তুষারধবল গিরিশ্রেণী, কখন অমাবস্থার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়, আবার কখনও পূর্ণিমার আলোকে আলোকিত হয়।

(ক্রমশঃ)

অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

ভারতে রেশম-শিল্প।

রেশম-শিল্প ভারতের অতি প্রাচীন ও অর্থকর শিল্প। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে আমরা রেশম অথবা উর্ণবস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বস্ত্র অতিশয় শুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং প্রাচীন ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ কোন পবিত্র অনুষ্ঠানাদির সময় এই রেশমবস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা পূর্ব্বে বহুমূল্য বস্ত্রের মধ্যে গণনীয় হইত এবং রাজা, জমিদার প্রভৃতি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণই এই বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণগণও যজমানদিগের নিকট পাইয়া এই সকল বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকম্পায় রেশমবস্ত্র বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এখন নীচ ও উচ্চ সকলেরই রেশমের একখানি চাদর না হইলে চলে না। আজকাল অবস্থানুসারে ধনী ও দরিদ্র উভয়েই রেশমের চাদর ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তুগত অনেক পার্থক্য আছে। ইহা হইতে দেখা যে, রেশমের বস্ত্রের নিশ্চয়ই এরূপ কোন গুণ আছে, যাহার জন্য ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে তাহার সমাদর করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা কার্পাসবস্ত্র অপেক্ষা প্রায় ৮।১০ আট দশ গুণ অধিক স্থায়ী হয়। যেখানে কার্পাসবস্ত্র এক বৎসর যায়, রেশমের বস্ত্র সেখানে ৮ বৎসর যাইবে। কার্পাসবস্ত্রের ন্যায় ইহা শীঘ্র অপরিষ্কার হয় না এবং মলিন হইলেও কর্পাসবস্ত্রাপেক্ষা অনায়াসেই তাহা স্বহস্তেই পরিষ্কার করা যায়। অধিকন্তু ইহা ব্যবহারে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। এই শিল্প কতকাল হইতে যে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কেহ ঠিক নির্ণয় করিতে পারেন না। প্রবাদ আছে যে, এই শিল্প পূর্ব্বকালে ভারতের উত্তরপূর্ব্বস্থিত চিন দেশেই কেবলমাত্র প্রচলিত ছিল। চীনদেশের কোন রাজ্ঞী এক দিন নিজ উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পান যে, একটী গাছে একটী কীট নিজ মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত করিয়া তাহার দ্বারা তাহার গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। তিনি বিস্ময়াম্বিত হইয়া উক্ত সূত্র নিষ্ক্রামণ করিয়া দেখিলেন যে, তাহা অতি শক্ত এবং ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট

এবং তাহা হইতে বেশ সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। তৎক্ষণাৎ তিনি অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেইরূপ সূত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। যে কীটের মুখ হইতে সূত্র নিঃসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে রীতিমত আহারাদি দানে গৃহে পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও প্রচার করিলেন যে, তাঁহার দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য কেহ এই রেশমসূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং এই কীটের বীজ তাঁহার রাজ্য হইতে যে কেহ অন্য কোন রাজ্যে লইয়া যাইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিছুকাল পরে ভারতের হিমালয়প্রান্তবর্ত্তী কোন প্রদেশের নৃপতির সহিত উক্ত রাজ্ঞীর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীরপ্রদেশেই উক্ত রাজকুমারীর বিবাহ হয়, কেননা এক্ষণে ভারতের মধ্যে কাশ্মীরই রেশমশিল্পে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। উক্ত রাজকুমারী যখন বিবাহের পর স্বামিগৃহে আগমন করেন, তখন তিনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া গোপনে ঐ রেশমকীটের কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে তাহা শ্বশুরগৃহে লইয়া আসেন এবং সেখানে গোপনে রেশমসূত্র দ্বারা নিজ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রাদি বয়ন করান। কিন্তু এ সংবাদ চীনসাম্রাজ্ঞীর নিকট অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন ঘটনাক্রমে একখণ্ড রেশমের বস্ত্রে কোন দ্রব্য বাঁধিয়া রাজকুমারী তাঁহার মাতার নিকট পাঠান। রাজ্ঞী তাহা হইতে বুঝিলেন যে, রাজকুমারী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া রেশমকীটের বীজ অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কন্যা ও জামাতার শিরশ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করিয়া একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজকুমারী এই সংবাদ পাইবামাত্রই এক ভৃত্য সমভিব্যাহারে রেশমকীটের সঞ্চিত বীজ সঙ্গে লইয়া নিজ সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গভীর অরণ্যে প্রস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধান্বিতা চীনরাজ্ঞীর আদেশে চীনসৈন্য কর্ত্তৃক কাশ্মীররাজ্য সমতলীভূত হইয়াছিল এবং রাজকুমারী ও সেই ভৃত্য ব্যতীত আর সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সঙ্গে যে অলঙ্কারাদি ছিল, তদ্দ্বারা রাজকুমারী ভৃত্যের সাহায্যে কিছু দিন চালাইলেন। পরে গ্রাসাচ্ছাদনের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহার সেই রেশমকীট পালন করিয়া তাহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে ও উক্ত ভৃত্যের সাহায্যে তাহা বড় বড় রাজপরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। কথিত আছে যে, এই প্রকারে ভারতবর্ষে রেশমশিল্পের প্রচার হয়, কিন্তু ইহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা অনেকটা ঠাকুরমার গল্পের ন্যায় বোধ হয়।

ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে এই শিল্পের প্রচার সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়। কয়েকজন ইউরোপের খৃষ্টান পাদ্রী চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তথায় এই নূতন শিল্পের প্রচার দেখিয়া স্বদেশে এই শিল্প প্রচার করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাঁহারা সেই কীট নিজদেশে লইয়া যাইবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তাঁহারা তিন জনে তিনটী ফাঁপা যষ্টি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গুপ্তভাবে উক্ত কীটের ডিম্ব লুকাইয়া লইয়া অতি কষ্টে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা এইরূপে নিজ দেশে উক্ত শিল্প সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে ইউরোপ রেশমশিল্পের উন্নতির জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে।

অন্যান্য সকল প্রকার বিবরণী হইতেও জানা যায় যে, রেশমশিল্পের উৎপত্তিস্থান চীনদেশ। তথা হইতে জাপান, ভারত, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইটালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা দেশে এই শিল্প বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতে এই শিল্পের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে রেশমবস্ত্রের উল্লেখই যথেষ্ট প্রমাণ।

এই রেশমশিল্প এক্ষণে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশদেশান্তরে অল্প বিস্তর ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর পশ্চিমে বেনারস, বঙ্গদেশে মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া, আসামে গৌহাটী, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সকল স্থানেই এই শিল্পের বিশেষ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। রেশম ও পশমের মধ্যে প্রভেদ অনেক। পশম চতুষ্পদ জন্তুবিশেষের লোম হইতে উৎপন্ন, রেশম কীটের লালা হইতে প্রস্তুত। রেশমের কীট হইতে রেশমের চাষ ও কিরূপে রেশম উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রেশমব্যবসায়ীরা রেশমের রীতিমত চাষ করিয়া থাকেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, রেশমের আবার চাষ কিরূপে হয়। রেশমব্যবসায় প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত (১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা; (২) কোয়া হইতে রেশমসূত্র প্রস্তুত করা; এবং (৩) সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়নাদি। এই ত্রিবিধ কার্য্য সচরাচর তিন শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। এক শ্রেণীর লোক কেবল কোয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কেবল রেশমের সূতা, তৃতীয় শ্রেণীর লোক কেবল সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থলে একাধিক কার্য্য একই ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) রেশমের কোয়া উৎপন্ন করা—রেশম-কীট নানাজাতীয়, কিন্তু তাহাদের পালনপ্রণালী সকল স্থানেই প্রায় একইরূপ। রেশমকীটের মধ্যে কতকগুলি বাৎসরিক অর্থাৎ বৎসরে একবার, কতকগুলি ষাণ্মাসিক অর্থাৎ বৎসরে দুইবার, এবং কতকগুলি ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বৎসরে তিন

বার ডিম্ব প্রসব করে। আবার কতকগুলি বৎসরের মধ্যে বহুবারও ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

রেশমকীট ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, এই ডিম্ব আবার রেশমের কোয়া হইতে প্রজাপতিরূপে যে কীট বাহির হয়, তাহা হইতে পাওয়া যায়। কোয়া-ব্যবসায়ীরা অনেক সময় কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে তাহার ডিম্ব সংগ্রহ করে এবং কখন কখন কোয়া না লইয়া কেবল ডিম্বই সংগ্রহ করে। ডিম্ব-সংগ্রহের পূর্ব্বে তুঁত গাছের আবাদ করিতে হয়। ইহা প্রায়ই ছোট ছোট গাছ আনিয়া চাষ করা হয়। বড় বড় তুঁতের গাছও অনেক দেখা যায়।

ভারতে যে কয় জাতীয় রেশম-কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বিলাতি পলু (B. Mori), বড় পলু (B. Textor), নিস্তারী বা মান্দ্রাজী পলু (B. Crœsi), দেশী বা ছোট পলু (B. Fortunatus), চীনা পলু (B. Senisis) ই প্রধান। এই কয় জাতীয় পলুর চাষই ভারতে হইয়া থাকে। এই সকল পলু তুঁত গাছের পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করে, এই কোয়ার রেশম হইতে গরদ প্রস্তুত হয়।

এতদ্ভিন্ন তসর, এণ্ডি, ও মুগা জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রেশমের পোকা আছে। তাহাদের কোয়া হইতে তসর, এণ্ডি ও মুগার কাপড় প্রস্তুত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহাদের অল্প বিস্তর চাষ হয়। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার রেশমের কীট পালন করা হয়। নিস্তারী ও ছোট পলু এই দুই জাতীয় কীট পালনে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না এবং অতি অল্প যত্নেই ইহারা কোয়া প্রস্তুত করে।

উক্ত জাতীয় কীটের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া চাষীরা বংসনির্ম্মিত ডালায় বিস্তৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। ডিম পাড়িবার ৮।১০ দিন পরে উক্ত ডিম হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকারের ছোট ছোট পোকা বাহির হইয়া ডিমের খোলার উপর বসিয়া থাকে। ইহাকে ডিম মুখান বলে। এই ডিম সকল প্রায়ই সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত মুখায়, গরমে ও শীতে এই সময়ের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। শীতকালে সচরাচর কিছু অধিক সময় পর্য্যন্ত ডিম মুখায়। সকালে ডিম মুখাইবার সময় উত্তীর্ণ হইলে নরম তুঁতের পাতা খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া সেই মুখান পোকার উপর অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত মুখান পোকা ঐ পাতের উপর উঠিয়া তাহা খাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় খুব নরম বুরুষ কিম্বা পালক দ্বারা সেই পাতাসমেত পোকা গুলিকে ঝাড়িয়া একটী কাগজের উপর সংগ্রহ করিতে হয় এবং বেশ, সমান করিয়া একটী গোলাকার চাক বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

এই ভাবে রাখিয়া দিনের মধ্যে ৫।৬ বার পাতা কুচাইয়া ইহাদিগকে খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ৪।৫ দিন খাওয়াইবার পর ইহাদের প্রথম খোলা ছাড়িবার সময়

উপস্থিত হয়। তখন তাহারা খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকে। এক দিন এইরূপ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া পর দিন তাহারা খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করে। তখন তাহাদের শরীর অত্যন্ত থস্‌থসে ও পূর্ব্বকার শরীর অপেক্ষা তিন গুণ বড় হয়। খোলস পরিত্যাগের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তাহারা কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ থাকে। পরে তাহাদের উপবাসের আহার পূরণ করিবার জন্য আগ্রহের সহিত খাইতে থাকে। ৩।৪ দিন এইরূপ খাইবার পর তাহাদের দ্বিতীয়বার খোলস পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হয়। তখন প্রথম বারের ন্যায় খাওয়া বন্ধ করিয়া নিস্তব্ধভাবে একদিন থাকিবার পর দ্বিতীয় দিনে আবার খোলস পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করে। এইরূপে তাহারা চারি বার খোলস পরিত্যাগ করে এবং প্রত্যেক বার খোলস পরিত্যাগের পর তাহাদের আকার তিন গুণ বৃদ্ধি হয়। চারি বার খোলস-ত্যাগের পর তাহারা কীটজীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়। এই সময় তাহারা ক্রমাগত খাইতে থাকে। ৮।১০ দিন খাইবার পর তাহাদের শরীরের রং লাল্‌চে হয়। তখন বুঝা যায় যে, ইহাদের অঙ্গে রেশমের সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহারা কোয়া নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই সময় উহাদিগকে এক একটী করিয়া পৃথক করিয়া লইয়া বাসা নির্ম্মাণোপযোগী সরু সরু থাকযুক্ত ডালাতে ছাড়িয়া দিলে ইহারা মুখ হইতে রেশম বাহির করিয়া তাহাতে কোয়া নির্ম্মাণ করিতে থাকে। তিন দিনের মধ্যে এক একটী সোণালী রংয়ের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া নিজেরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাহাদের জীবন শেষ হয় না। তাহাদের শরীর হইতে রেশম বাহির করিতে করিতে যখন সমস্ত রেশম শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদের দেহের আয়তন সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সঙ্কুচিত দেহের উপর পাখা নির্গমন ও নানা পারবর্ত্তন হয়। ঐ কোয়ার মধ্যে আট দশ দিন থাকিবার পর সেই কীটগুলি এক একটী সুন্দর প্রজাপতির আকারে কোয়ার মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির হয়। এই প্রজাপতিদিগের মধ্যে দুই জাতি আছে, একটী পুরুষ জাতি, অপরটি স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল এবং একস্থানে স্থিরভাবে পড়িয়া থাকে, কিন্তু পুংজাতীয় প্রজাপতি স্বভাবতঃই চঞ্চল। যদিও কোন জাতিরই উড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি পুংজাতীয় প্রজাপতি ডানা ঘন ঘন নাড়িয়া ফরফর শব্দ করিতে করিতে স্ত্রীপ্রজাপতির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। কোয়া কাটিয়া তাহা হইতে বাহির হইবার পর ইহারা ৫।৬ ঘণ্টা এক সঙ্গে থাকে, পরে তাহারা পৃথক হইয়া যায়। অনেক সময় তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লইয়া পুংপ্রজাপতিটী ফেলিয়া দিয়া স্ত্রীপ্রজাপতিদিগকে একটী স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলে তাহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই ডিম হইতে পুনরায়

কীট বাহির হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ডিম হইতে কীট, কীট হইতে কোয়া, কোয়া হইতে প্রজাপতি, এবং প্রজাপতি হইতে আবার ডিম্ব পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ইহাদের কার্য্যপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কীট অবস্থায় ইহাদের কার্য্য কেবল আহার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থায় ইহারা ক্রমাগত আহার করিতে থাকে। কোয়া অবস্থায় ইহাদের কোন কার্য্যই থাকে না, কেবল নিঃশব্দে তাহার মধ্যে তাহাদের আকার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রজাপতি অবস্থায় তাহাদের ডিম প্রসব ভিন্ন আহারাদি কিম্বা অন্য কোন কার্য্যই থাকে না। ডিম্ব প্রসবের ৮।১০ দিন পরেই প্রজাপতিরা আপনারাই মরিয়া যায়। এই ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া চাষারা তাহা হইতে পুনরায় কোয়া উৎপন্ন করে। তসর, এণ্ডি, ও অন্যান্য রেশমের কীটের কোয়া-প্রস্তত প্রণালীও একই প্রকার।

(২) কোয়া হইতে সূতা প্রস্তুত করা— রেশমের কোয়া প্রস্তুতকরা শেষ হইলে তিন চারি দিন পরে সেই সমস্ত কোয়া রৌদ্রেদিয়া পোকা মারিয়া ফেলা হয়। কখন কখন আগুনের তাপেও তাহাদিগকে মারা হয়। কোয়ার মধ্যস্থ পোকা মরিয়া গেলে কোয়াগুলি একবার আগুনে ভাপাইয়া লইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া গরম জলে ফেলিতে হয়। গরম জলে ৪।৫ মিনিট থাকিবার পরই কোয়ার সূতা শিথিল হইয়া যায়। সেই সময় সূতার মুখ ধরিয়া লাটায়ে জড়াইলে প্রত্যেক কোয়া হইতে একটী অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির হইয়া আইসে, কেবল পোকাটী জলে পড়িয়া থাকে। দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা এই সূতা সংগ্রহের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু সকলকার কার্য্য-প্রণালী ঐ একই ভাবে পরিচালিত। সমস্ত কোয়াটী একটী অবিচ্ছিন্ন-সূতা-নির্ম্মিত বলিয়া, ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

এণ্ডি প্রভৃতির কোয়া হইতে এরূপ ভাবে সূতা প্রস্তুত করা যায় না। ইহা কোন ক্ষার-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত প্রথমে সিদ্ধ করিয়া পরে চরকা দ্বারা, কিম্বা পিঁজিয়া সূতা সংগ্রহ করিতে হয়। যে সকল কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অবিচ্ছিন্ন সূতা পাওয়া যায় না। তথাপি সেগুলি হইতে সূতা বাহির করিতে হইলে এণ্ডির কোয়ার ন্যায় সূতা বাহির করিতে হয়। এই সূতা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মট্‌কা বলে।

(৩) রেশমবস্ত্র বয়ন ও রসান—রেশম-বস্ত্রবয়নের জন্য তাঁতের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত রেশমবস্ত্রের জন্য তাঁতের তারতম্য আছে। মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশমপ্রধান স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ তাঁতি আছে। তাহাদের হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত রেশম-বস্ত্র অতি সুন্দর বিলাতী বস্ত্রকেও পরাজিত

করে। ইহাদের নিজেদের উদ্ভাবিত তাঁতে এই সকল বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেশমের সুতার রং করিবার জন্য তাঁতি বিবিধ প্রকার দেশী মশলা ব্যবহার করে। এই রং বিলাতি রং অপেক্ষা বেশী দিন স্থায়ী হয়।

রেশম-শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

"ফুল"

(১)

কে তোমারে নিরমিল কাননসুন্দরি,
অতুল সৌন্দর্য্যভার, দেহেতে ধরে না আর,
স্মিতমুখে থাক সদা কারে বা নেহারি ?
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুর্য্য যাই বলিহারি।

(২)

হেরিয়া তোমার সেই সুচারু বদন,
নিমেষে সকলি ভুলি, সংসারযাতনাবলী,
কি আনন্দস্রোতে যেন হই নিমগন ;
জাগ্রতে নেহারি যেন কিসের স্বপন।

(৩)

নাহিক উপমা তব জগতমাঝারে,
বিধি বুঝি নিরজনে, গড়েছিল সযতনে,
লালিত্যমণ্ডিত তব শরীর সুন্দর,
স্বর্গজ্যোতি হেরি তাই তোমারি উপর।

(৪)

অথবা ছিলে কি কভু অমরনন্দিনী,
আপন করমদোষে, আসিয়াছ তাই শেষে,
ভুঞ্জিতে পাপের ভোগ সুরবিমোহিনি ;
নতুবা আসিবে কেন, দেবআদরিণি।

(৫ (

বালকের হও তুমি খেলার আধার,
যুবকেরা সযতনে, কণ্ঠে ধরে তোমাধনে,
বৃদ্ধ হস্তে হও তুমি দেব-উপহার ;
রমণীকুলের তুমি প্রিয় অলঙ্কার।

(৬)

নহ শুধু স্মিতমুখি ! সৌন্দর্য্য-আধার,
সৌরভে ভুলাও প্রাণ, ভ্রমর করয়ে গান,
গন্ধবহ বহে সদা সুগন্ধভাণ্ডার ;
রূপে গুণে সমতুল কে আছে তোমার।

(৭)

কিছুই ত চিরস্থায়ী না আছে ধরায়,
এত রূপ, এত হাসি, এত যে সৌরভরাশি,
সবতো হারায়ে ফেল নিমেষেতে হায় !
সামান্য তপন-তাপ সহে না যে গায়।

(৮)

এ সংসার নহে তব যোগ্য বাসস্থান,
তাপদগ্ধ এ ধরায়, সকলি ফুরায়ে যায় ;
হয় নাকো শুধু হায় দুঃখ অবসান ;
বড়ই সহিষ্ণু এই মানবপরাণ।

(৯)

যাও তবে—যাও তুমি অমরনগরে,
নন্দনকাননমাঝে, সাজিয়ে মোহন সাজে,
চির তরে ভাস সদা সুখের সাগরে ;
তোমার দারুণ ব্যথা সহে না অন্তরে।

(১০)
অথবা একটী বার বল কৃপা করি,
কেমনে এ দুঃখরাশি, সতত উড়াও হাসি,
কেমনে হাসাও পরে কাননসুন্দরি ;
পালিব তোমার আজ্ঞা প্রাণপণ করি।

(১১)
দেখি যদি পারি আমি বারেক ভুলিতে,
হৃদয়ের হুতাশন, সংসারের জ্বালাতন,
যাহাতে দহিছি নিত্য এ মর ভূমিতে ;
শান্তি বুঝি নাহি কভু মিলে পৃথিবীতে।

(১২)
সুধায়েছি বার বার বহু শত জনে,
বলেনি ত তারা তবু লভিয়াছে শান্তি কভু,
তাই বলি শান্তি নাই মানবজীবনে ;
চির শান্তি শুধু সেই শান্তিনিকেতনে।

শ্রীচারুমোহন দে, রাজসাহী।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

শিবকৃষ্ণ বাবু আমার Guardian angel হইয়া দেখা দিলেন। কি ভালবাসাই তিনি বাসিতেন, কি নিঃস্বার্থ বন্ধুতার কার্য্যই তিনি করিতেন। তাঁহার নিকট আমার ধর্ম্ম শিক্ষা, রচনা শিক্ষা, বিচার শিক্ষা ও মহৎ লক্ষ্যসাধনে উৎসাহ হয়। তাঁহার যত্নে আমার কলিকাতায় আসিবার সুযোগ হয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমাকে কলিকাতা দেখাইয়া লইয়া যান। তাঁহার সহিত বন্ধুত্বে আমি মজিলপুরে কি উন্নত অবস্থায় ছিলাম। তাঁহার উদ্যানে আসিয়া সঙ্গীতাদিতে আমি কত উপকার পাইতাম। তাঁহার দ্বারা আমার নানাবিধ উপকার হইত। মানুষে মানুষের এত উপকার করে, আমি কখনও দেখি নাই।

১৮৬০ ৬১ অব্দে মেডিকাল কলেজে পাঠ করি। বিজ্ঞানপাঠে অনেক শিক্ষা হয়। কিন্তু কলেজ আমার পক্ষে অস্বাভাবিক স্থান বলিয়া বোধ হইত। জ্যেষ্ঠ সহোদরের পীড়া হওয়ায় তাঁহার সন্তানদিগকে কলিকাতায় লইয়া আসাতে আমার কষ্টের বৃদ্ধি হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আমার মস্তকের ও চক্ষুর পীড়া হয় এবং শেষে স্কলার্সিপও বন্ধ হয়। তখন অগত্যা কলেজ ছাড়িতে হইল। ১৮৬২ সালে বাবু হরনাথ ভঞ্জ প্রতিষ্ঠিত জয়নগরের ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হই। কালিনাথের সহিত মজিলপুর ইংরাজি স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলাম। শিবকৃষ্ণ বাবুর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইঁহারও আকর্ষণ হয়। এক্ষণে মজিলপুরে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিশেষরূপে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের চর্চ্চা হয়। তৎপরে কালিনাথের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে মজিলপুরে মহা সমাজিক আন্দোলন হয়, তাহাতে আমাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয়।

পিতামহীর] স্বর্গারোহণ — আমার

পিতামহী অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পতি, পুত্র ও কন্যাদিগকে হারাইয়া তিনি পাগলের মত হইয়াছিলেন। পরে পিতাঠাকুরের মৃত্যুতে একেবারে ভগ্ন-হৃদয় ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া যান। তথাপি পৌত্রপৌত্রীদিগের জন্য তাঁহার যত্ন ও স্নেহের ক্রুটি ছিল না। এই অবস্থায়ও তাঁহার ধর্ম্মে অনুরাগ দেখা যাইত। তিনি রাত্রি থাকিতে উঠিয়া দেবতাদিগের নাম ও নানা ব্রতকথা আবৃত্তিতে অনেক সময় কাটাইতেন এবং আহ্নিক, পূজা ও দেবমূর্ত্তিদর্শনেও অনেক সময় দিতেন।

শেষাবস্থায় কিছু দিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া ছিলেন। তখন আগ্রহের সহিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনিতেন। এ সময় আমাদের কনিষ্ঠ সহোদর পাঠার্থ কলিকাতায় অবস্থিতি করে এবং আমি ও জ্যেষ্ঠসহোদর মজিল-পুরে থাকি। ইনিও আমার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী বিদ্যাশিক্ষা ও তৎসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। আমি তখনও জয়নগর স্কুলে শিক্ষকতা করি। গ্রামের মধ্যে আমাদের একমাত্র ব্রাহ্ম বন্ধু কালিনাথ। তাঁহারই বাটীতে সর্ব্বদা ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা হয়। পিতামহীর পীড়া একদিন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল এবং তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। কবিরাজ রামধন বৈদ্য দেখিয়া বলিলেন "আর কেন গঙ্গায় লইয়া চল।" বাটীর সম্মুখস্থ "হেদোর" ঘাটে আমরা দুই ভাই কবিরাজের সহায়তায় তাঁহাকে লইয়া গেলাম। কবিরাজ "অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিয়া নাম ডাকিতে লাগিলেন কিছু দূরে অনেকগুলি লোক মূক সাক্ষীর ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় জেঠা মহাশয় দাদা মহাশয়কে পুকুরের অন্য পাড় হইতে বলিতে লাগিলেন "অভয় আমাদের মতে কাজ কর্ম্ম করিস্ ত বল।" দাদা বলিলেন "মশাই এ সময় একবার আসুন, পরে যেমন হয় করা যাইবে।" তিনি জমী-দারের দেওয়ান, অমনি সরিয়া গেলেন, আর কেহ কাছে ঘেঁসিল না। তখন অপরাহ্ণ, মা কাঁদিতে লাগিলেন। দাদা বলিলেন "আর কাহাকেও কাজ নাই, চল আমরা দুই জনেই সব কাজ সমাধা করিব। তাঁহার বায়ুর ধাতু, রাখিলে রক্ষা নাই। ভৃত্য কৃষ্ণ গোয়ালাকে একখানি কুড়ুল সহিত সঙ্গে লইয়া দুই ভাইয়ে শবস্কন্ধে গ্রামের প্রান্তস্থিত বুড়োর ঘাটে গেলাম। সেখানে কাঠ লইয়া ভৃত্য চেলা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে জমীদারের দুই জন লোক আসিয়া বলিল এ স্থানে পোড়াইবার হুকুম নাই, অন্যত্র লইয়া যাও। তাহাদের একজন ভৃত্যের হস্ত হইতে কুড়ুলখানি কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা নিরুপায়। কিয়ৎক্ষণ পরে জমীদারের এক ভৃত্য আসিয়া কুড়ুলখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিল "মড়া আর কোথায় লইয়া যাইবে।" আমরা তখন ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নাম করিতে করিতে ভৃত্যের পরামর্শানুসারে চিতা সাজাইয়া শবদাহ করিলাম। রাত্রি

প্রহরেক হইলে বাটী যাইয়া দেখি মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে আক্ষেপ করিতেছিলেন। যথাবিধি দ্বারে অগ্নি জ্বালিয়া আমাদিগকে যত্ন করিয়া ঘরে লইলেন, কিন্তু সে রাত্রি আমাদিগকে বাহির-বাটীতে থাকিতে হইল।

পরদিন দেশের লোক শবদাহ সম্বন্ধে আমাদের নামে নানা প্রকার দুর্নাম রটনা করিয়া দিল। কেহ বলিল শব পুতিয়াছে, কেহ বলিল অবৈধভাবে দগ্ধ করিয়াছে। মার উপর পাড়াপ্রতিবাসীরা পীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল "সন্তানদিগকে ত্যাগ কর।" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু ছেলেদিগকে ছাড়িতে পারিব না, আর তাহাদিগকে কি দোষেই বা ছাড়িব।" চক্ষের জলে ভাসিয়া মা আমাদিগকে বলিতেন "তোদের ত কোন দোষ নাই দেখিতেছি, তবে লোকে মন্দ বলে কেন? লোকে মন্দ না বলে এমন করে কি চলতে পারিস্ না।" তিনি ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে ভাল বাসিতেন। অনেক সময় একাদশীর উপবাসে তাহাই শুনিয়া সুখানুভব করিতেন। অন্তরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার টান থাকিলেও সমাজের এবং প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া হিন্দুধর্ম্মমতে শাশুড়ীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। শ্রাদ্ধের দিন যত নিকট হইতে লাগিল, আত্মীয় স্বজন ততই আমাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লণ্ডন নগরে সর্ব্বজাতি-সম্মিলনের এক সমিতি বসিয়াছে। কুচবিহার কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় উক্ত সভার শুভ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য লোকদিগের সহিত এদেশের লোকের সম্বন্ধ ও তাহার আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য।

২। মান্দ্রাজে কাবেরী নদীর এরূপ প্রবল বন্যা হইয়াছে যে,তাহাতে ওয়েলস্লি ব্রিজের কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে লোকদিগকে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এইরূপ বন্যা এই নদীতে আর কখনও হয় নাই।

৩। চীন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইংরাজি ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাস হইতে পারস্য ও তুরস্কের আফিম চীনসাম্রাজ্যে আর আমদানী হইতে পারিবে না।

৪। কলিকাতা ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামযাত্রিগণের জন্য একটি বিশ্রামস্থান শীঘ্রই নির্ম্মিত হইবে।

৫। শুনা যাইতেছে, লণ্ডন নগরে এক

নূতন "সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত" প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আদালতই নাকি ব্রিটিশ সম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত হইবে।

৬। কেহ কেহ বলেন যে, কেঁচোর শরীর হইতে যে একপ্রকার উজ্জ্বল রস বহির্গত হয়, সেই রস সর্পবিষের অব্যর্থ ঔষধ। এই রস জলের সহিত মিশাইয়া এক ঘণ্টা অন্তর তিন চারি বার সেবন করিতে হয়। প্লেগরোগেরও ইহা উত্তম ঔষধ।

৭। আমাদিগের দেশের প্রাচীন বিদ্যা ও প্রাচীন ভাষাসমূহের যাহাতে সম্যক উন্নতি হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বহু প্রাচীন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের সম্মিলনে, বটলার সাহেবের সভাপতিত্বে, সিমলায় এক সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে স্থির হইয়াছে যে, প্রাচীন-ভাষা-সমূহের অধিকতর আলোচনার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা নগরীতে একটী প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকেও নানা উপায়ে বিশেষরূপে উৎসাহিত করা হইবে।

৮। বৃষ্টিকামনায় বোম্বাই নগরে এক ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ইহাতে দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে। যজ্ঞফলে অনেক স্থানেই বৃষ্টির আভাস পাওয়া গিয়াছে।

৯। আগামী ২রা ডিসেম্বর ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবেন। সম্রাটের সমভিব্যাবহারে ভারত-ষ্টেট্ সেক্রেটারী লর্ড ক্রু, তাঁহার পত্নী এবং রাজপরিবারস্থ ২৩ জন লোক আসিবেন। তাঁহারা ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়া দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিবেন। ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার হইবে। তৎপরে ১৬ই তিনি নেপাল যাত্রা করিবেন। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী আগ্রা ও মধ্যভারত পরিভ্রমণ করিবেন। ২রা জানুয়ারি সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী কলিকাতায় আগমনের জন্য যাত্রা করিবেন। এখানে ৩রা আসিয়া পৌঁছিবেন, এইরূপ অবধারিত হইয়াছে, শুনিতেছি।

১০। আমেরিকায় অণ্টেরিও, মিশিগান প্রভৃতি স্থানে ভীষণ অগ্নি-ঝটিকা প্রবাহিত হওয়ায় দাবানলের উৎপত্তি হইয়াছে। শত শত ক্রোশব্যাপী বনভূভাগ সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি নগর পুড়িয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। নরনারী সকলে দলবদ্ধ হইয়া হ্রদের সলিলে ঝম্প দিয়া পড়িতেছে। অনেকে হ্রদের জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইতেছে। এক পরকুপাইন নগর ভস্মসাৎ হওয়ায় প্রায় চারি শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার উপর পুনঃপুনঃ প্রবল ঝড়। প্রতিদিনই নূতন নূতন নগরে অগ্নি লাগিতেছে। সর্ব্বত্রই একেবারে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ শুনা যাইতেছে। কি ভীষণ ব্যাপার!

বামারচনা।

আকাঙ্ক্ষা।

সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে গো ভুলায়ো না।
আমার সকলি তুমি
হে নাথ! জগৎস্বামী!
লও গো নিঃশেষ করি—তুমি যেন যেও না।
জগতের যত সাধ, বাসনা, কামনা,
সব লও দূর করি,
জীবনের হেয় যত আকাঙ্ক্ষা পিপাসা,
সকলি লও গো হরি',
ডরিব না, ভবিষ্যৎ ভাবিব না,
তোমা বই আর কিছু প্রাণ যে গো চাহে না।
তোমার এ ধরাপরে, তোমারে পাইলে পরে,
সংসারের কোন দুঃখ না দিবে বেদনা।
সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে গো ভুলায়ো না।

(২)

সব মম ভেঙ্গে যাক্, সব ভস্ম হয়ে যাক্,
শুধু—তুমি গো "প্রাণের হরি"—তুমি যেন যেও না!
সংসারের হেলাফেলা, চারি দিকে লীলাখেলা,
কেমন অনিত্য সব দেখ নাথ! দেখ না!
তুমি যে গো ধ্রুব তারা তুমি যেন যেও না!
সকল ভুলায়ো প্রভো মোরে, তোমারে গো ভুলায়ো না।

কুমারী প্রেমকুসুম নাগ,
ময়মনসিংহ।

হরি-ভক্তি।

হরি পদে মন কর সমর্পণ;
হরিপদ কর সার।
হরিগুণ গান প্রেমসুধা পান,
হরি বল অনিবার॥
হরিনামে হয় পাপ তাপ ক্ষয়;
হরি বিনে নাহি গতি।
হরিগুণ গাই সবে মিলে ভাই;
সে পদে করি প্রণতি॥
হরি হরি বলে, দুটী বাহু তুলে;
হরিনাম গাই ভাই।
হরির প্রসাদে, হরিপদে মেতে,
হরি হরি নাম গাই।
হরি বিনে ভাই গতি আর নাই;
হরি হরি সবে বল।
হরিগুণ গেয়ে, হরি প্রাণে নিয়ে;
হরিধামে যাই চল॥

মৃত্যু।

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হতে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে, বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারা রাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
সকল সময়ে শুধু তব আগমন।

জীবনের কাজ যত, কর্ত্তব্য কঠিন ব্রত
সাধিতে সারাটী দিন রয়েছে বিস্তৃত।
সন্ধ্যাবেলা জ্বেলে বাতি, মিলি প্রিয় সখা সাথি,
আমোদ প্রমোদ ভরে প্রফুল্লিতচিত।
নীরব নিঝুম নিশি, নির্জ্জনে একাকী বসি,
স্মরিতে, ডাকিতে সেই জগতজীবন,
সমস্ত সময় শুধু তোমার কারণ।

বন্ধুগণ মিলি সুখে প্রীতি নিমন্ত্রণ,
বাঁশীর কোমল সুরে, মলিনতা যায় দূরে,
কিম্বা শোক দুঃখে হয় ম্রিয়মাণ মন
বুকফাটা যাতনার, লুকানো আঁখির ধার,
সবারি সময় আছে কিন্তু হে মরণ!
সমস্ত সময় আছে তোমার কারণ।

মানবযৌবন যবে, ফুটে উঠে পূর্ণ ভাবে,
ফুলটি ফুটিয়ে উঠে মধু বিকিরণে,
ধ্বংসকে উপেক্ষা করে, ঠেলে দেয় ঘৃণা-ভরে,
তোমাকেও ঘৃণা করে মধুর জীবনে।
ফুটিয়ে লইব হরে' ভাবিয়া উপেক্ষা করে,
সে জাতীয় নহ তুমি অস্ফুটন্ত কলি
সবলে বিনাশ কর চরণেতে দলি।

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হ'তে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে, বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারারাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত,
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
অনিয়মে, অসময়ে তব আগমন।

জানি মোরা কবে চাঁদ পূর্ণ হয়ে উঠে,
কোকিলের গানে কবে বনে মধু ছুটে,
শরতে চন্দনের গাছে, সোণালী বরণ রাজে,
কিন্তু কে বলিবে কবে প্রস্তুত হইয়া
সাদরে তোমায় মৃত্যু! লইব বরিয়া।

যখন ফাগুনে বায় ধীরে ধীরে কানে
বলে দেয় প্রস্ফুটিত যুথি কোন্‌খানে,
তখন কি আস তুমি, অথবা চুমিয়ে ভূমি
ফুলগুলি ঝরে যবে গ্রীষ্ম অবসানে?
কে বলিয়ে দিবে হায়, কবে তব অপেক্ষায়,
রহিব আমরা ভয়ব্যাকুলিত মনে।

সাগরের বক্ষ শুভ্র ফেনমালাময়
সেথায় বিরাজ তুমি সকল সময়।
মধুর বীণার স্বর, সমীরে করিয়া ভর,
মিশে যায় শূন্য পথে, পাষাণহৃদয়!
সেখানেও অবস্থিতি তোমার নিশ্চয়।
সুখ শান্তি মধু ভরা স্নেহের ভবন
প্রতিপদে পাই সেথা তব নিদর্শন।
কর্ম্মক্ষেত্রে দূর দেশে, গেলেও ভীষণ বেশে,
সঙ্গে সঙ্গে তুমি মৃত্যু! করহে গমন,
পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে তুমি হে শমন।

সখার সখায় যেথা সুখের মিলন
সেখানেও আছ তুমি নিঠুর মরণ!
সুবট বৃক্ষের ছায়, মৃদুল দক্ষিণা বায়।
আরাম বিশ্রাম যেথা রহে অনুক্ষণ,
সেখানেও পাই সদা তব দরশন।

তীক্ষ্ণ অস্ত্র করে ধরি, বাজাইয়া রণভেরী,
গগন বিদীর্ণ করি হয় যথা রণ,
জিঘাংসায় হাসি রহে, শোণিতলহরী বহে,
অস্ত্রাঘাতে চূর্ণ হয় মাথার ভূষণ,
সেখানেও আছ তুমি অজ্ঞাত মরণ!

শীতের কুহেলীময়, উত্তরে বাতাস বয়,
শাখা হতে পাতাগুলি ঝরে পড়ে যায়।
ফুলগুলি ম্লান বেশে বৃন্ত হতে পড়ে খসে,
অবশ হইয়া যেন কত বেদনায়।
সন্ধ্যায় তারকা উঠে, সারা রাত থাকে ফুটে,
কোথায় ডুবিয়ে যায় প্রভাতের বায়।
সকলি নিয়মমত, চলিতেছে অবিরত,
সবারি সময় আছে, কিন্তু হে মরণ!
অনিয়মে অসময়ে তব আগমন।

১৬।৪ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 573. April, 1911.

৪৮ বর্ষ। ৫৭৩ সংখ্যা। { বৈশাখ, ১৩১৮। এপ্রেল, ১৯১১ } ৯ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

	*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
আ:	শু	সো		শু	সো	শু	সো
শে:	৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
	র	বৃ	র	বৃ	র	ম
	†A	M	J	Jy	A	S
	‡14	15	16	17	18	18
আ:	শ	সো	বৃ	শ	ম	শু
শে:	30	31	30	31	31	30
	র	বু	শু	সো	বৃ	শ

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সাল।
ফসলী ১৩১৮-১৯।
হিজরী ১৩২৮-২৯।
খৃষ্টাব্দ ১৯১১-১২।
শকাব্দ ১৮৩৩।
সংবৎ ১৯৬৮-৬৯।
মগী ১১৭৩-৭৪।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৮২-৮৩।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
আ:	বু	শু	র	সো	ম	বৃ
শে:	৩০	৩০	২৯	২৯	৩০	৩১
	বৃ	শ	র	সো	বু	শ
	O	N	D	J	F	M
	18	17	17	15	13	14
আ:	র	বু	শু	সো	বৃ	শু
শে:	31	30	31	31	29	31
	ম	বৃ	র	বু	বৃ	র

শু	সো	শু	সো	শু	সো
শ	ম	শ	ম	শ	ম
র	বু	র	বু	র	বু
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ
ম	শু	ম	শু	ম	শু
বু	শ	বু	শ	বু	শ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র

§১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বু	শু	র	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	সো	ম	বু	শু
শু	র	ম	বু	বৃ	শ
শ	সো	বু	বৃ	শু	র
র	ম	বৃ	শু	শ	সো
সো	বু	শু	শ	র	ম
ম	বৃ	শ	র	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু: এ:,	২৬	২৪	২২	২০	১৮	১৭
পূ:,	৩০	২৮	২৬	২৫	২২	২১
কৃ: এ:,	১২	১০	৮	৬	৩	১
অ:,	১৫	১৪	১১	৯	৭	৫

আ:—আরম্ভ। শে:—শেষ।

শু:এ:-শুক্ল একাদশী, পূ:-পূর্ণিমা। কৃ:এ:-কৃষ্ণ একাদশী, অ:-অমাবস্যা

* ‡ ২৬শে বৈশাখ মঙ্গলবার ও ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, শুক্ল একাদশী। ৩০শে বৈশাখ শনিবার ও ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা। ১২ই বৈশাখ মঙ্গলবার ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার কৃষ্ণ একাদশী, ১৫ই বৈশাখ শুক্রবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

* বৈ-বৈশাখ শুক্রবার আরম্ভ ও ৩১শে রবিবার শেষ। ১লা বৈশাখ ইং ১৪ই এপ্রেল।

+ A এপ্রেল আরম্ভ শনিবার, শেষ ৩০শে রবিবার।

‡ ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈশাখ, ১৫ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

§১লা বৈশাখ শুক্রবার, ২রা শনি ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ সোম, ২রা মঙ্গল ইত্যাদি।

বৈশাখ শুক্রবার, জ্যৈষ্ঠ শুক্র } ১.৮.১৫.২২.২৯

এক এক দিকে ৬টী করিয়া দুই দিকে ১২ মাসের গণনা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শু: এ:,	১৬	১৬	১৫	১৬	১৬	১৬
পূ:,	২০	২০	১৯	১৯	২০	১৯
কৃ:এ:,	১,৩৯	৩০		১	১	১,৩১
অ:,	৫	৪	৪	৫	৬	৫

* ‡ ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ও ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার শুক্ল একাদশী। ২০শে কার্ত্তিক সোমবার ও ২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার পূর্ণিমা। ১লা ও ৩০শে কার্ত্তিক কৃষ্ণ একাদশী। ৫ই কার্ত্তিক রবিবার অমাবস্যা ইত্যাদি।

এইরূপ মধ্যম স্তম্ভের তারিখের সহিত বাম বা দক্ষিণ স্তম্ভের মাস, বার, মিলাইয়া ধরিলে মাস, বার ও তিথি ঠিক হইবে।

নব বর্ষ।

যাঁর কৃপা বরিষণে বিশুষ্ক জীবন
নব বেশ ধরি সদা করে আগমন,
সেই বিশ্ববিধাতারে নমি বার বার,
মহাহর্ষে নব বর্ষে বরি গো আবার।

দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসর আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইল; পুনরায় আমরা নূতন বৎসরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পৃথিবী স্বীয় বার্ষিক গতিদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলকে আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। কিন্তু পৃথিবীর এক মুহূর্ত্তকালও স্থির থাকিবার উপায় নাই; ইহা আবার আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ আরম্ভ করিল। ১লা বৈশাখ হইতে এই নূতন ভ্রমণের আরম্ভ; সেই জন্য ইহাকে আমরা নববর্ষের সূচনা বলিয়া স্মরণীয় ও পবিত্র দিন মনে করি। আকাশমণ্ডলে পৃথিবীর ভ্রমণপথ বা কক্ষ (orbit)কে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সূর্য্যের পথ (ecliptic) বলিয়া কল্পনা করেন এবং এই পথের সম্মুখে যে সকল নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তাহাদিগকে এক একটী রাশি বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। বৎসরে ১২ মাস, সূর্য্য এই ১২ মাসে ১২টী রাশি ভোগ করিয়া বৎসর পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরাও এই নববর্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্থিতি ও গতি চিন্তা করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অপার জ্ঞান ও মহিমা যেন উপলব্ধি করি এবং বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, নিমেষ, মুহূর্ত্ত সকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের জীবনের পরিবর্ত্তন করি এবং নূতন আশা ও উৎসাহ লইয়া আমাদিগের কর্ত্তব্যপালনে সযত্ন হই। গত বর্ষ আমাদিগের নানাবিধ ত্রুটি স্মরণ করাইয়া বার বার আমাদিগকে ধিক্কার দিতেছে। আমরা মৃত বৎসরের সহিত, আমাদিগের দোষ ও ত্রুটি সকলকে বিদায় দিয়া নূতন হৃদয় ও মন লইয়া যেন নূতন বৎসরের সহিত কার্য্য করিতে পারি। অনন্তকরুণাময় পরমেশ্বর আমাদের আশা পূর্ণ করুন। তাঁহার করুণা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না, তিনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি নানা অবস্থা প্রেরণ করিয়া আমাদিগের উন্নতির উপায় করিবেন এবং সাক্ষিরূপে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দোষ সংশোধন ও পুণ্যের পুরস্কার বিধান করিবেন। আমরা যেন তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহারই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে যত্ন করি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

নববর্ষে ভিক্ষা।

আজি নিদাঘের কোলে বৈশাখী উষায়,
উপনীত বিশ্বমাঝে বরষ নৃপতি।
সাজি অর্ঘ্য নব-পুষ্পে পূজিতে আইল,
বালক কৈশোর নব যুবক যুবতী।
সমস্বরে মাগে সবে সৌভাগ্য সম্পদ,
ধন, মান, যশ, আয়ু, স্বাস্থ্যরূপ গতি।
মানব জীবন চাহে সুখেতে সফল,
নবীন সঙ্গীত তানে উথলয়ে প্রীতি।
কোমল মুকুলদামে নব শোভা ধরি,
নূতন সুখের আশা জাগায় প্রকৃতি।
কলঙ্কমলিন রেখা সূর্য্যতাপে গলে,
স্বচ্ছ নিরমল স্বর্ণ অনলে যেমতি।
পুরাতন জীর্ণ হয়ে ধরণী লুটায়,
ব্যথাভরা বুকে রাখি অতীতের স্মৃতি।
ওহে বরষের রাজ তোমার দুয়ারে,
রিক্ত পাত্রে শূন্য প্রাণে করিহে মিনতি।—
দেওহে ধৈরয, বল এ জীর্ণ শাখায়,
ঝঞ্ঝাবাতে বজ্রাঘাতে না হয় দুর্গতি
নীরবে অটলচিত্তে নির্ব্বিকারভাবে
বহিতে পারিগো যেন আদেশ নিয়তি।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্রাটের অভ্যর্থনা—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর মনোরঞ্জনার্থ কলিকাতার অভ্যর্থনা-সভা ভারতের দশহরাযাত্রা, ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল ও আগুনের উপর দিয়া গমনাগমন প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা করিতেছেন। শুনা যাইতেছে যে, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর এই ক্রীড়া-কৌতুক কমিটির সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছেন। সম্রাট্ ভারতে আসিয়া যাহাতে সকল বিষয়ে সুখী ও আনন্দিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

খাসিয়া পর্ব্বতে মাদক-ব্যবহার নিবারণের চেষ্টা—গবরমেণ্ট খাসিয়া পর্ব্বতে মাদকসেবন নিবারণার্থ চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট তথায় একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বঙ্গ-রমণীর লিখিত হিন্দি প্রবন্ধ—এলাহাবাদ-প্রদর্শনীতে প্রেরিত 'ব্যবসায়' বিষয়ক হিন্দি বা উর্দ্দু ভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, সেই প্রবন্ধের লেখককে খয়রিগড়ের রাণী শরৎকুমারী দেবী ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন—এইরূপ সংবাদপত্রে

অল্পবয়স্ক অপরাধী বালকবালিকা-দিগের স্বতন্ত্র বিচারবিধি—ইংলণ্ডে অল্পবয়স্ক অপরাধী বালকবালিকাদিগের স্বতন্ত্র বিচার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বরোদার মহারাজও তাঁহার রাজ্যে এই বিধি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। বয়স্ক অপরাধীদিগের সহিত একত্র বাস করাতে অল্পবয়স্ক অপরাধী বালকবালিকাগণের চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে না, বরং তাহারা নূতন নূতন দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত হয়। এই জন্য ১৬ বৎসরবয়স্ক বালকবালিকাগণ অপরাধ করিলে তাহাদের স্বতন্ত্র বিচারালয়ে বিচার করা হইবে। ১২ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকবালিকাদিগের মৃত্যুদণ্ড, নির্ব্বাসনদণ্ড কিম্বা কারাদণ্ড হইতে পারিবে না। ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন বালকবালিকাকে তামাক, সিগারেট কিম্বা কোন মাদক দ্রব্য কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। বরোদার মহারাজ তাঁহার রাজ্যে এই বিধি প্রবর্ত্তিত করিলে প্রজাপুঞ্জের ও বালকবালিকাদিগের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

প্রকাশিত হয়। এই ঘোষণার ফলে অনেক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবীর প্রবন্ধ সর্ব্বোত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রদর্শনী কমিটীর সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন। পুরুষদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিন্দি ভাষায় একজন বঙ্গরমণীর উচ্চ স্থান অধিকার করা অতি গৌরবের বিষয়। হেমন্তকুমারী দেবী ডাক্তার মার্কণ্ডেয় ভট্টাচার্য্যের পত্নী। ইনি অধুনা লক্ষ্ণৌয়ে বাস করিতেছেন।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি—কলিকাতা সহরে রাজা এডওয়ার্ডের স্মৃতিকল্পে একটী হাঁসপাতাল স্থাপনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দি, দ্বারবঙ্গের মহারাজ, রাজা প্যারী-মোহন মুখোপাধ্যায় এবং ডাক্তার এস, কে, মল্লিক প্রভৃতি এই হাঁসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। পুরুষ-দিগের জন্য যে বিভাগ হইবে তাহা রাজার নামে ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে বিভাগ হইবে তাহা রাণীর নামে অভিহিত হইবে। এই হাঁসপাতালের জন্য ৮০ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে।

চরিত্রবল।

এই সাংসারিক জীবন সুখসচ্ছন্দে অতি-বাহিত করিতে হইলে যাহা যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তন্মধ্যে চরিত্রবলই সর্ব্ব-প্রধান। এই সংসাররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা উত্তোলন করিতে হইলে চরিত্রবলকেই একমাত্র মন্দারগিরি-স্বরূপ

মন্থনদণ্ড বলিয়া জানিতে হইবে। এই সংসারের বিভীষিকাময় কার্য্যক্ষেত্রের অবসাদজনক ও শরীরক্ষয়কারী পরিশ্রমের বিনিময়ে মানবমাত্রেই শান্তি-সুধা পাইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চরিত্রবলই যে সেই শান্তিনির্ঝরিণী গোমুখী, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই। চরিত্রবল থাকিলে যে সংসারের শোক-দুঃখের বিকট ভ্রূভঙ্গি সহ্য করিতে হয় না, তাহা নহে; তবে কথা এই যে, মনুষ্য এই মন্দারগিরি-প্রতিম চরিত্রবলের সহায়তায় ইহজগতে শান্তিসুধা লাভ করিবার চেষ্টা করিলে যদি অমৃতের বিনিময়ে গরল উত্থিত হয়, তাহা হইলেও তাঁহার বিশেষ চিন্তার কারণ থাকে না। কারণ চরিত্রবান্ ব্যক্তি মহাদেবের ন্যায় সেই হলাহল পান করিয়াও অবিচলিত অবস্থায় কর্ত্তব্য-পালনে সমর্থ হইতে পারেন এবং এই দৈবশক্তির প্রভাবেই স্বর্গীয় শান্তিসুধা লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী হন।

এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, চরিত্রবলই মানসিক বলের পূর্ণ বিকাশ। যাঁহার যে পরিমাণে মানসিক বল বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার সেই পরিমাণেই চরিত্রও উন্নত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, সংযমী মহা-পুরুষদিগকে অসংযমীর ন্যায় শোকসন্তাপ-মূলক দুর্ঘটনায় অথবা ভোগবাসনা পরি-তৃপ্তির আপাততঃ মধুরমোহিনী মায়ায় বিচলিত ও বিমুগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতে হয় না। আমরা পূর্ব্বেই এই সংসারকে মহাসমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়াছি। বস্তুতঃ মহাসমুদ্র যেমন গরল ও অমৃত এই বিপরীতগুণ-বিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের আধারস্বরূপ, এই সংসারও তদ্রূপ শান্তি ও অশান্তির আধার। সংসার-নিকেতনের অধিবাসি-গণই এই শান্তি ও অশান্তির জন্মদাতা। গভীর গবেষণার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই সংসারে চরিত্রহীন অসংযমী লোকই অশান্তির এবং চরিত্রবান্ সংযমী মানবই শান্তির একমাত্র অধিকারী।

চরিত্রহীন, অসংযমী ব্যক্তিগণ আপনাপন অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া আপনারা তাহার তীব্রজ্বালা ভোগ করেন এবং তৎসঙ্গে তাহাদের সম্পর্কীয় অন্যান্য ব্যক্তিগণও প্রকারান্তরে সেই অশান্তির বিষময় রস অল্পবিস্তর আস্বাদন করিতে বাধ্য হন। অন্যপক্ষে দেখা যায়, চরিত্র-বান্ ও সংযমী ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা স্থানে স্থানে শান্তির বীজ বপন করিয়া থাকেন, এবং তাহাই কালে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের দিব্য সুখভোগের মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত করিয়া দেয়।

চরিত্রবল যে মানসিক বলের পূর্ণ বিকাশ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মুখশ্রীই যেমন হৃদয়ের সূচীপত্র, তদ্রূপ চরিত্রবলই মানসিক বলের পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে,

চরিত্রবলের ন্যায় অমূল্য ধন লাভ করিতে হইলে মানসিক বলের বিশেষরূপ পুষ্টি-সাধন করা আবশ্যক। মানব কি উপায়ে কোন্ সময়ে এই মানসিক বল লাভ করতঃ চরিত্রবলের অধিকারী হইতে পারে এবং তদভাবে মানুষের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয় আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাক্যে ও অর্থে যেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিদ্যমান, মানসিক বল এবং চরিত্র-বলেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। মানসিক বল চরিত্রবলের মূল কারণস্বরূপ হইলেও এই চরিত্রবল কখনই ঐ মূল হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং মানসিক বলের সহায়তায় একবার চরিত্রবল সঞ্চয় করিয়া লইলেই যে তদভাবেও চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন—এরূপ সংস্কার যেন কাহারও মনে স্থান না পায়।

মানবজন্মপরিগ্রহানন্তর কোন্ সময় হইতে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে এই মানসিক বল ও ক্রমে তাহা হইতে চরিত্র-বল লাভ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়। শিক্ষার কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মনুষ্য বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত জীবিত কালের মধ্যে যে কোন সময়েই শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায় না যে, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য মানবজীবনের এই চারি অবস্থাই শিক্ষার সমান অনুকূল। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাল্যকালই শিক্ষার প্রশস্ত সময়। বাল্যাবস্থা হইতে মানব যতই বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হয়, ততই উত্তরোত্তর নানা কারণে তাহার শিক্ষার অন্তরায় উপস্থিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ বালক একদিনে যাহা শিখিতে পারে, যুবক তিন দিনে তাহা কষ্টের সহিত শিক্ষা করে। ঐরূপ যুবক যাহা তিন দিনে শিক্ষা করে, প্রৌঢ় তাহা নয় দিনে পারে, এবং বৃদ্ধ হয়ত তাহা একমাসের অধিক সময়েও পারে কি না, সন্দেহের বিষয়।

অতএব বালকবালিকাগণকে বাল্য-কাল হইতেই শিক্ষা দান করিবার সদ্ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। এই স্থলে আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মানব সম্ভবতঃই এমন শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে, সে জন্ম হইতেই সেই শক্তিদ্বারা কোন না কোনরূপ শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকিতে পারে না। আর এক কথা এই যে, মানব জন্মাবধি অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয় এবং সেই অনু-করণশক্তির প্রভাবেই অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। অতএব সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বালকবালিকাগণ অক্ষর পরিচয়ের পূর্ব্বেই অলক্ষিতভাবে অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং যে দিন হইতে সন্তান সন্ততি ক, খ, পাঠ আরম্ভ করে, কেবল সেই দিন হইতেই যে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হয়

এবং সেই দিন হইতেই যে তাহাদিগের প্রতি পিতামাতাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এমন নহে। পরন্তু মাতৃস্তন্যপান আরম্ভ করিবার দিন হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগের শিক্ষার সুযোগ ও সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। বালকবালিকাগণ শিক্ষা আরম্ভ করিবার দিন পর্য্যন্ত এবং যে সকল বালিকা লেখা পড়া করে না তাহারা কার্য্যাদি আরম্ভ করিবার দিন পর্য্যন্ত, সঙ্গ, সুযোগ ও বাহ্যদৃশ্যের প্রভাবে অলক্ষিতভাবে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, শিক্ষারম্ভকালে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বালক-বালিকাগণ ঐ সময়ে যেরূপ গুণের পরিচয় দিয়া থাকে, সেই গুণ লইয়াই যে তাহারা জন্ম গ্রহণ করে এরূপ ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস যেন কাহারও মনে স্থান না পায়। তাহারা স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আংশিক গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেও, উল্লিখিত ক, খ পাঠ করিবার বা গৃহলক্ষী হইবার দিন পর্য্যন্ত সঙ্গ, সুযোগ ও বাহ্যদৃশ্যের প্রভাবে অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে। এতদ্দ্বারা পরবর্ত্তী জীবনের শিক্ষার সম্বন্ধে অনেক অন্তরায় অথবা সুযোগ উপস্থিত হয়। তবে ইহা স্থির যে, তাহারা সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যে শিক্ষালাভ করে, তাহার স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং সেই শিক্ষার জন্য কোনরূপ ভয় বা আশার অধিক সম্ভাবনা নাই। ক, খ পাঠ করিবার বা গৃহলক্ষী হইবার দিন পর্য্যন্ত যে শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষার অঙ্কুরমাত্র। ইচ্ছা করিলে সেই অঙ্কুর উৎপাটন করিয়া তাহার স্থানে ইচ্ছামত সুশিক্ষার বীজ উপ্ত হইতে পারে।

মনুষ্য ছাত্রজীবনে বহু শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে। জনক ও জননীর মুখ-মণ্ডলের ও চাল চলনের হাব ভাব দেখিতে দেখিতে স্বভাবতঃ অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। শুধু জনক জননী কেন, শিশু যাহা দ্বারা লালিত ও পালিত হয় ও যাহার সঙ্গ লাভ করে তাহারই কিছু না কিছু গুণ প্রাপ্ত হয়। বাল্যকাল হইতে শিশুর হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে সেই সকল ক্রিয়া-কলাপের ও হাব ভাবের শক্তি সঞ্চারিত হইয়া অনেক সময় সেই সকল লোকের সৎ বা অসৎ গুণের সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং শিশুর এই প্রথম শিক্ষার কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করাই বিধেয়। চরিত্রহীনা দাসী বা উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্যের সাহায্যে সন্তানগণের লালনপালন কার্য্য যত কম হয়, ততই মঙ্গল। বলা বাহুল্য যে দুর্লভ চরিত্রবল বা মানসিক তেজ মনুষ্যজীবনকে শান্তিময় করিবার একমাত্র উপাদান। কিন্তু উহা দাসদাসীদিগের ন্যায় নিম্নশ্রেণীস্থ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং শিশুসন্তানদিগকে এই সকল লোকের সংশ্রবে রাখিয়া চরিত্রবল হারাইবার সুযোগ দেওয়া কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল লোকের করাল কবল হইতে সন্তান-

দিগকে দূরে রাখিতে পারিলেও আজ কাল চরিত্রহীনতার দায় হইতে সন্তান-দিগকে রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। পিতা মাতা প্রকৃত প্রস্তাবে বালকবালিকাদিগের শিক্ষাগুরু; কিন্তু তাঁহারাই অনেক স্থলে তাহাদিগের কুশিক্ষার কারণ হন। আত্মার শান্তি বিধান ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবার উপায় ভুলিয়া যাইয়া তাঁহারা কেবল আপাততঃ মধুর সুখের জন্য লালায়িত এবং সন্তান-দিগকেও ঐরূপ শিক্ষা প্রদান করিতে বিব্রত। পিতা জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী হইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া, বিলাস-সহচরী করিবার জন্যই ব্যাকুল। এইরূপ ভাবাপন্ন পিতা মাতা কি কখন সংশিক্ষা দিবার যোগ্য পাত্র হইতে পারেন? কখনই নহে।

ভোগী ও বিলাসী পিতামাতা যে স্ব স্ব সন্তানকে ভালবাসেন না অথবা তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে কোনরূপ কুশিক্ষা প্রদান করেন, তাহা নহে। পরন্তু তাঁহারা সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়া থাকেন ইহাই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাঁহারা শিক্ষাদাতা, তাঁহারা যদি আদৌ শিক্ষকপদের যোগ্য না হন, তবে তাঁহাদিগের দ্বারা সন্তান-সন্ততির অপকার ভিন্ন কোনরূপ উপকার হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজসেবক বানর যেমন অজ্ঞাতসারে রাজহন্তা হইয়াছিল, বিলাসপরায়ণ জনকজননীও তদ্রূপ অজ্ঞাতসারে আদর্শ চরিত্রের অভাবে সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ-জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে, বিলাসপ্রদীপ্ত সভ্যতার আলোকে এখন সেকালের কুসংস্কাররূপ অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা যেরূপ আচরণ করেন, তদ্দর্শনে লজ্জিত না হইয়া থাকা যায় না। দুঃখের বিষয় যে, সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে যে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতে হয়, তাহা অনেক অভিভাবকই জানেন না।

বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক পিতামাতাই সন্তানের সুখের জন্য স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে তাহা জানেন না এবং জানেন না বলিয়াই তাঁহারা সন্তানদিগের মহা অনর্থের কারণ হন।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীলোকের নির্দ্দোষ আমোদ

আমরা আমোদের প্রকারভেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। 'দৈহিক' বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, অন্য শক্তি অপেক্ষা শারীরিক শক্তি অধিকতররূপে

নিয়োগ করিয়া যে আমোদ উপভোগ করা যায়, তাহাই। 'আধ্যাত্মিক' বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, অন্তরিন্দ্রিয়ের সমধিক প্রয়োগজনিত যে আনন্দ লাভ করা যায়, তাহাই। যে যে শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহারই সমধিক স্ফূর্ত্তি জন্মে। তবে দৈহিক আমোদ হইতে আত্মা বঞ্চিত হয় না, এবং আধ্যাত্মিক আমোদ হইতেও দেহ একবারে বঞ্চিত থাকে না। কারণ মানবদেহবিশিষ্ট আত্মা, এবং আত্মাবিশিষ্ট দেহ। সকল আনন্দেরই ভোক্তা আত্মা। আত্মা ব্যতীত আর কে আনন্দ-রসাস্বাদন করে? ব্যায়াম কর, আত্মা স্নায়ুশক্তিস্ফুরণের সুখ অনুভব করিবে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর, মন পুলকিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইবে এবং আত্মাও আনন্দ অনুভব করিবে।

দৈহিক আমোদ।

১। সঙ্গীত—শাস্ত্রকারগণ বলেন, সঙ্গীত হইতে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা আর নাই। এই জন্য প্রথমে ইহারই আলোচনা করিব। আমাদের দেশে নারীগণের মধ্যে নৃত্য গীতাদি প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার বিষয় বিশুদ্ধ নহে, তাহার অনুশীলনও বৈজ্ঞানিক বা শাস্ত্রানুযায়ী নহে। বিষয়ের অপকৃষ্টতা হেতুই গুরুজনের সম্মুখে সঙ্গীত করা আমাদের পক্ষে লজ্জাকর, সুতরাং নিষিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষকাভাবে ইহা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। আমাদের দেশে 'সঙ্গীত-ব্যবসায়ী' বলিলেই মাদকদ্রব্য-সেবী কলাবৎ, বা মূর্ত্তিমতী অশ্লীলতাস্বরূপিণী বারবনিতা বুঝায়। সঙ্গীতপ্রভাবে কত দুর্নীতিপরায়ণ লোকের প্রাণ দ্রবীভূত হইয়াছে। সঙ্গীত প্রাণকে উন্মুক্ত ও ভগবানের দিকে উন্মুখ করে, পশুর পশুত্ব অন্ততঃ ক্ষণকালেরও জন্য দূর করে। অতি পাষণ্ডও প্রাণস্পর্শী স্বরমাধুর্য্যে আর্দ্র ও বিমুগ্ধ হয়। সঙ্গীতের গুণে বেদিয়াগণ ভুজঙ্গকেও বশীভূত করে। ইহার গুণে গুলেস্তাঁর কুসুম কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হয়। ইহার গুণে অর্ফিউস্ সমুদ্রের বীচিমালা ও নদনদীর গতি রোধ করিতেন। ইহার গুণে চৈতন্যদেব কত জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সহিত ইহার নিগূঢ় সম্বন্ধ। পুরাকালে ঋষিগণের নির্জ্জন আশ্রমেও সামগানের গুণে বশীভূত হইয়া মৃগশিশুরা নীরবে চকিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিত। য়িহুদী দেশেও ইসায়া, জেরিমায়া প্রভৃতি মহাত্মাগণ সঙ্গীতের গুণে নরনারীগণের প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন। আজও কত শত কৌপিন-পরিহিত বাউল বঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে গদগদলোচনে প্রেমময়ের অমৃতময় নাম গান করিতেছে। এরূপ মহৎ বস্তুর অপব্যবহার কতই দুঃখকর, কতই অনিষ্টকর। নারীগণ প্রকৃতি-যন্ত্রের সঙ্গীত। সঙ্গীতেই তাঁহাদের সমধিক অধিকার। পবিত্রা রমণীর সুমধুর কণ্ঠে গীত বিশুদ্ধ সঙ্গীত কেমন মনোহর। সর্ব্বদেশীয় রমণীগণেরই ইহা প্রাকৃতিক সম্পত্তি। পাশ্চাত্য রমণীগণ নানা যন্ত্র সহকারে

তাহাদের কণ্ঠমাধুর্য্য প্রকাশ করিয়া সংসারের কটুতা বিনষ্ট করেন। দীন ও অসভ্য পার্ব্বতীয় রমণীগণ কক্ষে ও বক্ষে সন্তান এবং মস্তকে বোঝা লইয়া, সপ্তমে সুর চড়াইয়া আত্মবিহ্বল হইয়া পাহাড়ী রাগিণী আলাপ করিতে করিতে পাহাড়ের গাত্রে আরোহণ করে। তাহাদের সঙ্গীতে গিরিশৃঙ্গও যেন আকুল হয়, নির্ঝরিণীও যেন তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য দ্বিগুণ কল্লোলে বহমনা হয়। শ্রমজীবিনী বাউড়িনী প্রভৃতি নারীগণ সঙ্গীতের সুশীতল ছায়ায় শ্রমজনিত স্বেদ দূর করে। বঙ্গদেশে ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে যেরূপ প্রথাই প্রচলিত থাকুক, পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুস্থানী রমণীগণ সর্ব্বদাই গান করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনে "ব্রজ-মহিলাগণের" প্রধান আমোদ গীত। সে প্রদেশে শ্বশুরালয় যাইবার পূর্ব্বে জননী-গণ দুহিতাদিগকে গীত শিক্ষা দেন।

পবিত্র গান করিতে হইলেই যে কেবল "শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ" গাহিতে হইবে,তাহার অর্থ নাই। প্রাকৃতিক শোভা বর্ণন, এবং মানবের হৃদয় ও জীবনের নানা অবস্থার বর্ণনায় পূর্ণ আনন্দজনক নানা প্রকার সঙ্গীত আছে। মনের অবস্থাভেদে, কখনও বা বিরলে বসিয়া, কখনও বা আত্মীয়াগণের সহিত, কখনও বা বাদ্যযন্ত্রের সহিত, আবার কখনও বা নৃত্যের সহিত, নানারূপে উহা উপভোগ্য করা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, চতুরঙ্গ, টপ্পা, গজল্, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা প্রকার কণ্ঠ-সঙ্গীত আছে। নৃত্য একপ্রকার ব্যায়াম হইলেও সঙ্গীতপ্রসঙ্গে নৃত্য গীতের অনু-গমন করে। অবশ্য ইহার নাম শুনিলেই অনেকেই সিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু ইহার প্রকৃতিগত কোন দোষ নাই। প্রেম ও ভক্তির আবেশে কাহার না নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়? আনন্দের উচ্ছ্বাসে কাহার না দেহ আত্মার সহিত নৃত্য করিয়া উঠে? স্বাস্থ্যের দিকে দেখিতে গেলে সঙ্গীত যেমন ফুস্ফুসের পক্ষে হিতকারী, নৃত্য তেমনি সমুদায় দেহের পক্ষে মঙ্গল-কর। নৃত্য বলিলেই যেন কেহ পেশাদার নর্ত্তকীগণের কুরুচিপূর্ণ হাবভাবময় অঙ্গ-ভঙ্গি মনে না করেন।

কণ্ঠসঙ্গীত যেমন মনোহর, যন্ত্র-সঙ্গীতও তদ্রূপ চিত্তহারী। বীণা, সেতার, বেহালা, এস্‌রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ও পিয়ানো, হারমোনিয়মাদি বিদেশীয় নানা প্রকার যন্ত্র আছে। বাহিরের শিক্ষক না পাইলেও, পিতা. ভ্রাতা বা স্বামীর সাহায্যে, আমরা উহা শিক্ষা করিতে পারি। সঙ্গীতের "কান্" থাকিলে উহা শিক্ষা করা সহজ, অন্ততঃ উহাতে আমোদপ্রদ পারদর্শিতা লাভ করা যায়।

অবকাশকালে যে স্থলে রমণীগণের কণ্ঠ-তন্ত্রীর মধুর কম্পনের সহিত নানা সুমধুর যন্ত্রের সঙ্গত সহকারে পবিত্র ভাবে নৃত্যগীতাদি হয়, সে স্থানে গমন করিলে বোধ হয় যেন স্বয়ং প্রকৃতি দেবী নন্দন-কাননে, অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া, রসোল্লাস করিতেছেন।

সঙ্গীতাদি নিজরচিত হইলে অধিকতর চিত্ত-বিনোদন করে। হৃদয়ের যখন যে তখন সেই প্রকার ভাবযুক্ত গীত না হইলে উপযুক্তও হয় না, প্রীতিকরও হয় না। সঙ্গীতাদি লইয়া আমোদ করিতে হইলে যে কলাবৎ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা নহে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও সুমিষ্ট রসাল ফল উত্তমরূপে ভোগ করিতে পারা যায়। কিন্তু রসবোধ থাকা চাই।

সঙ্গীত যাহার চিত্তকে দ্রব করিতে না পারে, সে ব্যক্তি নরাধম। বেদিয়াদিগের তুবড়ির ধ্বনিতে বিষধরও স্তব্ধ ও মোহিত হয়, বংশীর রব শুনিলে মধ্যাহ্নকালে ছায়াতলে শায়িতা হরিণীযূথও চকিত হইয়া সেই অমিয়সম শব্দকে লক্ষ্য করিয়া শ্রবণযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয় এবং পরস্পরের দিকে, এবং বাদকের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় এবং বিজ্ঞানসঙ্গত অনুশীলন করিলে উহা সমধিক চিত্তহারী হয়। রীতিমত শিক্ষিত কণ্ঠ অক্ষরে অক্ষরে অমৃত বর্ষণ করে।

প্রকৃতি স্বয়ং নারীগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন। তবে কেন তাঁহারা নীরব থাকিবেন? ঈশ্বর যেরূপ নারীর হৃদয়,সেইরূপ তাহার সুকণ্ঠকেও ভালবাসেন। সেই জন্যই প্রাচীন হিন্দুগণের প্রতিভা নারীকেই বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্থির করিয়াছিল। স্বরবতী সরস্বতীর সংমোহনে জগৎ মোহিত

প্রার্থনা

আপনারে ভুলে যবে তোমাপানে চাই,
তখনি তোমার দেব দরশন পাই।
যবে নিজ সুখ দুঃখ যাই পাশরিয়া,
তবেত তোমাতে যুক্ত হয় মোর হিয়া।
যবে অন্য ভাবরাশি চলে যায় দূর,
শুধু প্রেম আলো করে হৃদি অন্তঃপুর,
তখনি তোমারে পাই, অনাথশরণ!
তোমারে না পাই যদি তবে এ জীবন
হবে শুষ্ক মরু সম, কি রহিবে আর
তোমা বিনা? তুমি প্রভু সর্ব্বস্ব আমার।
পিতা মাতা প্রভুরূপে দাও দরশন,
দীন আমি তবু পূজা করগো গ্রহণ।
যাহারে ঘৃণায় সবে দূরে যায় ফেলে,
তাহারে স্নেহের ক্রোড়ে লও তুমি তুলে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ভৈরবী।

(১)

হিন্দুর পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে দশাশ্ব মেধের ঘাটে প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

নিম্নে পুণ্যময়ী ভাগীরথী ছলছল কলকল করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, উপরে তরুণ তপনের রক্তিম আলোক আকাশ ও তরুপল্লব রঞ্জিত করিয়া তাঁহার সেই প্রফুল্ল মুখপদ্মের ছটা সুন্দরতর করিতেছিল, আমি অবাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম।

সত্য কথা বলিব—অনেক সুন্দরও দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরীও দেখিয়াছি, কিন্তু মানুষ যে এ রকম সুন্দর হইতে পারে, ইহা তো মনে করি নাই! সেই গৈরিকবসনাবৃতা, আলুলায়িতরুক্ষকেশী, রুদ্রাক্ষভূষণা, ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীকে বিশ্ববিধাতা যেরূপ সুন্দর উপাদানে গড়িয়াছেন, সেরূপ ত আর কোথাও দেখিতে পাই নাই! স্বর্গের পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া মরদেশে বিরাজ করিতেছেন! তিনি যে দিকে চাহিতেছেন, সেই দিকই যেন স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে! বিস্মিতনেত্রে আমি তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

সেই জনতা ভেদ করিয়া যখন ভৈরবীর নীলোৎপলসদৃশ চক্ষুর স্নিগ্ধদৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়িল, তখন কি জানি কেন, আমি মনে মনে কৃতার্থ হইলাম। যদি পুরুষ হইতাম, তবে হয়ত এ কথা লিখিতে সাহস করিতাম না, কিন্তু যখন আমরা দুজনেই রমণী, তখন আর লিখিবার বাধা কি?

আশ্চর্য্য এই যে, আমাকে দেখিয়া তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন। আমি বেশ বুঝিলাম যে, তাঁহার আগ্রহ-আকুল দৃষ্টি, আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, আমারই মুখের উপর বারংবার পড়িতেছে।

আমি তো একেবারে অবাক্! আমি যত দূর নিজেকে জানি, তাহাতে এ নগন্য—সর্ব্বপ্রকারে অধম প্রাণীর এরূপ সৌভাগ্যলাভের কোনও কারণ বুঝিলাম না। তখন "বিধিলিপি" মনে করিয়া, ধীরে ধীরে সেই জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। সেই তরুণবয়স্কা সন্ন্যাসিনীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার পদতলে প্রণাম করিলাম।

ভৈরবীর মুখে নৈরাশ্যের ছায়া দৃষ্ট হইল। তিনি বলিলেন "ওঃ—তুমি সে নও? আমি কি মনে করিতেছিলাম!

আমি সাহস পাইলাম; বলিলাম "বোধ হয় আপনার কোন পরিচিতার সহিত আমার আকৃতির সাদৃশ্য আছে"।

"পরিচিতা নহে—তিনি আমার পূর্ব্বজীবনের আত্মীয়া; এত সাদৃশ্য যে, বিশেষ লক্ষ্য না করিলে আপনি যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এ কথা বোঝা যায় না।"

আমি বড়ই আনন্দিতা হইলাম।

তিনি আমার মাথার উপরে হাত রাখিয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। তার পরে বলিলেন "আপনি আগামী কল্য এমনি সময়ে একবার আসিবেন কি?—যদি সম্ভব হয়, আপনাকে আমার আশ্রম দেখাইব।"

"অবশ্য আসিব"। তাঁহার মত দেবীর

কাছে সঙ্কোচই বা কি, সন্দেহই বা কিসের। এ আমন্ত্রণ আমার হৃদয়ের আমন্ত্রণ।

সম্মতা হইয়া সে দিন বিদায় হইলাম।

(২)

দুই চারি দিন ভৈরবীর সহিত তাঁহার আশ্রমে গেলাম। তিনি কত ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মের কথা, পাপ পুণ্যের কথা, নারী-জীবনের কর্ত্তব্যের কথা, কতই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে আমার প্রাণে বড়ই আরাম বোধ হইতে লাগিল।

এক দিন তিনি আমাকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার পরিচয়ে বড় কিছু "বিশেষত্ব" ছিল না। আমি একজন বঙ্গবাসিনী, আত্মীয়দিগের সহিত পুণ্যতীর্থ বারাণসী ধামে আসিয়াছি; কিছু দিন পরে আবার বঙ্গজননীর "শস্য-শ্যামল, মলয়জশীতল" কোলে ফিরিয়া যাইব। এই "বিশেষ ঘটনা"-বিহীন, নগণ্য, সহজ জীবনের পরিচয় তাঁহার নিকটে আনুপূর্ব্বিক দিলাম। তিনি আনন্দের সহিত সমস্ত শুনিলেন।

তার পরে আমার জিজ্ঞাসা করিবার পালা। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া যখন আমি ভৈরবীকে তাঁহার কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তাঁহার মুখ গোলাপফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে খুব কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "দেখ বোন! আমার এ হতভাগ্য জীবনের কাহিনী লোকের কাছে বলিবার নহে। কিন্তু বলিতে কি, তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার উপরে আমার এত ভালবাসা জন্মিয়াছে যে, আমার সেই লুক্কায়িত, অব্যক্ত গত জীবনের ব্যথারাশি তোমাকে জানাইতে আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে।"

ভৈরবী যে সত্য সত্যই আমাকে পরম বন্ধুর মত ভাল বাসেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তথাপি আজি তাঁহার নিজের মুখে এ কথা শুনিয়া আমার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিল। আমি নীরব, নিঃস্পন্দ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম।

ভৈরবী বলিতে লাগিলেন—

"আমি বাঙ্গালি, আমার জন্মের পূর্ব্বে আমার বাবা কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। যখন তাঁহার অনেক প্রতিপত্তি, অনেক পসার এবং যখন তিনি অনেক টাকা অর্জ্জন করিতেছিলেন, তখনই এ অভাগিনীর জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং আমার আদরযত্ন যার পর নাই হইয়াছিল।

কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? আমার বয়স চারি বৎসর হইলে, আমার স্নেহময়ী মা আমাকে ছাড়িয়া ও তাঁহার সোণার সংসার আঁধার করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গেলেন।

মার জন্য বাবা বড়ই শোকাকুল হইলেন; মায়ের চুল কাটিয়া নিজের বাক্সে রাখিলেন; নিজের শয়নঘরে মায়ের একখানি তৈলচিত্র করাইয়া রাখিলেন; আমাকে বুকে করিয়া "মানুষ" করিতে লাগিলেন। সাত বৎসর এইরূপে কাটিল।

সাত বৎসর পরে, আত্মীয়বন্ধুদিগের উপরোধ অনুরোধে, নিজের মনের চঞ্চলতায় বাবা আবার বিবাহ করিলেন। সেজন্য বাবাকে নিন্দা করি না। তিনি তবু সাত বৎসর আমার মায়ের স্মৃতি লইয়া দিন যাপন করিয়াছিলেন। অনেক পুরুষ, মৃত পত্নী উঠানে থাকিতে থাকিতেই দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রসঙ্গ করিতে সঙ্কুচিত হয় না!

যিনি আমার বিমাতা হইয়া আসিলেন, তিনি আমার অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের অধিক বড় ছিলেন। তিনি অতি মৃদু-স্বভাবা, অতি লজ্জাশীলা। তিনি কখনও বাবার উপরে স্বামিত্বের দাবী করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে দাসীর মত বাবার আজ্ঞা পালন করিতেন, এবং আমাকেও "প্রভুকন্যা" র মত সম্ভ্রম করিতেন। আমি তাঁহাকে ক্রমশঃ খুব ভাল বাসিলাম।

তোমাকে প্রথমে দেখিয়াই আমি যে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহার কারণ তোমার আকৃতির সহিত আমার বিমাতার সৌসাদৃশ্য। আমি সেই কথার আভাস, সেই দিনই তোমাকে দিয়াছিলাম।

যাহাহউক, বাবা আমাকে চিরদিনই যার পর নাই স্নেহ করিতেন। বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? সেই পিতৃস্নেহই আমার কাল হইল।

এই সময়ে ভৈরবীর কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হইল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আমি অবশিষ্ট কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার মুখ পানে চাহিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। বড় কাতরভাবে বলিলেন " ভগিনি! আজি আর পারি না —অন্য সময়ে বলিব "

কাজে কাজে আমি সেদিনকার মত বিদায় হইলাম। সমস্ত প্রাণটা ভৈরবীর কাছে রাখিয়া ক্ষুণ্নমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। (ক্রমশঃ)

প্রেমময়

যখনি তোমায় ছেড়ে চলে গেছি দূরে.
নির্ম্মম আঘাতে হৃদি দে'ছ ভেঙ্গে চুরে.
বিস্ময়ে, শঙ্কায়, শোকে ভরে গেছে প্রাণ.
ভেবেছি কঠোর একি তোমার বিধান!
পবিত্র আদেশবাক্য না শুনি' শ্রবণে
তোমার মঙ্গলঘট দলেছি চরণে।
করি কত জঘন্য পাপের অনুষ্ঠান,
ফিরেছি বিপুল বিশ্বে লয়ে জীর্ণ প্রাণ।
কাতরে ভেবেছি তুমি কত না কঠোর,
বুঝি ক্ষমিবে না নাথ, অপরাধ মোর।
কিন্তু প্রভো, আজ একি, তবু হাসিমুখে
পতিত অভাগা পুত্রে তুলে নিলে বুকে।
বুঝালে দুর্লভ প্রেম সান্ত্বনা সোহাগে,
ন্যায়ের মাঝারে তব প্রেম আছে জেগে।

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্ত্রীলোকের কাজ

বাহিরের দাতব্য।

স্ত্রীজাতি যখন দাতব্যকার্য্যের মর্ম্ম প্রকৃত রূপে বুঝিয়া উহা করিতে উৎসুক হন, তখন তাঁহারা প্রথমে নিজ নিজ পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই পরোপকারের চেষ্টা করেন, পরে গৃহের বাহিরে সৎকার্য্যের সুবিধা অন্বেষণ করেন। সকলেই সচরাচর এইরূপ পথ ধরিয়া চলিয়া থাকেন। কোন নরনারীকে দরিদ্র কিম্বা দুঃখীর ক্লেশ নিবারণ করিতে দেখিলে তাঁহার আত্মীয়েরা আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। নিঃস্বার্থ পরোপকার সকল দেশে ও সকল কালেই পূজিত হইয়া আসিয়াছে। কি নারী, কি পুরুষ সর্ব্বত্রই পরহিতাকাঙ্ক্ষী অনাথবন্ধু সহৃদয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।

যে সকল রমণী জগতে সাধু কার্য্য সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সৎকর্ম্মের সংখ্যা বা বর্ণনা করা অসাধ্য। আমাদের হিন্দু নারীদের মধ্যে রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, রাণী শরৎসুন্দরী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতি বিখ্যাত মহিলাগণ যে তাঁহাদের অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা জ্ঞান বুদ্ধি, দয়া ও দানশীলতা জন্য অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা কে না জানে? তাঁহাদের যত্ন ও সাহায্যদ্বারা কত দীন দরিদ্র আশ্রয় পাইয়াছে, কত নিরন্নের অন্ন জুটিয়াছে, কত দুঃখীর কষ্ট ঘুচিয়াছে, তাহা কে গণিয়া শেষ করিতে পারে? শুধু টাকা মানুষকে মহৎ করিতে পারে না। আমরা অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেই জগতে ধন্য হইবার আশা করিতে পারি।

ইংরাজ মহিলাদিগের যত্নে ইংলণ্ডীয় সাধারণ লোকের অবস্থা যে কত উন্নত হইতেছে তাহার সীমা নাই। যত প্রকার অনাথ, আতুর, পাপী, পীড়িত, অলস, অক্ষম লোকদের সাহায্যের জন্য ইংরাজ নারীগণের পরোপকারের শক্তি সদাসর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। তাঁহাদের যত্ন ও পরিশ্রমে কত শত দুর্ভাগা দরিদ্র ইংরাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল হইয়াছে।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু নারীদিগের মহারাণী স্বর্ণময়ী বা রাণী রাসমণির ন্যায় অর্থের প্রচুরতা বা সচ্ছলতা নাই। ইংরাজ রমণীদিগের মত প্রশস্ত বাধাশূন্য দাতব্য কাজের পথও আমাদের সম্মুখে খোলা নাই, ইহা সত্য। কিন্তু অর্থের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রত্যেকের অধিকারে এক একটি আরও অধিকতর মূল্যবান্ বস্তু আছে —সেটি আমাদের হৃদয়। ঐ হৃদয়ের যত চালনা করা হইবে, উহা যত পরের জন্য

ব্যপিত হইবে, ততই উহা প্রশস্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং মানবহৃদয়ের ন্যায় এমন অমূল্য রত্নের কাছে, ভালবাসার মত এমন অনশ্বর দানের কাছে ধনের দাতব্য কোন্ ছার ?

তার পর প্রকৃত দয়া ও দানের জন্য স্বাধীনতা অপেক্ষা আমাদের মনোগত বাসনারই অধিক আবশ্যক। প্রতিবাসীদের দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছা থাকিলে আমাদের ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়াইবার আবশ্যক নাই। আমাদের বাড়ীর চারি পার্শ্বেই কত ছেলে পুস্তকের জন্য স্কুলে যাইতে পারে না, কত বালিকা বস্ত্রের অভাবে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে না, কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা রোগে শোকে ক্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করিতেছে, কত না প্রাণের ধন হারাইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে—তাহাদের যার যা প্রয়োজন দাও। দরিদ্র ছেলেদের জন্য পুস্তক পাঠাও, মেয়েদিগকে কাপড় দাও, বৃদ্ধকে খাবার দাও, শোকার্ত্ত মাতাকে ডাকিয়া নিজের কাছে বসাইয়া সান্ত্বনা দাও, তাহা হইলেই তোমার প্রকৃত দাতব্য কার্য্য করা হইবে। উহাতে টাকা পয়সা অধিক লাগে না, অথচ অনেক ছেলে মেয়ের চোখের জল মুছাইলে, অনাথের দুঃখ মোচন করিলে, শোকদগ্ধ মায়ের প্রাণের যন্ত্রণার উপশম করিলে, যে স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ পাইবে, হাজার টাকা খরচেও সে আন্তরিক দিব্য আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে না।

অন্নবস্ত্রাদি দানের দ্বারা আমাদের দাস দাসী ও প্রতিবাসীদের অভাব দূর করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর দাতব্য আমাদের আয়ত্তে আছে—সেটি বিদ্যা ও জ্ঞান। এখন সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে খুঁজিলে আমার বোধ হয়, সাধারণ নারীদের মধ্যে অন্নবস্ত্র অপেক্ষা জ্ঞানের অভাবই অধিকতর দুঃখজনক। আমি সচরাচর এমন অনেক প্রবীণা ও যুবতী দেখিয়াছি, যাঁহারা বাল্যকালে লেখা পড়া শিখেন নাই বলিয়া কত আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আর এখন তাঁহারা যদি উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পান, তাহা হইলে বর্ণপরিচয় পড়িতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী তাঁহাদের জীবনে ঘটে না, কাজেই সমস্ত জীবন দুঃখ করিয়া কাটিয়া যায়। এরূপ স্থলে—যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বাল্যকালে উত্তমরূপে শিক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহারা যদি অপেক্ষাকৃত দুর্ভাগিনী ভগিনী-দের শিক্ষার ভার লন, তাহা হইলে আমা-দের দেশের নারীসমাজে বিদ্যা ও জ্ঞান বিস্তার করিতে কত দিন লাগে ?

ঐ শিক্ষাকার্য্যে যে অধিক পাণ্ডিত্য বা সময়ের আবশ্যক, তাহাও নহে; যিনি বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতিবাসিনী ছাত্রীদিগকে 'কথামালা' পর্য্যন্ত শিখাইতে পারেন। এইরূপে যাঁর যেরূপ সাধ্য, তিনি তদনুরূপ নিজ নিজ বিদ্যার কিয়দংশ অপরকে দান করিলে জগতের অনেক উপকার করা হয়। আর আমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে হাজার ব্যতিব্যস্ত থাকি না, প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা

বৃথা গল্প করিয়া বা নিদ্রায় না কাটাইয়া প্রতিবাসিনী নারীদিগের বিদ্যা শিক্ষার সাহায্য করিলে ইহকাল পরকাল উভয়েরই মঙ্গল। যে সকল স্ত্রীলোক শিক্ষাদানে উৎসুক, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমি নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম।

কয়েক বৎসর হইল প্রতিবেশিনী দুই একটি বিবাহিতা বালিকা লেখাপড়া ও পশমের কাজ শিখিতে আমার নিকট আসিত। বেলা ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত আমার শিক্ষা দিবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সময়ে আমি তাহাদের পড়া লইতাম, নূতন পাঠ দিতাম ও সেলাই দেখাইয়া বা ভুল শুধরাইয়া দিতাম। প্রত্যহ স্কুলের মত তাহাদিগকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট পাঠ ও শিল্পের কাজ দিতাম। তাহারা যতক্ষণ না উহা উত্তমরূপে শেষ করিত, ততক্ষণ নূতন পাঠ বা সেলাইএর কাজ পাইত না। এইরূপে তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তদ্ব্যতীত আমি প্রতি মাসে একবার তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম; পরীক্ষায় যে বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত, সে একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুরস্কার পাইত। এইরূপে এক বৎসরে যাহা শিক্ষা করা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ তাহা তাহারা চারি মাসে শিখিতে পারিয়াছিল। এখন তাহারা বড় বড় ছেলে মেয়ের মা হইয়া নিজ নিজ সংসারে ব্যস্ত আছে, সন্দেহ নাই। তথাপি আমি কখন কখন শুনিতে পাই, তাহারা নিজে যেরূপে লেখা পড়া শিখিয়াছিল, সেইরূপে অন্যকে শিখাইতে যত্ন করে।

মিসেস্ ডি, এন্, দাস।

ভারতবর্ষ চিরকাল নারীজাতিকে সম্মান করিয়া আসিতেছে। স্ত্রীজাতি এ দেশে পূজার্হা দেবতাস্বরূপা। ভারতবর্ষের দেবতার মধ্যে স্ত্রী-দেবতা আছেন। গ্রীস প্রভৃতি দুই একটী প্রাচীন দেশ ভিন্ন অন্য কোনও দেশে স্ত্রী-দেবতা নাই। প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে ইলা, ভারতী, ইন্দ্রাণী, শচী, মহী প্রভৃতি অনেক দেবীদিগের নাম ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণেও অনেক দেবীর নাম আছে, তাহাদিগকে অদ্যাপি ভারতবাসীরা পূজা করিয়া থাকেন। বেদে সবিতা বা ব্রহ্মকে জ্ঞান স্বরূপ বলা হয়, কিন্তু পুরাণে সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং বীণাবতী অর্থাৎ সংগীত শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতা সকল যদিও কল্পনা মাত্র, তথাপি কেবল পুরুষ দেবতার কল্পনা না করিয়া স্ত্রী-দেবতা কল্পনা করা ভারতবর্ষের একটী বিশেষত্ব। পরমেশ্বরের করুণাগুণকে জননী নাম দিয়া নারীজাতিকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করা হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেই

পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, মাতা শব্দের উল্লেখ বেদ কিম্বা বাইবলে নাই। খ্রীষ্টমাতা মেরি নূতন ধর্ম্মবিধিতে উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছেন এবং রোমান কাথলিক সম্প্রদায় তাঁহাকে দেবতুল্য সম্মান করেন। তথাপি তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। নারী ঋগ্বেদের ঋষি মন্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের রচয়িত্রী অভৃণনামক ঋষির কন্যা। সেই সূক্তে পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্দেবী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন, এবং আপনাকে ব্রাহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ দেখিতেন। তিনি অষ্টমন্ত্রাত্মক একটী সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল ;—

"আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি ; আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করি।

আমি সমস্ত জগতের রাজ্ঞী ; আমি উপাসকদিগকে ধন দান করি ; আমি পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি ; আমি যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতারা আমাকে প্রপঞ্চজগতে অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করেন ; আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলের আশ্রয় হইয়া আছি।

যিনি অন্নভোজন করেন, যিনি প্রাণধারণ ও শ্বসন ক্রিয়া করেন, যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, তিনি আমার সাহায্যে তত্তৎ কর্ম্ম করেন। আমাকে যাহারা এই প্রকারে অন্তর্যামিরূপে জানে না, তাহারা এই সংসারে হীনতা প্রাপ্ত হয়। হে বিদ্বন্! আমার কথা শ্রবণ কর, আমি যাহা বলিতেছি শ্রদ্ধার যোগ্য।

দেবতা ও মনুষ্যগণ যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয়ে আমিই উপদেশ প্রদান করি। যাহাকে ইচ্ছা আমি বলবান্, স্তোতা, বুদ্ধিমান্, অথবা ঋষি করিতে পারি।

আমি পিতা, আমি আকাশকে সৃজন করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তক স্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে আমি সমস্ত ভুবনে বিস্তারিত হই। আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

আমি তাবৎ ভুবন নির্ম্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে।"

উপনিষদের সময়েও অনেক ব্রহ্মবাদিনী নারী বিদ্যমান ছিলেন। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় গার্গী এবং মৈত্রেয়ীর বিষয় পাঠিকাগণকে অবগত করিয়াছি, অদ্য গার্গীর ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিব। তৎকালে রাজ-

সভাতে ব্রহ্মবাদী পণ্ডিতদিগের ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী নারীগণও নিমন্ত্রিত হইতেন। জনকরাজা যে বহুদক্ষিণা নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞক্ষেত্রে কুরুপঞ্চাল-নিবাসী ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে গার্গীনাম্নী ব্রহ্মবাদিনী বিদুষীও বর্ত্তমান ছিলেন। জনকরাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণকে বলিলেন যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি সহস্র গো ও তৎশৃঙ্গসংলগ্ন সুবর্ণ দান স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন। সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে ঐ গো সকল গৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে অপরাপর পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গার্গীও এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য তাহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

গার্গী—অপ দ্বারা পৃথিবী ওতঃপ্রোত হইয়াছে, অপ্ কাহার দ্বারা ওতঃপ্রোত হইয়াছে?

যাজ্ঞবল্ক্য—বায়ু দ্বারা।

গার্গী—বায়ু কাহা দ্বারা ওতঃপ্রোতঃ রহিয়াছে?

যাজ্ঞবল্ক্য—অন্তরীক্ষ লোক দ্বারা।

গার্গী—অন্তরীক্ষ লোক কাহা দ্বারা ওতঃপ্রোতঃ?

যাজ্ঞবল্ক্য—গন্ধর্ব্বলোক দ্বারা।

গার্গী—গন্ধর্ব্বলোক কাহা দ্বারা ওতঃ-প্রোতঃ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আদিত্যলোক দ্বারা।

গার্গী—আদিত্যলোক কাহা কর্ত্তৃক ওতঃপ্রোত?

যাজ্ঞবল্ক্য—চন্দ্রলোক দ্বারা।

দুটি বন্ধু

(গল্প)

ফাল্গুন মাস। বসন্তের মলয় সমীরণ জগজ্জনকে প্রফুল্লিত করিয়া আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে। ধনীর প্রাসাদে দরিদ্রের কুটীরে, সমভাবে প্রবেশ করিয়া সমভাবে সকলের দেহ শীতল করিতেছে। তরুশাখায় বসিয়া কোকিল "কুহু" "কুহু" রবে গান করিতেছে। বসন্ত সমাগমে শুষ্ক বৃক্ষকুলও নবীন পল্লবে শোভিত হইয়া মনোহর হইয়াছে। প্রকৃতিরাণী বিশ্ববিমোহন রূপ ধারণ করিয়া মানবের নয়ন, মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

কিন্তু কলিকাতা মহানগরীতে এ মনোহারিত্ব কিছুই নাই। কলিকাতায় অন্যান্য ঋতুসমাগম বেশ ভাল রকম বুঝা যায়, কিন্তু এই ঋতুকুলের রাজা,

মধুর বসন্ত ঋতুর মাধুর্য্য এখানে কিছুই উপভোগ করা যায় না।

কলিকাতায় সেই একঘেয়ে ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ, ঘোড়ার গাড়ীর গড় গড় শব্দ, ফেরিওয়ালাদিগের বিকট চীৎকার প্রতিনিয়তই লাগিয়া আছে। ইহা ছাড়া নূতনত্ব আর কিছুই নাই।

কলিকাতাবাসিনী পাঠিকা ভগ্নিগণ! যদি আপনারা বসন্তের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে চাহেন, তবে আমাদের এই পল্লীগ্রামে আসুন! দেখিবেন, গাছে গাছে কেমন সুমধুর স্বরে নানাজাতীয় বিহঙ্গ গান করিতেছে, নগরপ্রান্ত বিধৌত করিয়া স্রোতস্বিনী কেমন মন্দ মন্দ বহিয়া যাইতেছে, বেলাভূমি চুম্বনপূর্ব্বক ঊর্ম্মিমালা নাচিয়া নাচিয়া কেমন সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে, বনে বনে বন্যকুসুম-রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া কেমন সৌরভ ছড়াইতেছে।

বসন্তের প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য সমীরণ মৃদু মন্দ বহিয়া, আপনার দেহ শীতল করিয়া দিবে। যে দিকে চাহিবেন, প্রকৃতির মনোহর শোভারাশি আপনার মন বিমোহিত করিয়া দিবে। বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল দর্শনে তাঁহার চরণে আপনার আরও প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিবে। আপনাদের মধ্যে যদি কেহ পল্লীগ্রামের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, স্বচক্ষে দেখিলে তাঁহার সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।

যাহা হউক, এই সুখময় ফাল্গুন মাসের প্রথম ভাগে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর একটী সুন্দর ও বৃহৎ বাটীর প্রবেশদ্বারের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া একটী যুবক "ভূপেন" "ভূপেন" "ভূপেন বাবু" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। ভিতর হইতে একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ উত্তর দিল "ক্যা বোল্‌তা হ্যায় বাবু?" যুবক উত্তর করিলেন "ভূপেন বাবুকো সেলাম দাও।" এই বলিয়া যুবক ভূপেন বাবুর প্রতীক্ষায় সদর রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। যুবকের বয়ঃক্রম অনুমান দ্বাবিংশতি বর্ষ হইবে। তাঁহার আয়ত চক্ষু, সুবঙ্কিম ও সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, ঈষৎ দীর্ঘ কলেবর, হস্ত পদাদিও তদুপযুক্ত। মোট কথা, পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবে যাহা যাহা থাকিলে 'সুপুরুষ' বলা যায়, তৎসমস্তই এই যুবকের ছিল। বর্ণ গৌর না হইলেও যুবক বেশ শ্রীমান্। তাঁহার বদনমণ্ডলে কি যেনএক স্বর্গীয় প্রতিভা মাখান, তাহা দেখিলে মনে আনন্দ ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। কিয়ৎক্ষণ ডাকাডাকির পরে উপরিউক্ত বাটীর দ্বিতলস্থ কক্ষের বারাণ্ডায় আসিয়া আর একটী যুবক সহাস্য বদনে কহিলেন "কে হে, সুরেশ নাকি? আরে এস, এস, রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেন?"

এই যুবকটীর বয়ঃক্রম পূর্ব্বোল্লিখিত যুবা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অনুমান হয়। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর! চক্ষুতে সোণার

চশমা, পরিচ্ছদাদিতে একটু বিলাসিতার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "না ভূপেন, এখন আর উপরে যাইব না, বসিবার সময় নাই, তুমি একবার নামিয়া আইস, একটু আবশ্যক আছে।"

"এমন কি বিশেষ আবশ্যক যে, একটুও বসিতে পারিবে না?" এই বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সুরেশচন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক আপন বিশ্রামকক্ষে আনিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "এই বার শুনি তোমার কি আবশ্যক।"

সুরেশ কহিলেন "দুইখানি পুস্তকের প্রয়োজন, তাই লইতে আসিয়াছি। তুমি জান ত' আমার সকল পুস্তক—"

ভূপেন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে তো বলি যে, যখন যে কোনও পুস্তকের আবশ্যক হইবে, আমার আলমারী হইতে লইয়া যাইবে, তা' আমি বাটীতে থাকি আর নাই থাকি। তুমি ভাই, অমন পরের মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিবে, 'কিন্তু' করিয়া কথা কহিবে, ইহাতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। কি কি পুস্তক আবশ্যক বাছিয়া লও।"

সুরেশচন্দ্র উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আলমারী হইতে আবশ্যকমত দুই খণ্ড পুস্তক বাছিয়া লইয়া পুনরায় নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "পরীক্ষার জন্য কিরূপ প্রস্তুত হইলে?"

সুরেশ। আমার চেষ্টার তো' কোনও ত্রুটি নাই, তবে আমার সময় নিতান্ত অল্প। জগদীশ্বর যা করেন, তিনিই আমার একমাত্র ভরসা। তোমার কি রকম হচ্ছে?

ভূপেন্দ্র। আমার অদৃষ্টে বোধ হয় এবার শূন্য পড়িবে। কিছুই পড়া হইতেছে না। লেক্‌চার শুনিতে যাই মাত্র।

ভূপেন্দ্রের কথা শুনিয়া সুরেশ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি! তোমার সময়ের অভাব নাই, তোমার পাঠের সুবিধার নিমিত্ত তোমার পিতা কত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তথাপি তোমার ভাল পড়া হইতেছে না? বার বার সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এইবার হইলেই তো শেষ।"

ভূপেন্দ্র। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তখন পড়িতে আগ্রহ ছিল, এখন আর পড়িতে মন লাগে না। কেবল বাবার আগ্রহেই আমি ল' পড়িতেছি, নচেৎ পড়িতাম না। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বে কি কোন কায সফল হয়?

সুরেশচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কবির সুরে কহিলেন,

"বল, বল, প্রিয়সখা কিসের কারণ
বল কার তরে তুমি বিমনা এমন?"

ভূপেন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিলেন "না ভাই,

কোন 'মোহিনী' 'টোহিনী'র জন্য নয়, আইন্ পাশ ক'রে 'শ্যামলা' মাথায় দিয়ে বার লাইব্রেরীতে সংসেজে ব'সে থাকায় ফল কি ? তাই ইচ্ছা হয় না।"

সুরেশচন্দ্র সহাস্যে কহিলেন "কেন, আইন পাশ ক'রে ক'নের বাপের ঘাড় ভেঙ্গে আয়রেন চেষ্ট্ বোঝাই করিবে, ফল নয় কি তা' ?"

ভূপেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ভাই, যদি বিশ্বাস কর, তবে বাস্তবিক একটা মনের কথা খুলে বলি"।

সুরেশ। তোমার কোন কথায় কি আমি কখনও অবিশ্বাস করিয়াছি ?

ভূপেন্দ্র। না, তাহা কর না, তা' জানি, এবং সেই জন্যই তোমাকে প্রাণের সব কথা খুলিয়া বলিয়া তৃপ্তি লাভ করি।

সুরেশ। তবে কি বল্‌বে বল্‌ছিলে বল।

ভূপেন্দ্র। ঐ প্রথাটা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

সুরেশ। কোন্ প্রথাটা ?

ভূপেন্দ্র। পুত্রের বিবাহে অর্থ লওয়া ইহা বড়ই গর্হিত। ইহা স্বেচ্ছাচারিতার রূপান্তর মাত্র। যে দিন দাদার বিবাহে বাবা ছয় হাজার টাকা লইলেন, আমার কিন্তু ইহাতে বড়ই ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সে দিন তোমার পিতার নিকট ঘটক আসিয়াছিল, তোমার দশ হাজার টাকা দর হইয়াছে। তাহা কি তুমি জান না ? ল'টা পাশ হইলেই বিবাহ হইবে।"

ভূপেন্দ্র কহিলেন—"আমার বিবাহে আমি বাবাকে এক পয়সাও লইতে দিব না।"

সুরেশচন্দ্র সহাস্যে উত্তর করিলেন "দেখা যাবে !"

ভূপেন্দ্রনাথ সগর্ব্বে সম্মুখস্থ শ্বেত প্রস্তরের টেবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন "দেখিও আমি যাহা বল্‌ছি তাহার অন্যথা হবে না।"

সুরেশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে আমি এ কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। জোর করিয়া মেয়ের বাপের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা বড়ই গর্হিত এবং ঘৃণিত কার্য্য বটে কিন্তু হায় ! সুধু তোমার আমার ইচ্ছায় কি হইবে ? সমগ্র দেশটা এইরূপে অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য লোলুপ হইয়া বেড়াইতেছে। ইহা বড়ই লজ্জার বিষয় যে, যিনি যত ধনবান ব্যক্তি, তিনি পুত্রের বিবাহের সময় তত ই ভিখারী হইয়া দাঁড়ান। "টাকা দাও," "সোণা দাও," "রূপা দাও," "খাট দাও," "বিছানা দাও" ইত্যাদি ইত্যাদি ভিক্ষা করেন। কি আশ্চর্য্য ! ইহাতে লজ্জা বোধ না করিয়া তাঁহারা ইহাতে গৌরব মনে করেন ! ভগবান্ জানেন, কত দিনে এ কুপ্রথা দেশ হইতে দূর হইবে।"

এই বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"এ কুপ্রথা আমাদের সমাজ

হইতে উঠিয়া না গেলে দেশের এবং সমাজের কখনই মঙ্গল হইবে না।

বিবাহ দিয়া শত শত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দরিদ্রতা রাক্ষসীর হাতে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতেছে। এই কারণে কত বালিকা, বৃদ্ধ বা অপাত্রে অর্পিত হইয়া জীবনের সুখ শান্তি হারাইয়া অহঃরহঃ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। আমাদের সমাজের মধ্যে এই কুপ্রথাটী যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। হায়! হায়! সকলেরই কন্যা আছে, সকলেই এই কন্যাদায়ে প্রপীড়িত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ বিষয়ে কাহারও প্রতি কাহারও সাহানুভূতি নাই। এ কুপ্রথা উঠাইবার জন্য কাহারও চেষ্টা নাই, উদ্যম নাই; বরং দিন দিন ইহার বৃদ্ধি হইতেছে।

স্ত্রীজাতি না হইলে সংসার একমুহূর্ত্তও চলে না। রমণীর স্নেহ, রমণীর প্রেম মানবের জীবনস্বরূপ! মাতা, ভগ্নী, পত্নী এই সকল লইয়া ত সংসার! যে গৃহে রমণী নাই, সে গৃহ গৃহই নহে, তাহা অরণ্যের মত, তথাপি এই স্ত্রীজাতি যেন শস্যসম্ভারের ন্যায় হইয়াছে। ইহাই সমাজের অধঃপতনের প্রশস্ত দ্বার।

বলিতে কি ভাই, এই কন্যাদায়গ্রস্ত শত শত পরিবারের মধ্যে আমরাও আছি। তবে আমাদের পূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর।" এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র মনের উচ্ছ্বাসে আপনাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সুরেশচন্দ্র কহিলেন "ভাই, পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, এই কন্যাদায়ের জন্যই আজি আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি যে কি প্রকারে কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছি, তাহা ত' তুমি জ্ঞাত আছ। দুই স্থানে গৃহশিক্ষকের কর্ম্ম করিয়া বহু কষ্টে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা পিতাকে কিছুই সাহায্য করিতে পারি না। আশা এই যে, শিক্ষালাভ করিয়া, উপার্জ্জনশীল হইয়া পিতামাতার দুঃখ দূর করিব। সেই আশার বশবর্ত্তী হইয়াই এত কষ্টে অধ্যয়ন করিতেছি। আজিকালিকার দিনে ত' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে না পারিলে বিশেষ উপার্জ্জনের আশা নাই!

সে কথা যাক। কন্যাদায়ের কথা বলিতেছিলাম, শোন! আমার চারিটী ভগ্নী, তন্মধ্যে তিনটীর বিবাহ হইয়াছে, একটী এখনও অবিবাহিতা আছে। আমাদের যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা তিন ভগ্নীর বিবাহ দিতে ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিতে হইয়াছে। মাতার যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহাও এই বিবাহদায়ে নিঃশেষ হইয়াছে। পিতা সামান্য বেতনে কর্ম্ম করেন, তদ্দ্বারা কন্যাগণের বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলন করা সহজসাধ্য নহে! বাগান এবং জমা জমীর আয়ে আমাদের পল্লীগ্রামে গৃহস্থের সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সে গুলি যখন গেল, তখন কেবল পিতার বেতনের টাকা কয়টী

আমাদের ভরসা হইল। তাহাতে আমাদের সংসারের খরচ এবং আমার পাঠের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না, তাহার উপর আবার ভগ্নীপতিগণের তত্ত্বের খরচ, ইহাও এখন সামাজিক নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, না হইলেই নয়! তাহাও আবার কোন মহাত্মা অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্ব্বাকভাবে গ্রহণ করেন, কোনও মহাত্মা বা কন্যার পিতৃকুলকে অজস্র গালাগালি দিয়া দ্রব্যাদি গৃহে তুলেন। আবার কোনও ত্রুটি দেখিতে পাইলে পুনশ্চ পুত্রের বিবাহ দিবেন বলিয়া ভয় দেখান, কিম্বা যথার্থই দিয়া বসেন। সমাজ এ বিষয়ে মুক্তহস্ত। যাঁহারা পুত্রের পিতা, মাতা, তাঁহারা অহঙ্কারে "ধরা"কে "সরা-বৎ" দেখেন।

এই সমস্ত কারণে পিতা ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। নিদারুণ অর্থাভাব দাঁড়াইল, ঋণপরিশোধের ত' উপায়ই রহিল না। তখন উত্তমর্ণগণ আমাদের বসৎবাটীখানি ক্রোক করিল। অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিও নিলাম করিয়া নিজেদের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইল। তখন আমরা যথার্থই পথের ভিখারী হইলাম পিতা নিরুপায় হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, নিজ কর্ম্মস্থল বর্দ্ধমানে আমাদিগকে লইয়া আসিলেন। এখন সামান্য বাটী ভাড়া করিয়া যে কষ্টে পিতা দিন যাপন করিতেছেন, তাহা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

ভাই, সুধু আমাদেরই কেবল এ দশা ঘটে নাই, এই কন্যাদায়ে পড়িয়া শতশত গৃহস্থের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এই বিশাল বিশ্বজগতে কে কাহার সংবাদ লয়? সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত! একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিবে, সুধু এই কারণে সমাজের অর্দ্ধেক লোক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। হায়! আমাদের সমাজ এ সব দেখেও দেখে না।"

সুরেশের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া ভূপেন্দ্র এতদূর কাতর হইলেন যে, তাঁহার কোন কথার উত্তর দিবার শক্তি রহিল না, কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সুরেশ বলিলেন "এত ক্লেশে তো' পিতা কন্যাদায়ে উদ্ধার হইলেন, কিন্তু আহার পরিণাম কি হইল তাহা শোন। দুইটী ভগ্নী শৈশবেই বিধবা হইয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছে, আর এক জনের স্বামী মদ্যপায়ী, ও নানা দোষে দোষী। সে নরাধম স্ত্রীকে আদৌ দেখিতে পারে না, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। এখন অতি দুঃখে সে হতভাগিনীর দিন অতিবাহিত হইতেছে। ইহাও সেই কন্যাদায়ের অন্যতম ফল! কারণ এখনকার দিনে যিনি যত অর্থব্যয় করিতে পারিবেন, তিনি তদনুরূপ সৎ পাত্র পাইবেন। আমার পিতা কষ্টে সৃষ্টে এক একটী কন্যার প্রতি পাঁচ সাত শত টাকা মাত্র ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কাজেই মনোমত সৎপাত্র পান নাই। যেমন তেমন করিয়া জাতিরক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র।"

কন্যা রূপবতী এবং গুণবতী হউক, কুলে শীলে উৎকৃষ্ট হউক, যদি তাহার পিতা ধনবান্ না হয়েন, তবে লোকে সে স্থলে বিবাহ দিবে না। যদি কন্যার পিতা জীবিত না থাকেন, তবে "বিধবার মেয়ে, অধিক লাভের প্রত্যাশা নাই" বলিয়া সে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে। ইহা কি সমাজের কম পৈশাচিকতা? দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই, আছে কেবল অর্থলিপ্সা। কেবলমাত্র স্বার্থের আশায় লোকে উন্মত্ত!

আরও একটী ঘোর অনিষ্টকর ব্যাপার এই যে, এ দিকে ত' কন্যার বিবাহে কেবল "টাকা" "টাকা" শব্দ, তাহার উপর কন্যা যদি একটু বয়ঃস্থা হইয়া পড়ে, অমনি "জাতি গেল," "ধর্ম্ম গেল" বলিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ চীৎকার করিতে থাকেন। যাহার কন্যা বয়ঃস্থা হইল, সমাজ তাহাকে "এক-ঘরে" করিবে, তাহার সহিত সমাজের লোকে একত্র আহার ব্যবহার বন্ধ করিবে, ঘৃণায় সকলে তাহাকে টিট্‌কারী দিবে! উঃ কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা! কি পরিতাপের বিষয়!

এইজন্য কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কন্যার পিতামাতা এবং আত্মীয়বর্গ নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। কন্যার জন্ম যেন অমঙ্গলপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

একবার ভাবিয়া দেখ, ভাই! এ সমস্ত কি শোচনীয় ব্যাপার! তোমরা ধনীর সন্তান, বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছ, সংসারে যে কত দুঃখ কষ্ট অহরহ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা জান না।

সংসারের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিবে যে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক।"

ভূপেন্দ্রনাথ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে সুরেশের কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন; শুনিয়া তাঁহার মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন— "ভাই সুরেশ! তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ। আমরা নিজে কখনও দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করি নাই বলিয়া অপরের দুঃখ কষ্ট কখনও ভাবিয়া দেখি না। আজ তোমার কথাগুলি শুনিয়া আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। সমাজের নেতৃবর্গ "সমাজ সংস্কার" "সমাজ সংস্কার" বলিয়া বৃথা চীৎকার করেন। প্রকৃত পক্ষে সমাজের কোনও সংস্কারসাধনে তাঁহারা যত্নশীল নহেন।

আমাদের সমাজের মধ্যে কত দোষ, কত অভাব রহিয়াছে, আমরা তাহা দূর করিতে পারি না; তবে আর আমাদের দ্বারা দেশের কি উপকার হইতে পারে? ধিক্ আমাদিগকে। আমরা মঞ্চে দাঁড়াইয়া গলাবাজি করিতে জানি, বক্তৃতার স্রোত বহাইয়া লোকের কাণ ঝালাপালা করিতে পারি, কিন্তু কাজের সময় আমরা নির্বাক্, সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেখি না। কাজের কথায় আমরা মূক ও বধির হইয়া থাকি। আমি আজি তোমার নিকট শপথপূর্ব্বক বলিতেছি,
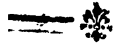
আজি হইতে আমি সমাজের হিতের জন্য প্রাণপণ করিলাম। এই কন্যা বিবাহ-বিভ্রাট যাহাতে দেশ হইতে দূর করিতে পারি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

আর এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি নিজে টাকা লইয়া বিবাহ করিব না। অর্থ না লইয়া কোনও সদ্বংশীয় দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করিব, এবং নিজের বন্ধুবর্গকেও সেইরূপ করিবার জন্য অনুরোধ করিব।”

সুরেশ বলিলেন—“শুনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু আজি কালি আবার একটা প্রবল জুয়াচুরি আরম্ভ হইয়াছে। অনেক ধনী ও সমাজের চক্ষে সম্ভ্রান্ত লোক, বাহিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, পুত্রের বিবাহে অর্থ লইব না, এবং প্রতিজ্ঞাপত্রেও নাম স্বাক্ষর করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যকালে লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া প্রকারান্তরে ক'নের বাপের রক্তটুকুও শোষণ করিতে বিরত হন না।”

ভূপেন্দ্র কহিলেন—“ইহা ভয়ঙ্কর ব্যাপার বটে, ধর্ম্মের ভান করিয়া এরূপ অধর্ম্ম করা যারপর নাই নিন্দনীয়! কিন্তু চেষ্টা করিলে কি এ সকল দূর করা যায় না? অবশ্যই যায়। চেষ্টায় অসাধ্য কি আছে? সকলে মিলিয়া যদি এই বিষয়ে যত্নশীল হই, তবে অবশ্যই ইহা দূর হইবে। যদি আমরা এই প্রথাটী সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারি, তবে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হয়।”

বহুক্ষণ ধরিয়া সুরেশ ও ভূপেন্দ্রনাথে এইরূপ নানাবিধ কথা হইতে লাগিল। দেশের কথা, সমাজের কথা, ব্যক্তিবিশেষের কথা লইয়া উভয়ে অনেক আন্দোলন করিলেন। সুরেশ বলিলেন “ভাই, শুধু কথার প্রাচুর্য্যে কোন ফল হয় না, কাজ করা চাই।” অতঃপর সুরেশচন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথের নিকটে বিদায় হইয়া নিজ নিবাসাভিমুখে গমন করিলেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ চিন্তিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

“ঈশ্বর”

অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নিত্য নিরঞ্জন,
সর্ব্বজীবে অনুপম করুণা যাঁহার,
সকলের স্রষ্টা যিনি পতিত-পাবন,
ঈশ্বর তিনিই এক সকলের সার।

এই যে করিছ সুখে বিচরণ ভবে,
নাহিক দুখের লেশ অন্তরে তোমার,
পূর্ণ তব ধনাগার অতুল বিভবে,
তিনিই কেবল হন তার মূলাধার।

যবে তুমি জ্ঞানচক্ষু করি উন্মীলন,
দেখিবে সকল বস্তু সৃষ্টি বিধাতার,
অপার আনন্দে তুমি হইবে মগন,
ভাতিবে বিমল দীপ্তি হৃদয়ে তোমার।

কে দিয়েছে মাতৃস্তনে অমিয় সুন্দর,
কে দিয়েছে চাঁদে আলো অমল ধবল,
কে সৃজেছে জলবায়ু অতি স্নিগ্ধকর,
কে দিয়েছে কুসুমেতে গন্ধ নিরমল!

কে দিয়েছে শিখিপুচ্ছে বিচিত্র বরণ,
কে দিয়েছে মাতৃহৃদে স্নেহ-পারাবার,
কে সৃজেছে মনোহর বিহগকূজন,
ঈশ্বর সবার তিনি দয়ার আধার।

কিবা ক্ষুদ্রে কি মহতে সম দয়াশীল
সামান্য বিটপিপত্রে যাঁর অধিষ্ঠান,
যাঁহার কৃপায় চলে ব্রহ্মাণ্ড অখিল,
তাঁহার চরণে মতি রেখ মতিমান্।

অনাদি অনন্ত যিনি সকলের সার,
ভক্তি-ডোরে বাঁধা যিনি ভক্তের সদন
জ্ঞানের অতীত যিনি সদা নির্ব্বিকার,
অগতির গতি তিনি অধমতারণ।

আকাশের পূর্ণ ইন্দু আর বালিকণা,
যাঁর কাছে বিতরয়ে সমান সুষমা,
ক্ষুদ্রের নাশেও যাঁর দারুণ বেদনা
কে পারে বুঝিতে তাঁর অনন্ত মহিমা।

হে প্রভো, ভুলেছি তোমা এসে এই ভবে
মূর্খ আমি কি বুঝিব মহিমা অপার,
পদাম্বুজে স্থান দিও অভাগা মানবে,
প্রণতি করিগো প্রভু চরণে তোমার।

শ্রীচারুমোহন দে

আন্তরিক পবিত্রতা

১। যাঁহারা আপনাদিগকে মহাত্মা নামে পরিচয় দিয়া শরীরকে কষ্ট দেন, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের হৃদয়ের কুষ্ঠরোগ আরাম হয় নাই। তুমি যদি শুধু পিপীলিকার গর্ত্তের উপরিভাগ নষ্ট কর, তাহা হইলে কি তন্মধ্যস্থিত পিপীলিকাগুলি নিহত হইবে?

২। যাহারা হৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সুদূর তীর্থস্থান পর্য্যটন করিতে গমন করে, তাহারা নিজ বাহুদ্বয়-বেষ্টিত মেষশাবককে যে মেষপালক পালের ভিতর অন্বেষণ করে ঠিক তাহারই ন্যায়।

৩। কাককে কি গঙ্গায় স্নান করাইলে হংস হইবে?

৪। কোন ব্যক্তির মৃতদেহের হাড় কাশীধামে নীত হইলেও তাহার দোষ তাহাতে সংলগ্ন থাকে।

৫। কুকুরকে পরিষ্কার করিলে বাছুর হইতে পারে না।

৬। তুমি কেন মস্তক মুণ্ডন কর ও দাড়ী কামাও? যখন হৃদয়ে শূকরের লোমের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দোষগুলি হৃদয়কে খোঁচায়, তখন অন্তরের মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিতে ছুরী প্রবেশ করাও, তোমার অন্যান্য অঙ্গসমূহ কি প্রকার শ্রীভ্রষ্ট তাহা লক্ষ্য করিও না। হৃদয়স্থিত কু-ইচ্ছা ও অহঙ্কার রূপ আগাছা তুলিয়া ফেল, তাহা হইলে তুমি অবশ্যই পবিত্র হইবে।

৭। আপনাদিগকে নিয়মের শাসনে রাখিলে যুবকগণ স্ব স্ব গন্তব্য পথ পরিষ্কার রাখিতে পারে।

৮। যোগসাধনের নিমিত্ত নানাপ্রকার

আসন পরিগ্রহ, মল্লযোদ্ধার ব্যায়ামের ন্যায় আবশ্যক নহে।

৯। কোন লোক পঞ্চাশৎ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে চলিয়া গেলেও তাহার পাপ তাহার সঙ্গেই থাকে।

১০। ললাটে বিভূতি লেপন করিলে কি সুরার গন্ধ বিলুপ্ত হয়? উপবীতসূত্র তোমার গলদেশে লম্বিত থাকিলেই তোমাকে কি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানা যাইবে?

১১। সর্পের গর্ত্তের উপর আঘাত করিলে কি তন্মধ্যস্থিত সর্পের মৃত্যু হইবে? শুদ্ধ শরীরকে কষ্ট দিলেই কি মোক্ষলাভ হইবে?

১২। মনুষ্য জটা ধারণ করিলে, কিম্বা ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে, বা ললাটে ফোঁটা কাটিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কিন্তু যাহার অন্তরে সত্য ও পবিত্রতা আছে সেই ব্রাহ্মণ।

১৩। সৎপথে থাকিয়া যাহারা কর্ত্তব্যপালনে যত্নশীল, চরিত্রবান্ ও দোষরহিত, তাহারাই ত্যাগ স্বীকার করিতে সক্ষম।

১৪। শাস্ত্রালোচনায়, ভজনে, সাধনে ও তপস্যায় অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু বাঞ্ছিত রত্ন পাইলাম না। দিবা নিশি স্নানেও হৃদয়ের অপবিত্রতা দূর হইল না।

১৫। যাহার জীবনসূত্রে প্রেম ও পবিত্রতা গাঁথা রহিয়াছে, তাহার আর অন্য কোন অলঙ্কার আবশ্যক হয় না।

১৬। যে ব্যক্তি অপবিত্র, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অধর্ম্মে রত, তাহার কি বেদপাঠে, কি বদান্যতায়, কি ত্যাগস্বীকারে, কি ব্রতপালনে, কি বৈরাগ্যে, কিছুতেই অন্তরের আনন্দলাভ হয় না।

১৭। লালসার ঝোপে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিও না; কারণ, তথায় ব্যাঘ্ররূপিণী হৃদয়বেদনা ওৎ পাতিয়া আছে।

১৮। পবিত্রতা মনুষ্যের মহারত্ন। যে ব্যক্তি চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা মনকে পরিচ্ছন্ন রাখে, সেই পবিত্রতা লাভ করে।

স্বর্গীয়া প্রিয়বালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

স্নেহের হিরণ, তুমি বড় স্বার্থপর। তুমি নিজে ত সকলকে কাঁদাইয়া অসময়ে চলিয়া গেলে, আবার আমাদের প্রাণের প্রিয় ভগ্নী প্রিয়বালাকেও ডাকিয়া লইলে। বুঝিয়াছি, প্রিয়বালার বিচ্ছেদ তুমি সহিতে পারিলে না। তোমরা যখন ইহ সংসারে ছিলে, তেমাদের উভয়ের কত সদ্ভাব ছিল। উভয়েই সমবয়স্কা ছিলে, একসঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করিতে, একসঙ্গে বিভাগপূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিয়া জননীর সহায়তা ও পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতে। তোমরা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা

করিয়া আনন্দের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলে। ভাল জিনিষগুলি পরস্পরকে দিয়া তোমরা কত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিয়াছ। প্রিয়বালা যে কাপড়, জামা বা সেমিজটী পছন্দ করিয়াছে, অমনি সেটী তুমি তাহাকে দিয়াছ। তোমাদের উভয়ের কেমন সৌহার্দ্দ ছিল। যখন উভয়ে একত্র গান করিতে, লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তোমার বিচ্ছেদে প্রিয় বড় কাতরা হইয়া পড়িয়াছিল। তাই বুঝি আজ তিন বছর পরে তাহাকে তুমি ডাকিয়া লইলে। হায়! আমাদের কথা একবারও ভাবিলে না! প্রেমময়ী জননী ও স্নেহপূর্ণ জনকের কথা একবারও ভাবিলে না!

সেখানে তোমরা আমাদের প্রিয় ভ্রাতা যোগেশকে পাইবে। ভাই ভগ্নীতে মিলিত হইয়া স্বর্গোদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিও।*

যামিনী, তুমি না ভাই ডাক্তার? তুমি কত লোককে আরাম কর। তুমি ভাই আমাদের ভগ্নীকে আরাম করিতে পারিলে না! তুমি প্রিয়বালাকে কত ভাল বাসিতে, একদিনও কোন বিষয়ের জন্য তাহার প্রাণে আঘাত দাও নাই। তুমি কোন্ প্রাণে তাহাকে যাইতে দিলে? তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তোমাকে জামাতা পাইয়া আমাদের পিতামাতা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। আমরা তোমাকে ভগ্নীপতিরূপে পাইয়া সৌভাগ্য মনে করিয়াছিলাম। আহা! সকলই যে বিষাদময় হইল!

হায় রে হতভাগ্য অরুণ, এ জগতে জননীর একমাত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসার মর্ম্ম তুমি কিছুই বুঝিলে না। জননীর স্নেহ ও শাসন বিমিশ্রিত অপূর্ব্ব ভালবাসার ভিতর দিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিলে না। তোমাকে পরপত্যাশী ও পরমুখাপেক্ষী হইতে হইল। সংসারে জননী যে কিরূপ মহামূল্য রত্ন, তাহা তুমি জানিলে না। বাছারে, তুমি কি পাপ করিয়াছিলে যে, জননীর নিরুপম, নিষ্কাম ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইলে?

মা গো! প্রিয়বালার সঙ্গে যামিনীকে পাইয়া তুমি কত সন্তুষ্ট ছিলে। একদিনও কোন কারণে যামিনী আমাদের কাহারও মনে কোন কষ্ট দেয় নাই। বাবা ও তুমি সর্ব্বদাই বলিয়াছ "আমাদের পীড়া হইলে সর্ব্বপ্রথমে যামিনী ও প্রিয়বালাকে খবর দিব।" হায় মা, আজ তোমাদের সেই কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে। প্রিয় ত ইহকালের মত চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে যামিনী-রত্নও দূরে সরিয়া পড়িল। মা গো! ইহাও প্রিয়বালার শোকের অপর একটী অঙ্গ হইয়াছে। মা গো! আমি জানি, পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণে তোমার ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। তোমার ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ অশ্রুজল

* অষ্টম বৎসর বয়সে শিলংএ আমাদের এই ভ্রাতাটী পরলোক গমন করে। হিরণ, যোগেশ ও প্রিয়বালা পর পর জন্ম গ্রহণ করে। হিরণের পর যোগেশের ও তৎপরে প্রিয়বালার জন্ম হয়।

সর্ব্বদাই এ পাপীয়সীর হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। তুমি সেই সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গল হস্তের মঙ্গলবিধানের বিষয় কত সময় আমাদিগকে বলিয়াছ। আমার বিশ্বাস, তুমি এই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি সেবন করিয়া প্রাণের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে পারিবে। মা গো! পরমার্থ চিন্তা ছাড়া এ জগতে প্রকৃত শান্তির অন্য কোন উপায় নাই। এই সকল মোহের কথা যত ভাবিবে, ততই অশান্তি সাগরে ও অশ্রুজলে ভাসিতে থাকিবে। যোগেশ-বিয়োগের পরে তুমি কত সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ গল্প ও উপদেশ-পূর্ণ কথা বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছ। এখন পুনরায় জীবনের দুর্দ্দিনে সেই সকল সুন্দর সুন্দর ভাব হৃদয়ে আনয়ন কর। তোমার কর্ত্তব্য তুমি সাধন করিয়াছ, এখন শোকে বিহ্বল না হইয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া তৎসাধনে অবশিষ্ট জীবনটুকু কাটাও। মা গো! মৃত্যুরূপী স্বর্গদূতের আহ্বান অগ্রাহ্য করে কাহার সাধ্য? অনন্ত জীবনের ইঙ্গিতেই মৃত্যু মানবাত্মাকে পরলোকে লইয়া গিয়া নবজীবন দানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে থাকে। মা গো! তোমার মত ধর্ম্মে নিষ্ঠা ত অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই দেখিতে পাই। তাই বলিতেছি জীবনের এই ভীষণ পরীক্ষার দিনে বিধাতার বিধান অনুভব করিয়া মনের সুস্থতা আনয়ন কর। তোমার মুখেই শুনিয়াছি, বিধির বিধানে বিশ্বাসের ন্যায় হিতকারী বস্তু আর নাই। আজ জীবনের এই দুর্দ্দিনে মঙ্গলময়ের বিধান ও করুণার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনের গৌরব বৃদ্ধি কর। সর্ব্ব-নিয়ন্তা মানবদিগকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজ্যে দীর্ঘকাল রাখিয়া তাহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে অধিরোহণ করাইবেন এই সর্ব্বজনীন বিশ্বাস ও সেই ভূমা ঈশ্বরের অদ্ভুত লীলা অলৌকিক-ভাবে তোমার হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে প্রতি-ভাত হউক। তোমার হৃদয় স্বর্গীয় জ্যোতি ও সৌরভে পরিপূর্ণ হউক। এ অধম সন্তানবৃন্দ তোমাকে দেখিয়া শিক্ষালাভ করুক।

পিতঃ! তোমাকে কি বলিব, তুমি ত সুবিজ্ঞ ও বিদ্বান্ বলিয়া বিদিত। পুস্তকা-কারে 'সৌভাগ্য-সোপান', 'যুবকবন্ধু' প্রভৃতি প্রণয়ন দ্বারা কত লোককে কত উপদেশ দিয়াছ। এখন শোকাকুল প্রাণকে স্থির রাখিয়া, আপনাকে আপনি সান্ত্বনা দিয়া, আমাদের পরম স্নেহময়ী জননীকে প্রকৃত শান্তির পথে লইয়া যাও। তাঁহার প্রাণ বড়ই কোমল, এখন শোক-তাপিত হওয়াতে আরো কোমল হইয়াছে। দেখিও পিতঃ! তিনি শোকতপ্তপ্রাণে যেন কোনরূপ আঘাত না পান। পিতঃ, তোমরা সংসারক্ষেত্রে একটী কুসুমো-দ্যানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলে মাত্র। এই উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাদের উপর ছিল, কিন্তু জিনিষের উপর কোন স্বত্ব ছিল না। তাই স্বত্বাধিকারী যিনি,

তিনি যখন যে পুষ্পটী ইচ্ছা তুলিয়া লইতেছেন। উদ্যানের রক্ষক স্বরূপ মাতা পিতার এজন্য শোক করা উচিত নহে। পিতঃ! তোমাকে বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই মূর্খতা। আজীবন তোমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছি, তোমার জীবনে যে প্রকার ধর্ম্মবিকাশ দেখিয়াছি, সর্ব্বদা তোমার নিকট যে প্রকার ধর্ম্মালোচনা শুনিয়াছি, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাকে যে সকল সৎ ও কর্ত্তব্য কার্য্যে নিয়োজিত দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, তুমি শোকসন্তপ্ত হইলেও প্রাণের প্রকৃত শান্তি হারাইবে না, বরং এই সকল ঘটনা তোমার ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে অধিকতর সহায় হইবে।

হে মঙ্গলময় স্বর্গীয় পিতঃ! তোমার কার্য্যের গূঢ় রহস্য আমার নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি বুঝিব! তুমি কি প্রকারে কোন্ কার্য্যের ভিতর দিয়া তোমার কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন কর, আমি কি বুঝিব? আমরা মোহান্ধ জীব, সংসারের ক্ষণিক সুখের ব্যাঘাত দেখিলেই হতাশ ও আকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করিতে থাকি এবং তৎকালীন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া সংসারসাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকি।

তুমি এ সংসারে আমাদিগকে প্রিয়বালারূপ একটী উৎকৃষ্ট সুহৃদ্ দিয়াছিলে। আবার তোমারই আদেশে সে তোমার নিকট চলিয়া গেল। ইহার ভিতর অবশ্যই তোমার মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িতভাবে কার্য্য করিতেছে। তুমি তাহার পবিত্র আত্মার সমস্ত দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন কর। তাহার স্বর্গীয় আত্মাকে শান্তিতে রাখ ও অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাও।

হে দয়াময়! করুণার সাগর পিতঃ, আজ এই গভীর শোকের দিনে তোমার চরণে তোমার এই মহাপাপীয়সী সন্তানের আরো একটী আকুল প্রার্থনা এই যে, এই শোকদুঃখের ভিতর দিয়া আমাদের শোকপীড়িত জননী ও জনকের প্রাণ পারমার্থিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অধিকতর ব্যাকুল কর। তোমার প্রকৃত সেবকের ন্যায় শোকতাপের ভিতরও তাঁহারা তোমার অযাচিত করুণার নিদর্শন দেখিয়া শান্তচিত্তে উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধন করুন। তোমার প্রেরিত এই বিশ্বব্যাপী বিধান অবনতমস্তকে তাঁহারা গ্রহণ করুন। প্রিয়বালার অনন্ত আত্মার মঙ্গলের জন্যই যে তুমি এ বিধান সংঘটিত করিয়াছ, এই ভাব উজ্জ্বলরূপে তাঁহাদিগের প্রাণে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া দাও। তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যে তোমার মঙ্গল হস্ত দর্শন করুন, হৃদয়ে তোমাকে লাভ করিয়া প্রাণ সবল করুন। মঙ্গলভাবে প্রেমালোকে তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তুমি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার মলিন ও মোহাচ্ছন্ন ভাব তিরোহিত করিয়া দাও। তোমার সহিত তাঁহাদিগের আত্মার যোগ

সংস্থাপন কর। হে বিশ্বরাজ! তোমার প্রজাশাসনকার্য্যে আমরা কোন বিচার করিতে না যাইয়া কেবল যেন তোমার আজ্ঞাবহ থাকিতে পারি।

স্নেহের প্রতিমা স্বর্গীয় হিরণ ও প্রিয়, তোমরা জগতে থাকিলে জগতের উপকার হইত—পরিবারের সকলের উপকার হইত—জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া তোমরা পরমপিতা পরমেশ্বরের সন্তান নামের যোগ্য হইয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিতে। ভগিনি! আমি কোন্ ছার, জগতের ও পরিবারের লোকের ত দূরের কথা—নিজের জীবনের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যগুলিও পালন করিতে পারিতেছি না। পশু অপেক্ষাও অধমভাবে জীবনের মহামূল্য সময় নষ্ট করিয়া বিশ্বপিতার সন্তান নামে ঘোর কলঙ্কারোপ করিতেছি মাত্র। হায়, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে, জানি না। তোমাদের বিচ্ছেদ এ পাপীয়সীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হইয়াছে। আমি সংসার অরণ্য বোধ করিতেছি। হৃদয় মন যেন শূন্য শূন্য মনে হইতেছে। কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রাণ বসিতে চায় না। তোমরা দিদিকে আন্তরিক ভাল বাসিতে, জানি। তোমরা অকপটচিত্তে সখীর ন্যায় দিদির নিকট সমস্ত অবস্থা ও কথা, প্রাণ খুলিয়া বলিয়া শান্তি লাভ করিয়াছ, আমিও সর্ব্বপ্রকার মনের কথা তোমাদিগকে জানাইয়া প্রাণে সান্ত্বনা পাইয়াছি ও অনেক সময় উপদেশও লাভ করিয়াছি। আজ তোমরা স্বর্গে—আর আমি এই নরলোকে পড়িয়া সাংসারিক কোলাহলে নিমজ্জিত রহিয়াছি। তোমাদের কত কথাই পদে পদে মনে পড়িয়া প্রাণকে উদাস করিতেছে। তোমরা, স্বর্গলোক হইতে তোমাদের এই হতভাগিনী ভগিনীর জন্য প্রার্থনা কর। যাঁহার নিকট প্রাণের কথা বলিলে বিশ্বাসঘাতকতার ভয় থাকে না, সদুপদেশ লাভ হয়, যাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিলে বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই—কিন্তু চিরসৌহার্দ্দ জন্মে, যাঁহাকে প্রাণবন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে প্রাণে যথার্থ আরাম ও শান্তি লাভ হয়, যাঁহার নিকট নৈরাশ্য ও দুঃখের কথা বলিলে স্বর্গীয় আশার অভয়বাণী শুনা যায়, জীবনের সেই সারবন্ধু ও প্রকৃত সুহৃদকে লাভ করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কার্য্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হই। সংসারের পরপারে তোমাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া শান্তিলাভ করিব।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত,
পূর্ণিয়া।

ভূত না মানুষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সত্যই কি ভূতের কাজ ?

নন্দক দেবদত্তের গৃহাভিমুখে চলিল। তৎকালে বালারুণের মধুর কিরণে সমস্ত তরু পল্লব, ফল পুষ্প সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে দ্রুতপদে দেবদত্তের গৃহে গিয়া দেখিল, সে গৃহ শূন্য। ঘরের দরজা মুক্ত ও ভগ্ন। তথায় প্রতিধ্বনিও নাই, দেবদত্তকেও দেখিতে পাইল না। প্রতিবেশীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, ইন্দ্রমৌনী আসিয়া ইহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন কি না ?

প্রতিবেশিগণ কহিল—"না গত কল্য প্রভাতে ইন্দ্রমৌনী আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই দিন রাত্রিতেই তাঁহারা অপহৃতা হইয়াছেন। তাহারা ইহাও কহিল যে, তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাহাদিগকে কোন ভূত আসিয়া লইয়া গিয়া বধ করিয়া ফেলিয়াছে; কারণ ইন্দ্রমৌনী অথবা প্রতিধ্বনির পৃথিবীতে কোনও শত্রু নাই। এই সকল কথা বলিবার সময় বক্তাদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নন্দক ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল পরে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল প্রফুল্ল সূর্য্য ক্রমশঃ সতেজ হইতেছে। দিগ্‌দিগন্তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিল— বৃক্ষগুলি কত সুন্দর, কত সবুজ। কিন্তু তাহারা তৎকালে তাহার নিকট বিষই বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সে নিজ হৃদয়ের পানে চাহিল, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা ব্যতীত সে স্থানে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। জ্বলন্ত ক্রোধ ও অদমনীয় প্রতিহিংসা তৎকালে তাহাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিল এবং তৎকালে তাহার কোন কার্য্যশক্তিই রহিল না। ক্ষণকাল পরে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল।

"অহো! কি পরিতাপের বিষয়! আমি ইহার মূলে থাকিতেই একজন সাধ্বী রমণী অপমানিতা হইলেন। ঈশ্বর না করুন, যদি তাহার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে, তবে আমি তদুপলক্ষে আর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায়ই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তাহা হইলে আমার এই শক্তিহীন ভুজ সত্যই ছেদন করিয়া জ্বলন্ত অনলে ফেলিব। কিন্তু ভরসা করি, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিবেন। অপর চিন্তার বিষয় এই যে, তাহাদের কি হইল ? নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে চণ্ডদেবের লোক আসিয়া প্রতিধ্বনিকে লইয়া যাইবে ইহাই কথা ছিল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কি তাহারা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ? চণ্ডদেব কি

আমাদের গুপ্ত পরামর্শ শ্রুত হইতে পারিয়াছিলেন? না, তাহা অসম্ভব। হয়ত কোন দৈববলে জানিয়াছেন অথবা তাহারা ইন্দ্রমৌনীর অপেক্ষা না করিয়া নিজেরাই কোন নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছে। অথবা প্রতিধ্বনিই আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অঙ্গের হীরকালঙ্কারের লোভে এ হত্যা-কাণ্ড”—এই চিন্তা মনে উদয় হইতেই তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার চিন্তা তৎক্ষণাৎ অন্য-দিকে ধাবিত হইল। সে ভাবিল “ছি! ছি! আমি কি অন্যায় ভাবিতেছি? প্রতিধ্বনি স্বর্গ, আমি পাপপুরুষ। আমি আজ স্বর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছি। বিশেষতঃ আমার ভগ্নী যে ভাবে হত হইয়াছে, তাহা স্ত্রী-লোকের দ্বারা হইতে পারে না। ইহাও চিন্তার বিষয় বটে যে, প্রতিধ্বনি যদি পলাইতে পারিবেন, তবে ইন্দ্রমৌনীকে ডাকিয়া পাঠাইবেন কেন? ডাকিলেন যদি, পলাইলেনই বা কেন? পলাইলেন যদি তবে হিতৈষী প্রতিবাসীদিগের নিকট সে কথা গোপন করিলেন কেন? না, না, কিছুই নয়, চণ্ডদেবই তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা, ইহাই যদি সত্য কথা হয়, তবে পীড়িত দেবদত্তের খোঁজ নাই কেন? চণ্ডদেব দেবদত্তকে লইয়া যাইবেন কেন? তবে কি গুপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া প্রতিধ্বনির উপর ক্রোধ বশতঃ দেবদত্তকে মারিয়া ফেলিয়াছেন? হইতেওপারে। তৎক্ষণাৎ মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে নন্দকের আনন্দহীন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু চণ্ডদেবের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল; সে প্রতিধ্বনির বিষয় নির্ণয় করিবার জন্য পুনরায় চণ্ডদেবের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ধীর পাদবিক্ষেপে চণ্ডদেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চণ্ডদেব দেহাচ্ছাদন বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাহার দক্ষিণ হস্তের উপরে একটী সদ্য-ক্ষত-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। নন্দক বিদেশ হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া চণ্ডদেবের হস্তের ক্ষত এই প্রথম দর্শন করিল এবং কি এক আশঙ্কায় তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল ও অন্তরের মূল পর্য্যন্ত আকুল হইল। সে অস্পষ্ট স্বরে, “একি! একি!” বলিতে বলিতে বসিয়া পড়িল। তৎকালে চণ্ডদেব পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতেছিলেন :—

“হে হরি, আতপ-তাপিতের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, ভব-তাপ দগ্ধের পক্ষে তেমনি হরিকথালাপ অপূর্ব্ব অমৃত। এ অমৃতের নামমাত্রেই সর্ব্বতাপের শান্তি হয়। যাঁহারা স্বর্গমোক্ষকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, সেই শুক, নারদাদি জীবন্মুক্ত যোগীরাও তোমার নামামৃত সাদরে পান করিয়া থাকেন। যাহারা জীবলোককে এ অমৃত দান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁহারাই জীবলোকের জীবন-দাতা। ফলতঃ ভগবৎ কথার ন্যায় সর্ব্ব-তাপহারিণী পতিতপাবনী মৃতসঞ্জীবনী সুধা আর কি আছে?”

নন্দক পুনরায় উঠিল এবং চাহিয়া দেখিল, চণ্ডদেবের চিত্ত বিষম আকুল, নেত্র বিগলিত, দেহ কম্পিত। তদ্দর্শনে নন্দকের মনোভাবের পুনরায় বিপর্য্যয় ঘটিল। সে ভাবিতে লাগিল—"এই জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি কি প্রকারে এরূপ কার্য্য সাধন করিয়াছেন? ইঁহাকে দেখিলে ইঁহার মনোভাব কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। অধিকন্তু ইঁহাকে দেবতুল্য মনুষ্য বলিয়া মনে হয়। অহো! আমার কি হইল! যিনি সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়ন করেন ও যাঁহার বচনে এমনি মধুরতা বিরাজমান যে, লোকে তাহা পান করিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। এ কি! এ সব কি ভূতের খেলা, অথবা সমুদায়ই আমার চিত্তবিভ্রম মাত্র? দেখি, আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি, প্রকৃত ঘটনা কি?"

নন্দক ক্ষিপ্রগতিতে চণ্ডদেবের সন্নিকটে চলিল। চণ্ডদেব তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "নন্দক তুমি আমার কাছে আসিয়া চন্দনীর বিষয় যাহা যাহা জান সমুদায় আমাকে অবগত কর।"

নন্দক চণ্ডদেবের নিকট সমুদায় বিবরণ বিবৃত করিলেন।

চণ্ডদেব কহিলেন, "নন্দক! আমি শত্রুহীন, এবং আমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছি, আমার মনের কল্পনা এইরূপ ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে।"

নন্দক। প্রতিধ্বনি ও তাহার পীড়িত স্বামী দেবদত্তকে পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদিগকে কে লইয়া গিয়াছে।

চণ্ডদেব। লইয়া গিয়াছে? কে লইয়া গিয়াছে? কেন লইয়া গিয়াছে?

নন্দক। প্রতিধ্বনির নিকট শুনিয়াছি, চণ্ডদেবই নাকি তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ডদেব কহিলেন, "চণ্ডদেব? কোন্ চণ্ডদেব, আমি?"

নন্দক। হাঁ।

চণ্ডদেব। কেন আমি প্রতিধ্বনিকে লইয়া যাইব?

"বলিতে পারি না।" বলিয়া নন্দক অতি সাবধানে চণ্ডদেবের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। প্রতিধ্বনির কথায় তাঁহার মুখের কোন ভাবান্তর হয় কি না ইহাই তাহার দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চণ্ডদেবের মুখে পিতৃভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাবই দেখিল না, অথচ স্বর্গগতা ভগিনীর সে দৃঢ় স্বর তখনও তাহার কর্ণে বাজিতেছিল;—"চণ্ডদেবই আমার ও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। চণ্ডদেব পশু, চণ্ডদেব পাষণ্ড, পৃথিবী চণ্ডদেবশূন্য হউক, অথবা চন্দনীশূন্য হউক। চণ্ডদেবকে লইয়া আমি এক পৃথিবীতে বাস অসুখের কারণ মনে করি। চণ্ডদেবের দয়া, অনুকম্পা শত ধারায় আমার উপর বিষ বর্ষণ করিতেছে। চণ্ডদেবের অন্নে দেহ বর্দ্ধিত হওয়া অপেক্ষা ক্ষয় হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর মনে করি।"

অতীত স্মৃতি নন্দককে ক্ষিপ্ত করিয়া

তুলিল। সে দ্রুতপদে প্রতিপালকের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু চিন্তা ও যন্ত্রণায় তাহাকে সত্যই দগ্ধ করিতেছিল। সে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল, যন্ত্রণা তখনো তাহার হৃদয়কে তীব্ররূপে তাড়ন করিতেছিল। সে অনাবৃত মেজের উপর বসিয়া কাটা কৈ মাছের মত ছট্‌পট্‌ করিতে লাগিল। সহসা ভৃত্যগণ সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্নান ও আহার করাইল। নন্দক অধিক কিছু আহার করিতে পারিল না, কিন্তু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক অনেকটা দুধ পান করিল ও স্নানাহারের পর পুনরায় সে আপন কক্ষের মেজের উপর পড়িয়া রহিল।

"ও কিসের শব্দ?" নন্দকের শয়ন-কক্ষ-সংলগ্ন ছোট একটী ঘরে চণ্ডদেব পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসীর নিকট পূজা, আহ্নিক ও রাত্রিতে যোগাভ্যাস করিতেন। সন্ন্যাসীর হঠাৎ মৃত্যু হয় ও সেই ঘরেই তাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল। তদবধি কেহ সে ঘরে যাইত না, চণ্ডদেবও যাইতেন না; রাত্রিদিন ঘর বন্ধ থাকিত। সেই ঘর হইতে বায়ু-সঞ্চালনবৎ কি একটা মৃদু শব্দ আসিতেছিল। মৃদু শব্দ নন্দকের কর্ণে প্রবেশ করিল। নন্দক তখন "ও কিসের শব্দ?" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। দেওয়ালের গায়ে কাণ দিয়া অনেকক্ষণ শুনিল, কাহার যেন নিঃশ্বাসের শব্দ বলিয়া তাহার মনে হইল। আরও অনেকক্ষণ শুনিয়া বুঝিল নিঃশ্বাসের শব্দই বটে। তাহার ইচ্ছা হইল দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলে, কিন্তু তাহা অসম্ভব। এক লম্ফে বাহিরে গেল। এক লম্ফে উপরি-উক্ত কক্ষের বন্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল, সে ভৃত্যদিগকে দরজা মুক্ত করিতে কহিল।

ভৃত্য দরজা মুক্ত করিয়া দিলে নন্দক এক লম্ফে ঘরের মধ্যে গেল। ঘরের কোণের দিকে একজন মানুষ বন্ধন-অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল।

নন্দক কহিল "কে তুমি হতভাগা?" কোনও উত্তর পাইল না। সে যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সেই লোকটীকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল! তাহাকে চিনিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া কহিল "আপনি আপনি?" লোকটী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না।

নন্দক। আপনি এখানে কেন? কে আপনাকে এখানে এরূপভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? তিনি কহিলেন, "তাহা ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় চণ্ডদেব, তুমি বলিতে পার প্রতিধ্বনি এখন কোথায়?"

নন্দকের মুখ মলিন হইয়া গেল, সে কিছুই উত্তর করিতে পারিল না।

নন্দকের এরূপভাব অবলোকন করিয়া বন্ধন-মুক্ত ব্যক্তি অস্থির হইয়া উঠিলেন; অভাগিনী প্রতিধ্বনি এখন কোথায় রহিয়াছে, তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শিরে করাঘাত করিয়া তিনি

কহিলেন, "হায় আমি ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।"

তাঁহার ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া নন্দক আপনার মনোভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে কহিল, "আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না, ব্যস্ত হইয়া কোন ফল নাই।"

বন্ধন-মুক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "হায়, আমি এতদিনে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলাম।"

"আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন, ধর্ম্মই অপনাকে রক্ষা করিবেন।" এই বলিয়া নন্দক তাঁহাকে দুগ্ধ ও ফল খাওয়াইল। তিনি সুস্থ হইলেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। তৎপরে তাঁহাকে কোনও একটী নিরাপদ স্থানে রাখিয়া নিজে অশ্বারোহণে তাহার পরিচিতা বালিকার গ্রামাভিমুখে চলিল। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিল। তৎকালে প্রকৃতি বড় মধুর সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। এক পশলা বৃষ্টি ও একখণ্ড মেঘ সূর্য্যকে সমধিক উজ্জ্বল ও প্রকৃতিকে অধিকতর সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘ মুক্ত উজ্জ্বল কিরণ কাঁচা সোণার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তকে এককালে সুবর্ণময় করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালে সারি সারি লতা, পত্র, তরু ও বন, এমন কি পাখী-কুলকেও সুবর্ণময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া মধুর বাতাস বহিতেছিল এবং সেই সুবর্ণময় পত্র ও পুষ্প-গুচ্ছ থরে থরে নাচিতেছিল। স্বর্ণ-বিহঙ্গের সঙ্গীত ও স্বর্ণ পুষ্পের নৃত্য সন্দর্শনে কাহার না হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হয়? কিন্তু ইহা নন্দকের সুখশূন্য অন্তরে ইহার বিন্দুমাত্র ভাবও উদ্দীপন করিতে পারিল না।

নন্দক অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বালিকার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে গৃহে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। পাকের ঘরে উপাধান, উপাধানের উপর মল মূত্র রহিয়াছে। পাকের হাঁড়ীতে মড়ার মাথা, মড়ার মাথার উপরে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা, বা! বা! কি বাহার! কিন্তু নন্দকের এ সব দেখিয়া হাসির উদয় হইল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, "হায়! সত্যই কি ইহা ভূতের কাজ? কোথায় গেল সে সরলা বালিকা? কোথায় গেল তাহার পিতা মাতা? ভূতে কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে? না কোন মানুষেরই এ কাজ? কিন্তু সেই দিন সেই বালিকার কথায় যতদূর বুঝিয়াছিলাম, তাহাতে তাহারা শত্রুহীন বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল।

কে জানিবে যে, ইহাদের আবার শত্রু ছিল? ইহারা কোথায় গেল? হায়, আমাকে কে তাহা বলিয়া দিবে? তাহারা কি স্ব-ইচ্ছাতেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে? হায়, কে আমাকে আজ সত্য কথা বলিয়া দিবে? নন্দক ক্ষণকাল বসিয়া চিন্তা করিবার পর উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাহারা যেখানেই যাউক

না কেন, যে কেহই তাহাদিগকে লইয়া যাউক না কেন, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবই করিব।"

নন্দক উঠিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক পুনরায় স্বগ্রামাভিমুখে ছুটিল। পুরমণ্ডল গ্রামে যাইয়া অনেকের নিকট অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল, কিন্তু কাহারও নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া সে নিরানন্দ হইল। সে তথাপি পথ চলিতে লাগিল। গমনকালে দেখিল, দেবদত্তের ভগ্ন দরজা কে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সে সন্দিগ্ধচিত্তে তথায় গিয়া দরজা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। ঘরের ভিতরে মানুষের গোঁঙ্গানির মত শব্দ শুনিতে পাইয়া দেখিল, তক্তোপোষের নীচে দুই ব্যক্তি বন্ধনাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারাই গোঁঙ্গাইতেছিল। নন্দক যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে তাহাদের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। কিন্তু তাহাদের জ্ঞানসঞ্চার হইতে অনেকক্ষণ লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও এক জন পুরুষ। নন্দক তাহাদিগকে চিনিতে পারিল না।

তাহারা কহিলেন, "কে তুমি বাপু! আমাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিলে?"

সবিস্ময়ে নন্দক কহিল, "আমি আপনাদিগকে চিনিতে পারিতেছি না। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রে আমাকে আপনাদের পরিচয় প্রদান করুন।"

পুরুষটী কহিলেন, "আমার নাম ভবভূতি, ইনি আমার স্ত্রী ইহার নাম ভাবিকা, ভাবময়ীনাম্নী কন্যা ব্যতীত আমাদের আর দ্বিতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। আমরা কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই, বরং পথিকবর্গ যাহাতে ভূত অথবা নর দস্যুগণের হস্তে নিপাত না হইতে পারে তজ্জন্য আমরা তিনজনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি।

একদিন রাত্রে আমরা ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ কে একটা ছোট শিশি নাকের নিকট ধরিল। আমি কি একটা তীব্রগন্ধে প্রথমে জাগ্রত হইয়াছিলাম, জাগ্রত হইয়া দেখিলাম একটা ভূত। তাহার প্রকাণ্ড মাথা, প্রকাণ্ড হস্ত, প্রকাণ্ড পদ, প্রকাণ্ড দেহ এবং সে করাল বদন বিস্তারপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার বলিবার অথবা চলিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু আমি বুঝিলাম, কে যেন আমাদিগকে লইয়া কখনও ঘোড়ায়, কখনও শিবিকায়, কখনও হাঁটাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তৎপরবর্ত্তী ঘটনা আমার স্মরণ নাই। কারণ তৎকালে আমি জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না আপনি কে। আপনার অনুগ্রহে আমাদের জীবন ফিরিয়া আসিল, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, এ জীবন ফিরিয়া না আসিলেই ভাল হইত। কারণ প্রাণপুতুলী ভাবময়ীকে আমাদের পার্শ্বে দেখিতেছি না। এই কথা শুনিবামাত্র ভাবিকা বিষম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নন্দক তাহাদিগকে শান্ত করিয়া ভাবিতে লাগিল যে, আমি ত ইহাদিগের কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, বালিকাটির নামই কি ভাবময়ী? ইঁহারাই কি সেই ভাবময়ীর পিতা মাতা?"

তাহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া ভাবিকা কহিলেন, "বাবা আপনি বলুন, আমার প্রাণপুতুলী ভাবময়ী কোথায় রহিয়াছে? সত্যই কি ভূতে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে? আহা মা আমার যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! যখন সে ফুলের ডালা লইয়া সায়াহ্নে ফুল তুলিতে থাকিত, তখন তাহাকে সাক্ষাৎ সন্ধ্যাদেবীর ন্যায় দেখাইত।

ভবভূতিও ক্রন্দনের সুরে কহিল— "আহা মা আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল, আমার শরীর অসুস্থ হইলে সেই সন্ধ্যা-আরতির জন্য ফুল তুলিয়া আনিত। আর আমাদের প্রধান কাজ পথিকদিগকে সন্ধ্যাকালে এই দিক্‌কার বনপথে যাইতে নিষেধ করা, তাহা সেই করিত। আহা! মা আমার নিতান্ত বালিকা। ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িতেই কাল তাহাকে—

নন্দক তাহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া কহিল, "আমি আপনাদিগকে চিনিতে পারিয়াছি।" তখন সে বালিকার সহিত তাহার পূর্ব্ব পরিচয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিল এবং তৎকালে তাহাদের যে বাক্যালাপ হইয়াছিল তাহাও কহিল।

তাঁহারাও তাহা স্বীকার করিলেন, ও ভাবময়ী যে সেই দিন সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমস্ত অবগত করাইয়া ছিল, তাহাও তাঁহার নিকট কহিল।

নন্দক নবীনবয়স্ক হইলেও প্রবীণের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ছিল। সে চণ্ডদেবের নিকট বহুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল এবং তাহার প্রতিভার কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। অতএব সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যাপার কি, তাহা একরূপ বুঝিতে পারিল এবং সে নিজেই ভাবময়ীর উদ্ধার সাধন করিবে, এরূপ কহিয়া ভাবময়ীর পিতা মাতাকে বিশ্বস্ত একজন প্রতিবেশীর নিকট রাখিয়া পুনরায় চণ্ডদেবের গৃহাভিমুখে চলিল।

(ক্রমশঃ)

গৃহ চিকিৎসা।

(অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।)

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এত ইংরাজী ঔষধের প্রচলন ছিল না। তৎকালে গৃহিণীগণই নানাপ্রকার গাছ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রায়

চিকিৎসকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু, অধুনা সে সকল ঔষধে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায় সামান্য অসুখ হইলেই চিকিৎসকের সাহায্য ভিন্ন অন্য উপায় নাই, সকলে এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। সেকালের গৃহিণীগণ দ্বারা সংসারের কতই উপকার সাধিত হইত, তাহার কয়েকটী নিম্নে উদাহরণ প্রকাশ করা গেল। ভরসা করি স্বদেশীয় ভগিনীগণের ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার হইবে।

কোন এক পল্লীগ্রামে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কার্য্যোপলক্ষে প্রায় বিদেশে থাকিতেন। গৃহে কেবলমাত্র বৃদ্ধা ও পুত্রবধূ এবং একটী পৌত্র ছিল। বৃদ্ধা অতি দয়াশীলা ও পরোপকারিণী ছিলেন। তাঁহার অনেক ঔষধাদি জানা ছিল, তদ্ব্যতীত তিনি নাড়ী পরীক্ষা করিতে সম্যক্‌রূপে জানিতেন। এই সকল কারণে তিনি সেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পূজনীয়া ছিলেন। যাহার কোন পীড়া হইত, সেই আসিয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে ঔষধ লইয়া যাইত। বৃদ্ধা সকলকেই যত্নের সহিত ঔষধ বিতরণ করিতেন, এবং পুত্রবধূকে সেই সকল ঔষধের বিষয় শিক্ষা দিতেন। পুত্রবধূর নাম সরলা। সরলার পুত্রের পাঁচড়া হইয়াছে, একদা প্রাতে সরলা নিমপাতা-সিদ্ধ জল দ্বারা পুত্রের পাঁচড়া ধৌত করিয়া দিতে দিতে শাশুড়িকে বলিল "মা, তুমি যে অতুলের (সরলার পুত্র) পাঁচড়ার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলে তাহা প্রায় শেষ হইয়াছে, ঔষধটা অতি উত্তম, এই কয়দিনে খোস অনেক ভাল হইয়াছে। আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখি। অতএব এবারে তুমি ঔষধ প্রস্তুত না করিয়া কিরূপে তাহা করিতে হইবে আমাকে বলিয়া দাও, আমি প্রস্তুত করিব, তাহা হইলে অনায়াসে শিখিতে পারিব।" বৃদ্ধা পুত্রবধূর মুখে এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, "বেশ তো মা! আমারও তাই ইচ্ছা; স্ত্রীলোকদের এই সকল ঔষধ কিছু কিছু জানা একান্ত আবশ্যক, সময়ে ইহা দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে। আমি অদ্য তোমাকে কতকগুলি ঔষধের বিষয় বলিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শুন।

একটা পিতলের বাটীতে অর্দ্ধপোয়া পরিমাণ নারিকেল তৈল আগুনে বসাইবে তৈলটা যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন গোটাকত নিমপাতা তাহাতে ফেলিয়া দিবে, নিমপাতাগুলি বেশ যখন চোঁয়া চোঁয়া হইবে, তখন তৈল হইতে নিমপাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া তৈলটা আগুন হইতে নামাইয়া তাহাতে ১॥০ দেড় তোলা আন্দাজ গন্ধকচুর্ণ ও ১ এক তোলা আন্দাজ মোম ফেলিয়া দিয়া একটা চামচে দ্বারা খুব ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে বেশ মলমের মত হইয়াছে, তখন ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। ঐ মলম প্রত্যহ তিন চারি বার লাগান আবশ্যক।

সরলা। যাহার এ ঔষধে ভাল হইবে না, তাহাকে কি অন্য কোন ঔষধ দিতে হইবে?

বৃদ্ধ—হাঁ, তা দিতে হইবে বৈকি!

সরলা—কি ঔষধ দিতে হইবে আমাকে তাহা বলিয়া দাও না মা।

বৃদ্ধা—আমাদের পল্লীগ্রামে ছোট গোয়ালে বা পাঁচ আঙ্গুলে নামে এক রকম লতানে গাছ অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার পাতাগুলি অতি কোমল। এক একটী পাতা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ঐ গাছের শিকড় উঠাইয়া আনিয়া তৈল প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে খাঁটী সরিষার তৈল অৰ্দ্ধ পোয়া আগুনে বসাইবে। তৈল যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন ঐ শিকড় বেশ থেঁতো করিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিবে। শিকড়গুলি বেশ চোঁয়া চোঁয়া হইলে তৈল আগুন হইতে নামাইয়া তাহাতে এক তোলা আন্দাজ মেটে সিন্দুর ফেলিয়া দিবে। ঐ তৈল প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া লাগাইতে হয়। এই তৈল গরলের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। গরলের পক্ষে এই তৈল অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্বেত আপাঙ্গের শিকড়, মেটে সিন্দুর ও ২।৩টা টেংরা মাছের মাথা দিয়া ঐরূপ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। উহা নালীঘার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া লাগাইতে হয়। যে রকম ঘা হউক না কেন, প্রতিদিন নিমপাতা-সিদ্ধ জল ও সাবান দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক।

সরলা—মা তুমি সে দিন পয়লা বউকে কিসের ঔষধ দিলে?

বৃদ্ধা—আমাশার ঔষধ দিলাম। বুড়ি-গোপান নামে এক রকম গাছ পুষ্করিণীর ধারে ও লোকের বাড়ীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বুড়িগোপানের পাতা এবং কুলকুমরি ও ভূঁই কামড়ি নামে এক রকম লতানে গাছ আছে, তাহার পাতা চাকা চাকা ও ছোট ছোট। তাহার পাতা ও আমরুলের পাতা এবং তেঁতুল পাতা, এই কয় দ্রব্য একত্রে থেঁতো করিয়া বঁটি পোড়া করিয়া দিলাম।

সরলা—হাঁ মা! বঁটি পোড়া কি করিয়া করিতে হয়!

বৃদ্ধ—একখানা বঁটী আগুনে গরম করিতে দিতে হয়। যখন বঁটিখানা খুব গরম হইবে, তখন উহা আগুন হইতে লইয়া একটা বাটী বা অন্য কোন পাত্রের উপর রাখিতে হয়। পরে সেই পাতাগুলি উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া ঐ উত্তপ্ত বঁটীর উপর তাহার রস ঢালিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে রস বঁটী হইতে সেই বাটীর উপর পড়িবে, ইহাতেই বঁটী পোড়া হইল। ঐ রস দুই তিন দিন খাইলেই আমাশা ভাল হইয়া থাকে।

সরলা—রক্তামাশয় হইলেও কি এই ঔষধ দিতে হয়?

বৃদ্ধা—হাঁ! এই ঔষধই বটে, তবে রক্তামাশাতে বঁটি পোড়া করিয়া দেওয়া উচিত নয়; অমনি রস খাইলেই হইল। জামপাতার রস ও ছাগদুগ্ধ রক্তামাশায়

বিশেস উপকারী। পেটের পীড়ায় বেল-পোড়া যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নয়। যেমন পেটের পীড়া হউক না, বেল-পোড়ায় তাহা আরোগ্য হইবে। শিশু-দিগকে বেল-পোড়া খাওয়ান যায় না, তাহাদিগকে বেলসুঁটা দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুধ খাওয়াইতে হয়।

সরলা বেলের মোরব্বা কি বেল-পোড়ার ন্যায় উপকারী নয়?

বৃদ্ধ—না, বেল-পোড়ই অধিক উপকারী। বেল-পোড়া খেজুরের গুড় বা মিছরির সহিত খাইলে এক দিনেই পেটের পীড়ার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। কুর্চির ছালও রক্তামাশার অব্যর্থ ঔষধ। পাঁচ সের জল দিয়া কতকগুলি কুর্চির ছাল সিদ্ধ করিয়া যখন ১ সের জল থাকিবে, তখন নামাইতে হয়। পরে এক তোলা কালজিরে ও এক তোলা মৌরী ভাজিয়া তাহাতে ১৪টি পুরিয়া করিয়া প্রতিদিন প্রাতে এক পুরিয়া ও সন্ধ্যায় এক পুরিয়া, ১ ছটাক কুর্চির জলের সহিত খাইলে অতি শীঘ্র পীড়া আরোগ্য হয়।

সরলা। মা! আমার সইয়ের খোকার বড় সর্দ্দি কাশি হইয়াছে, সই একটু ঔষধ চাহিয়াছে। হাঁ মা! তাহাকে কি ঔষধ দিবে?

বৃদ্ধা। তোমার সইকে বলিও একটু ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত খাওয়াইলেই খোকা ভাল হইবে। আর দুধের সহিত যেন একটু গাওয়া ঘৃত খাওয়ান হয়। ছেলেদের পক্ষে এই ঔষধ অতি উপকারী।

সরলা। মা! শিশুদের পক্ষে তো এই ঔষধ ভাল, বয়ঃস্থদের কি ঔষধ দেওয়া উচিত?

বৃদ্ধা। বয়ঃস্থদের এক তোলা যৈষ্ঠি-মধু, এক তোলা মরিচ ও ৪ তোলা মিছরি, একত্রে এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ঐ জল এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া বেশ গরম গরম খাইলে অতি শীঘ্র কাশি আরোগ্য হইয়া থাকে। বালকদিগকে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ দেওয়া কর্ত্তব্য। গরম ঘৃতের অথবা গরম দুগ্ধের সহিত মরিচের গুঁড়া খাইলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। গরম ঘৃতে আদার রস ও পাতি-লেবুর রস দিয়া খাইলে ২।৩ দিনেই কাশির উপকার হয়।

সরলা। ইহা তো জল কাশির ঔষধ, হাঁপানি কাশি হইলে কি ইহাতে আরোগ্য হয়?

বৃদ্ধা। হাঁপানি কাশি হইলে ধুতুরা গাছের শিকড়, ছাল ও পাতা একত্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ কলিকায় সাজিয়া উহার ধূম পান করিলে হাঁপানি কাশির আশু প্রতিকার হইয়া থাকে।

স্বামি-ভক্তি।

(পয়ার ও মিশ্র ত্রিপদী।)

(১)

শুন মন দিয়া, ওগো কুলনারীগণ,
ভক্তিভাবে কর পূজা স্বামীর চরণ।
যে পদে থাকিলে ভক্তি, অন্তিমে পাইবে মুক্তি,
হইবে বৈকুণ্ঠে স্থিতি, সুখের ভবন,
এই তো শাস্ত্রের বিধি, কহে মুনিগণ।

(২)

কাশী গয়া কত তীর্থ করিছ ভ্রমণ,
সর্ব্ব তীর্থ সার জেনো স্বামীর চরণ।
জপি গুরুদত্ত মন্ত্র, শুদ্ধ হয় দেহ-যন্ত্র,
স্বামি-ভক্তি-পরায়ণ, হয় যদি মন,
নহিলে সকলি বৃথা অসার জীবন।

(৩)

তাই বলি এস সবে হয়ে একমন,
ভক্তি পুষ্প দিয়া করি সে পদ অর্চ্চন।
সে পদে থাকিলে মতি, ধর্ম্মরাজ তুষ্ট অতি,
ফিরে পায় মৃত পতি, বিধির ঘটন।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড় সাবিত্রী কথন।

(৪)

স্বামিপদ ধ্যানে হয় শরীর শোধন।
সে পদে, রাখিলে মন ডরেন শমন।
সে ভক্তি পরম ধর্ম্ম, কে বুঝে তাহার মর্ম্ম,
সে পদ পরম ধন, মোরা অকিঞ্চন।
উহা বিনা বৃথা যেন রমণীজীবন।

(৫)

সেবি স্বামি পাদপদ্ম কাটাও জীবন।
সুকীর্ত্তি রাখহ ভবে লভ দিব্য জ্ঞান।
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, সীতা, ভারতের শ্রেষ্ঠ সুতা,
দময়ন্তী পতিব্রতা, কুলনারীগণ;
জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ বিদিত ভুবন।

(৬)

স্বামী হতে পুত্রধন, অমূল্য রতন।
যে মুখ দেখিলে ঘুচে নরকদর্শন।
নমি আমি পিতামাতা, অবলার জন্মদাতা,
প্রণমি কুলদেবতা, যত গুরুজন,
কর আশীর্ব্বাদ—থাকে স্বামিপদে মন।

(৭)

সাবধান মন মাঝি হওরে এক্ষণে।
দিওনা ধর্ম্মের ভেলা অকূল তুফানে।
মোহ কুজ্ঝটিকায়, ঘেরিয়াছে সমুদায়,
বিষম হইল দায় তরিব কেমনে।
এই চিন্তা সদা জাগে সতীদের মনে॥

(৮)

মণি মুক্তা আদি যত ঐশ্বর্য্য অপার।
মায়ামুগ্ধ মন! জেন সকলি অসার॥
এ দেহ অনিত্য হায়! কিছু নাহি সঙ্গে যায়,
নিশার স্বপন প্রায়, সকলি অসার।
ভবের কাণ্ডারী সেই ধর্ম্ম—কর্ণধার॥

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী রায় চৌধুরী।

প্রার্থনা।

যেন আজি প্রাণ মোর মেঘখণ্ড প্রায়,
সুদূরে তোমারি পানে উড়ে যেতে চায়।
মেঘেতে পড়েছে ওই সোণার কিরণ,
পেয়ে আলো ঝলসিছে জলদ কেমন।
তেমনি এ প্রাণে মোর জ্যোতির আধার,
ঢালো গো বিশ্বাস-আলো তুমি অনিবার।
সাধ মনে কুসুমের সুরভির মত,
করিব বন্দনা দেব তোমা অবিরত।

নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মোর দয়াময় হরি,
জাগিছে তোমার শত করুণালহরী।
অতি ক্ষুদ্র তবু প্রাণে জাগে কত আশা,
কখন না তৃপ্ত হয় অতৃপ্ত পিপাসা।
তোমারে পাইতে সাধ, পাইব কি করে,
কি করে রাখিব বাঁধি বিশ্বাসের ডরে ?
শয়নে স্বপনে থাকি কিম্বা জাগরণে,
সর্ব্ব কাজে সর্ব্ব ভাবে তুমি থাক মনে।

মৃত্যু বিষয়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ।

(আখ্যায়িকা)

একদা জনৈক রমণী তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে অভিভূতা হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের জীবন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিলেন "যদি তুমি কিছু শ্বেতসর্ষপ আনিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার পুত্রকে পুনর্জীবিত করিব। কিন্তু যে গৃহে কাহারও মৃত্যু হয় নাই, এমন গৃহস্থের নিকট হইতে ঐ দ্রব্য আনিবে।" রমণী পুত্রশোকে অধীরা, সুতরাং তাহাই স্বীকার করিলেন। তাঁহার নিজ গ্রামে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। সকলেই শ্বেত সর্ষপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু দান সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যেরূপ আদেশ ছিল, তদ্বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিলেন। কেহ বলিলেন "তোমার ন্যায় আমারও একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে," কেহ বলিলেন—"আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ক্ষেত্রের শস্য সকল শস্যাগারে সংগ্রহ করিবারও সময় পান নাই"।

এইরূপ নানাপ্রকার আপত্তি শ্রবণ করিয়া পুত্রহীনা রমণী বুদ্ধদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন "এই জগৎ মৃত্যুর ভূমি, এখানে অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ, সে নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। কর্ম্মফলই সত্য। আমরা এই জগতেই কেবল নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী নহি। আমরা কেবল

ইহ জীবনের কর্ম্মফলই যে ভোগ করি তাহা নহে। বায়ুবাহিত রেণুকণাকে একটী ফুৎকার কর, কোথা গিয়া তাহা উপনীত হইবে, কে জানে? সমুদ্রে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর, তদুৎপন্ন তরঙ্গ কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? জন্ম দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, পীড়া দুঃখ, ঘৃণিত বস্তুর সহিত সংযোগ দুঃখ, অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় দুঃখ, পঞ্চ ভূতের অধীনতা দুঃখ। সুখের জন্য পিপাসা দুঃখের কারণ, পুনর্জ্জন্ম প্রার্থনা দুঃখের কারণ, সম্পদলাভের বাসনা দুঃখের কারণ। এই দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি বাসনা নিবৃত্তি, কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে বিনাশ ও ধ্যান প্রভৃতি কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশ।

খৃষ্টধর্ম্ম-গুরু যিশুখৃষ্ট অনেক সময় দৃষ্টান্ত দ্বারা মহা মহা উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। তিনি এক সময় বলিলেন—"কোনও কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে গেল। সে যখন বপন করিল, কতক বীজ পথের ধারে আসিয়া পড়িল, তাহা পক্ষীরা ভক্ষণ করিল। কতকগুলি ভূমিতে পড়িল, সেখানে অল্প মাটি ছিল, অঙ্কুর শীঘ্র উৎপন্ন হইল। কিন্তু সূর্য্যোত্তাপে সেগুলি ঝলসিয়া গেল। তাহাদের শিকড় জন্মে নাই, সুতরাং অঙ্কুরে শুকাইয়া গেল। কতকগুলি বীজ কণ্টক বনে পড়িল এবং কণ্টক গাছ বাড়িয়া তাহাদিগকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। কিন্তু কতকগুলি বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল এবং তাহা হইতে বৃক্ষসকল জন্মিয়া ফল উৎপাদন করিল। কোন বৃক্ষে শতগুণ, কোন বৃক্ষে ষাটিগুণ ও কোন বৃক্ষে ত্রিশ গুণ ফল ফলিল।" তিনি শিষ্যদিগকে গোপনে ডাকিয়া ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। সেই অর্থ এই—স্বর্গরাজ্যের কথা যখন কোনও ব্যক্তি শুনিয়া বোধগম্য না করে, তখন তাহার অন্তঃকরণে উপ্ত বীজ সয়তান আসিয়া কাড়িয়া লইয়া যায়। যে ব্যক্তি পথের ধারে পতিত বীজের ন্যায় উপদেশ পাইল, তাহারও এইরূপ। প্রস্তরময় ভূমিতে যে ব্যক্তি বীজ পাইল, সে উপদেশবাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল না। এই জন্য ধর্ম্মের জন্য যখনই তাড়না বা উৎপীড়ন উপস্থিত হইল, তখনই সে ধর্ম্মে স্থির থাকিতে পারিল না, বিরক্ত হইয়া তাহা ছাড়িয়া দিল। যে ব্যক্তি কণ্টকের মধ্যে বীজ পাইল, সে উপদেশ শুনিল, কিন্তু সংসারের ভাবনা চিন্তা এবং অর্থের মায়াতে ধর্ম্মের অঙ্কুর বাড়িল না এবং

তাহা হইতে কোনও ফল উৎপন্ন হইল না। কিন্তু উত্তম ভূমিতে উপ্ত বীজ কে পাইল? যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল, তাহারই হৃদয়ে ইহার ফল ফলিল—কোথায়ও শতগুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও ত্রিশ গুণ ফলিল। (Mathew)।

আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কার-কর্ত্তা

Dr. Latouche Treville "La Revine" নামক সংবাদপত্রে উপরোক্ত শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, জাপান হইতে কালিফোর্ণিয়ায় আগত প্রাচীন বৌদ্ধভিক্ষুগণই আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারকর্ত্তা এবং ঐ প্রদেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি বলেন যে, বেরিং প্রণালীর সন্নিকটবর্ত্তী কামস্কট্কা হইতে আলাস্কা পর্য্যন্ত যে পথ আছে, তাহা তখন যাতায়াতের উপযুক্ত ছিল। তিনি শারীরিক, পারিবারিক এবং ভাষাগত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জাপানীয় ভিক্ষুগণ আলাস্কা এবং মেক্সিকোর অন্তর্ব্বর্ত্তী সমগ্র উত্তর আমেরিকার সৈকত ভূমির অপরান্ত পানামা যোজক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, মেক্সিকোবাসীদিগের পৌরাণিক কাহিনীতে ইহাই সুনিশ্চিতরূপে প্রকাশ যে, তদানীন্তন মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে বক্তৃতা দ্বারা প্রচারের পদ্ধতি ছিল। মঙ্গোলীয় জাতীয় শ্বেতাঙ্গগণ শুভ্র লম্ব পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জনসাধারণসমীপে সুস্পষ্ট ভাষায় শান্তি, আত্মসংযম, পরার্থপরতা এবং ধর্ম্মপরায়ণতা প্রচার করিতেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার মানসে উল্লিখিত সংবাদপত্রে চীনদেশীয় দেবমূর্ত্তির অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য সম্বলিত আজটেক (Aztec) দিগের কতক-গুলি দেবমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি শব্দশাস্ত্রগত সৌসাদৃশ্যও প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—গৌতম (বুদ্ধদেবের একটি আখ্যা) শব্দের সাদৃশ্য গৌতেমালা (Gautemala),হুয়াতামো (Huatamo), এবং গৌতেমেজিন (Gautimazin) শব্দে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বুদ্ধের অপর অভিধেয় শাক্যমুনি শব্দটি ওয়াক্সাকা (Oaxaca), জাকাতেকাস (Zacatecus) এবং জাকাতেকোকুলা (Zacatakokula) শব্দে লক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি কহিয়াছেন যে, ভল্টেয়ারের (Valtaire) ন্যায় সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিও এই সকল ঐক্যতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইবেন এবং ইহাদিগকে আকস্মিক সাদৃশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। তিনি

বলেন যে, মেক্সিকোবাসীদিগের স্থপতি বিদ্যা দেখিলে উহাকে আসিয়ার স্থপতির অনুরূপ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ইউকাটানের (Yucaton) অন্তর্বর্ত্তী চম্পেক (Champece) নগরস্থ রাজকীয় বসনমণ্ডিত বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তিগুলি এবং আজটেক (Aztec) দেশীয় বরাননশোভিত দেবমূর্ত্তি সমূহ অবলোকন করিলে উহাদিগকে প্রাচ্য দেশীয় প্রতিমূর্ত্তির প্রকৃত অনুকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লেখক এই বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছেন যে, সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধভিক্ষুগণই আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারকর্ত্তা। ১৪৯২ খৃঃ অব্দের ১১ই অক্টোবরের নিশাভাগে স্পেনরাজের কর্ম্মচারিরূপে জিনোয়ানিবাসী (Genoese) নাবিক কলম্বস্ তাঁহার উচ্চ পোতপৃষ্ঠ হইতে যে ভূমি অবলোকন করেন এবং পরিশেষে যাহাতে পদার্পণ করিয়া তাহাকে স্যান্ স্যালভেডর (San Salvad[illegible] আখ্যায় আখ্যাত করেন, জাপানের বৌদ্ধভিক্ষুগণ দশ শতাব্দী পূর্ব্বে সেই ভূমি আবিষ্কার করেন।

জীবন-চক্র।

(১৩১৩ সালের চৈত্র সংখ্যার ৩৮১ পৃষ্ঠার পর।)

আমরা পূর্ব্বে বিশ্বচক্রের সহিত জীবন চক্রের প্রসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দিতে পারি নাই এবং যে চক্রের প্রতিকৃতি দিয়াছিলাম, তাহারও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় নাই। এই অভাব পরিপূরণের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যগণ জীবনকে চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছেন।—

(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বানপ্রস্থ, ও (৪) ভিক্ষু। চারি আশ্রমই ধর্ম্ম লইয়া এবং ধর্ম্মোপার্জ্জনই ইহাদের চরম উদ্দেশ্য। প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া জীবনের ভিত্তি সংগঠিত করিতে হয়। ইহার জন্য আহার শ্রম ও বিশ্রাম আবশ্যক, কিন্তু সকলই পরিমিত ও সংযত ভাবে করিতে হইবে। এই জন্য নিষেধ ও বিধির প্রয়োজন। এই সঙ্গে ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, নানাপ্রকার বৃত্তি ব্যবসায় শিক্ষা এবং ন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জনও হইতে পারে। আমাদের চিত্রে ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আটটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের সময় যদি প্রথম ২৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়, এই সময়ের মধ্যে এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইতে পারে এবং এইরূপ প্রারম্ভিক কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের সম্পূর্ণ যোগ্য হয়। যাঁহারা আমরণ ব্রহ্মচারী

হইয়া থাকিতে চান, এই কার্য্যেই তাঁহারা জীবন অবসান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনের মূলে ও অন্তে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আবশ্যক। গার্হস্থ্য জীবনের সহিত ৯টি ঘর আছে। প্রাচীন কালে বিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষে পঞ্চযজ্ঞ-দৈনিক কর্ত্তব্য বলিয়া অবশ্য অনুষ্ঠেয় ছিল। দেবযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা, পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ, ঋষিযজ্ঞ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা, নৃযজ্ঞ দ্বারা অতিথি অভ্যাগত সেবা এবং ভূত যজ্ঞ দ্বারা জীবের প্রতি দয়া সম্পন্ন হইত।

বর্ত্তমান সময়ে এ সকলও পালনীয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে দেশের সেবা এবং বিশ্ব-সেবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন হিন্দুরা পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ২৫ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহ-ধর্ম্ম সাধন অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনদিগকে পালন করিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লওয়া উচিত। তাহার পর বনে প্রস্থান বা নির্জ্জনে বাস করিয়া ব্রহ্মের সহিত আত্মার যোগ সাধন কর্ত্তব্য। এই সাধনের পরিণাম ব্রহ্মে সমাধি, অর্থাৎ আপনার কামনা ও বাসনা সমুদয় পরিবর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরেতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ২৫ বৎসর কাল এই মহাসাধনায় ব্যয় করা কিছু অধিক নহে।

জীবনের শেষ অবস্থা ভিক্ষুর অবস্থা। এ অবস্থায় মানব সমাধিস্থ যোগী হইয়া সর্ব্বত্র অবস্থান করিবেন, সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং যথা ইচ্ছা ভ্রমণেরও যোগ্য হইবেন। মানুষ ঈশ্বরে তদ্গত হইয়া যদি জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহারি প্রেরণায় জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মনুষ্যজন্ম ধারণ সার্থক হয়। তিনি ঈশ্বরে ক্রীড়া করেন, ঈশ্বরে রমণ করেন এবং তাঁহারি ভাবে পূর্ণ হইয়া জীবনের সকল কার্য্য সমাধান করেন। এইরূপ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। পরিপক্ক ফল যেমন বৃন্ত হইতে স্খলিত হইয়া পৃথিবীর ক্রোড়ে পতিত হয়, তিনিও সেইরূপ দেহ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বর-ক্রোড়ে স্থান লাভ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

ম্যাট্রিকুলেশন।

এ বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ২৪৭৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১৫৬০ ও তৃতীয় বিভাগে ২১০ জন, মোট ৪২৪৮ জন ছাত্র ও ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বালিকাগণ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রথম বিভাগ।

বিভাময়ী বসু—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়।
স্নেহলতা বসু—ইউ, এফ, সি, স্কটলণ্ড বালিকা-বিদ্যালয়।
অমিয়া দাস—ঢাকা, ইডেন ফিমেল স্কুল।
শান্তি দত্ত—লোরেটো হাউস।
লীলা চৌধুরী—লোরেটো হাউস।
হিমানী দাস গুপ্তা—ফিমেল হাই স্কুল, বাঁকীপুর।
লাবণ্যপ্রভা দত্ত—আলেকজাণ্ড্রা গার্লস্ স্কুল, ময়মনসিং।
মলিনা মিত্র—বেথুন কলেজ।
নিশাবালা নায়ক—এল, এম, এস, গার্লস্ স্কুল, ভবানীপুর।
অমরবালা পাল—ফিমেল স্কুল, বাঁকীপুর।
পাইরেস ব্লান্সি পাত্র—লোরেটো হাউস।
চারুশীলা রায়—ইডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।
নয়নতারা রায়ন—ডায়োসেসেন কলেজ।
কিরণময়ী মজুমদার—রাভেন্সা বালিকা বিদ্যালয়, কটক।
কমলা নাগ—আলেকজাণ্ড্রা গার্লস্ স্কুল, ময়মনসিং।
মিম্রিলেন রায়—লোরেটো হাউস।
হিরণ্ময়ী সেন—প্রাইভেট্।
নলিনীবালা সিংহ—ডায়োসেসেন কলেজ
সুদক্ষিণা সিংহ—ফ্রিচার্চ্চ গার্লস স্কুল।
সুষমা সিংহ রায়—বেথুন কলেজ।
লিলি সরলা সরকার—ডায়োসেসেন কলেজ

দ্বিতীয় বিভাগ।

অলিভ আইভি আঢ্য—ডায়োসেসেন কলেজ।
কনষ্টান্স প্রিয়বালা ব্যানার্জ্জি—ডায়োসেসেন কলেজ।
ভার্জ্জিনীয়া চারুলতা ব্যানার্জ্জি— ঐ
ষ্টেলা ব্যাপ্টিষ্ট—প্রাইভেট।
সান্ত্বনা চক্রবর্ত্তী—ঢাকা ফিমেল স্কুল।
সরযূবালা দত্ত—প্রাইভেট, কলিকাতা।
মুক্তপ্রভা ঘোষ—ডাওসেসেন কলেজ।
লতিকা সেন—ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়।
স্নেহলতা সোম—স্কটিস্ বালিকা বিদ্যালয়।

ইণ্টারমিডিয়েট।

প্রথম বিভাগ।

সিভিল ওয়েব্—প্রাইভেট্।
নিলহেলমিনা নাথানেল—ডাওসেসেন।
ইসোলিন অকিম—প্রাইভেট্।
লুসী লাইট—প্রাইভেট।
আইরিন মিত্র—ডাওসেসেন কলেজ।
আশালতা সেন—বেথুন কলেজ।
ইসাবেল মানুয়েল—প্রাইভেট।
সোফিয়া কুইজি—বেথুন কলেজ।
ক্ষেমদা রায়—বেথুন কলেজ।
বারণী হিউজস্—প্রাইভেট।
ষ্টেলা বসু—প্রাইভেট।
সরোজিনী দত্ত—প্রাইভেট্।
সুরমা বিশ্বাস—ডায়োসেসেন কলেজ।
ম্যাক্‌সোলড্রিক এলিন—বেথুন কলেজ।
শৈলজা চৌধুরী—প্রাইভেট্।

দ্বিতীয় বিভাগ।

সুশীলাবালা বাগচি—ডায়োসেসেন।
হেমনলিনী বসু—প্রাইভেট।
সরোজবালা বসু— ,, ঢাকা।
সুবর্ণপ্রভা দত্ত—বেথুন কলেজ।

লাবণ্যবালা ঘোষ—বেথুন কলেজ।

ক্লারিস গার্ট্রুড রাহা—ডায়োসেসেন

তেজোময়ী সরকার—বেথুন কলেজ।

বি, এ, পরীক্ষা।

প্রথম বিভাগ।

ইংরাজী সাহিত্যে অনার।

রেজিনা গুহ—প্রাইভেট।

দ্বিতীয় বিভাগ।

ইংরাজী সাহিত্যে অনার।

এঞ্জিলিনা গুহ—প্রাইভেট।

সম্মানের সহিত পাস।

মৃণালিনী বসু—বেথুন কলেজ।

জেভিয়ার ব্লেয়ার—প্রাইভেট।

ষ্টেলী ডি—প্রাইভেট।

হর্ষবালা বিশ্বাস—বেথুন কলেজ।

নগেন্দ্রবালা দে— „ „

লাভডে মার্গারেট লাবণ্যলতা—ডায়োসেসন কলেজ।

নির্ম্মলাবালা নায়ক—বেথুন কলেজ।

প্রভাসনলিনী সোম—ডায়োসেসন কলেজ।

দূর্ব্বার চটি।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

আমি কে আপনারা বলিতে পারেন? আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি। আমি বহুকাল হইতে এই ভাবে এইখানে পড়িয়া আছি। আমি শাল, পিয়াল, তমাল, কিছুই নহি। আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি। আমি অভ্রভেদী উন্নত মস্তক বিপুলকায় তরুরাজির মধ্যে কেহ নহি, আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি মাত্র। আমি তাহাদিগের বংশধর বলিয়া কখনও জগৎসমক্ষে পরিচয় দিতে পারি না, তাহারাও তাহাদিগের একজন বলিয়া আমাকে কখনও গ্রহণ করে না বা জনসমাজে পরিচয় দেয় না। কেনই বা দিবে? আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি ভিন্ন আর কিছুই নহি। আমার হাড়ে কখনও ত ভেল্কি খেলে না, কেনই বা তরুবর আমাকে তাহার সমকক্ষ হইতে দিবে? আমার হাড়ে ত কখনও রেলগাড়ী হয় না, নিমেষের মধ্যে আমি কাহাকে দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতে পারি না, কেনই বা তরুবর আমাকে তাহার সমান হইতে দিবে? আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি, বহুকাল হইতে এখানে সামান্য অবস্থায় পড়িয়া আছি। আমার অস্থিতে বড় বড় বাণিজ্য বা যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত হয় না, আমি তাহাদিগের ন্যায় পর্ব্বতপ্রমাণ বড় বড় ঢেউ কাটিয়া চলিয়া যাইতে পারি না, অযুত সৈন্যঠাট বক্ষে ধারণ করিয়া রিপুকুলের সহিত আহবে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তবে শাল, পিয়াল, তমাল কেনই বা আমাকে তাহাদের মধ্যে গণ্য করিবে?

আমি অতি সামান্য দূর্ব্বার চটি, এইখানেই পড়িয়া আছি। আমাকে অবলম্বন করিয়া রাজন্যবর্গ জলযুদ্ধে বা স্থলযুদ্ধে কখনও বিপক্ষের জীবন নষ্ট করেন না, কখনও স্বামী বধ করিয়া পত্নীকে বিধবা করেন না, কখনও পিতাকে বধ করিয়া পুত্র কন্যাকে পিতৃহীন করেন না, কখনও ভ্রাতাকে বধ করিয়া ভাইভগ্নীকে ভ্রাতৃ-হীন করেন না। কেহ আমার জন্য মর্ম্মা-হত হইয়া চক্ষের জলে ভাসে না। আমি কখনও কাহারও মন্দ করি না। আমার হাড়ে বন্দুকের বাঁট, কামানের গাড়ি, বর্ষা প্রভৃতি কিছুই প্রস্তুত হয় না, আমি মানব বা পশু বধের কোন সাহায্য করি না। আমার কোন বংশমর্য্যাদা, বড় নাম ডাক, বড় লোকের নিকট সমাদর, প্রভৃতি কিছুই নাই। আমি সামান্য, হেয় দুর্ব্বার চটি, এইখানেই পড়িয়া আছি। আমার সম্মান নিরীহ গাভীকুলের নিকট ; কারণ তাহারা আমার উপর চরিয়া বেড়ায় ও আমাকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। আর আমার আদর অবলা হিন্দুকুলবালা-দিগের নিকট ; কারণ তাহারা আমাকে দেবসেবায় প্রয়োগ করিয়া সমাদর করে।

নানা পল্লবসমন্বিত কত উন্নত শাল, পিয়াল, তমাল প্রবল ঝটিকার সহিত যুদ্ধ করিয়া ভূপতিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি সামান্য দুর্ব্বার চটি, অতি নম্রভাবে এইখানে পড়িয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। কত রাজা রাজড়ার লক্ষ লক্ষ সৈন্য সামন্ত স্ফীতবক্ষে গর্ব্বিতমস্তকে আমার উপর দিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল, তাহাদিগের নিকাশিত সুতীক্ষ্ণ তরবারি সকল এবং রাজাদিগের মুকুটস্থিত হীরক-খণ্ড সকল সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিল। কত বিবিধবর্ণ বিচিত্র পতাকা পবন-হিল্লোলে পত্ পত্ করিয়া উড়িল, অশ্বের হ্রেষারব এবং মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল চমকিত করিল, সৈন্যদিগের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল, যুদ্ধে কত-শত প্রাণ বিনষ্ট হইল, রুধিরস্রোতে ধরা ভাসিয়া গেল, কত রাজার নাম ও রাজ্য পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইল, কিন্তু আমি সামান্য দূর্ব্বার চটি, এইখানে সেই একভাবেই পড়িয়া আছি। আমার উত্থান পতন কিছুই নাই, সেই একই ভাবে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি। আমার উপর দিয়া কত বড় ঝটিকা, কত সৈন্য সামন্ত, কত পশু মানব চলিয়া গেল, আমাকে পদদলিত করিল, তবুও আমি বিনষ্ট হই নাই, সেই একই ভাবে বাঁচিয়া আছি। আমার জীবনে আর কিছু হউক আর নাই হউক, আমি যে শষ্পভোজী-দিগের উপকারে আসি ও দেবসেবায় লাগি এই আমার জীবনের সার্থকতা, আমি আর কিছুই চাহি না।

মানুষ মরিয়া যায়, পশু মরিয়া যায়, পক্ষী মরিয়া যায়; সকলেই আমার আশ্রিত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়। আমি সকলকে চরমকালে আশ্রয় দিই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই আমাকে পদ-দলিত করিতে ছাড়ে না!

পরশ মণি।

পূর্ব্বকালে রত্নদাস নামে এক ধনী রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল, কন্যাটীর রং চাঁপাফুলের মত ছিল বলিয়া রাজা তাহাকে চাঁপা বলিয়া ডাকিতেন।

বাস্তবিক রাজা রত্নদাস রত্নেরই দাস ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বর্ণের অধিক আদর করিতেন। তিনি আপনার সোণার রাজমুকুট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন। যদি তিনি আর কিছু ভাল বাসিতেন, তাহা তাঁহার সেই আদরের মেয়েটী। চাঁপা তাহার পিতার পাদপীঠের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইত। কিন্তু রাজা রত্নদাস যতই কন্যাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ধনলালসা বাড়িতে লাগিল।

তিনি ভাবিতেন যে, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি যে সকল স্তূপীকৃত স্বর্ণরাশি সঞ্চিত আছে, যদি তাহার দ্বারা প্রিয়তমা কন্যাকে ভূষিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কতই সুখী হইতাম। তিনি এই উদ্দেশে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। যদি তিনি কখনও স্বর্ণবর্ণ-সূর্য্য-কিরণাবৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে ভাবিতেন যদি এই সকল যথার্থই সুবর্ণমণ্ডিত হইত, এবং উহাদিগকে আমার লৌহসিন্দুকের মধ্যে স্থাপিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি কতই সুখী হইতাম। যখন চাঁপা যুথী কিম্বা চামেলী ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার নিকট আসিত, তখন রাজা রত্নদাস বলিতেন, "হায়, যদি এই সকল পুষ্প প্রকৃতই স্বর্ণময় হইত তাহা হইলে এই গুলি চয়নোপযোগী হইত।"

এই ধনোন্মত্ততা জন্মিবার পূর্ব্বে রাজা রত্নদাস পুষ্পপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং তিনি একটি পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ উদ্যানে মনোহর সৌরভময় গোলাপ, বেল, মল্লিকা, মালতী ইত্যাদি নানাবিধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইত।

যখন রাজা রত্নদাস উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন, ঐ কুসুমরাজির সুরভি গন্ধে আমোদিত হইতেন। এখনও তাহারা ঐরূপ সুবাস বিতরণ করিত। কিন্তু এখন তিনি এই ভাবিয়া উদ্যানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন যে, যদি এই সকল পুষ্প স্বর্ণনির্ম্মিত হইত, তবে এই উদ্যান কতই মূল্যবান্ হইত। রত্নদাস অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু এখন স্বর্ণমুদ্রার ঝন্ ঝন্ শব্দই তাঁহার অধিক ভাল লাগিত।

অবশেষে রাজা রত্নদাস এতই বিচারমূঢ় হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যে বস্তু স্বর্ণনির্ম্মিত না হইত, তাহা স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। তিনি প্রায়ই মৃত্তিকার নিম্নে অন্ধকারাবৃত গৃহে দিবা-

ভাগের অধিকাংশ যাপন করিতেন। এই গৃহে তাঁহার ধনরত্নাদি রক্ষিত হইত। যখন তিনি আনন্দ অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন ঐ গৃহে যাইতেন, এবং সাবধানে তালাবন্ধ করিয়া বহুযত্নসঞ্চিত স্বর্ণস্তূপ দেখিয়া সুখী হইতেন। সেই গৃহের প্রাচীরে একটি ছিদ্র দিয়া ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিত। তিনি তৃষিতনয়নে সেই আলোকে তাঁহার অগাধ সুবর্ণরাশি নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হইতেন।

এই অবস্থায় রাজা আপনাকে সুখী মনে করিতেন। তথাপি তিনি ভাবিতেন "আমি যতদূর সুখী হইতে পারি, এখনও ততদূর হই নাই। যদি সমস্ত জগৎ আমার কোষাগার না হয় এবং তাহা স্বর্ণদ্বারা পরিপূর্ণ না হয়, তবে আমার ভোগাভিলাষের আশা উচ্চ হইতে পারে না।"

একদিন রাজা রত্নদাস তাঁহার ধনাগারে অবস্থিতি করিতেছিলেন এমন সময়ে সূর্য্যরশ্মি-রঞ্জিত একজন রক্তবর্ণ যুবাপুরুষকে দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। আগন্তুকের মূর্ত্তি সূর্য্যরশ্মি প্রতিরোধ করিলেও তদীয় সহাস্য আননের উজ্জ্বল আভায় গৃহকোণ অধিকতর আলোকিত হইয়া উঠিল।

রত্নদাস যখন সবিস্ময়ে দেখিলেন, গৃহে তালা বন্ধ আছে, কোন মানুষের গৃহে প্রবেশলাভ করিবার সাধ্য নাই, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, আগন্তুক দৈবশক্তিসম্পন্ন হইবেন। বোধ হয়, তিনি যে যক্ষরাজ কুবের, তাহাও তিনি অনুমান করিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা ইহলোকে আগমন করিয়া ছদ্মবেশে মনুষ্যের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। রাজা রত্নদাসও পূর্ব্বে এইরূপ দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। সুতরাং পুনরায় সাক্ষাতে ভীত হইলেন না। আগন্তুকের মূর্ত্তি এমনি সদয় ও সদ্ভাবপূর্ণ ছিল যে, তাহা হইতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা হইল না। বরং বোধ হইল যেন তিনি রত্নদাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই রত্নদাসের ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে পারেন।

যক্ষরাজ উজ্জ্বল হাস্যে সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়া রত্নদাসের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—"রাজন্, তুমি একজন ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি, তুমি এই গৃহে যত স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিয়াছ, এই পৃথিবীতে আর কোথাও তত আছে কিনা সন্দেহ।"

রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার অনুগ্রহে কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু যখন মনে করি যে, ইহা সংগ্রহ করিতে আমার প্রায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তখন ইহা তুচ্ছ জ্ঞান হয়, বোধ করি, যদি কেহ পৃথিবীতে সহস্র বৎসর বাঁচে, তবে তিনি ধনী হইতে পারেন।"

যক্ষরাজ বলিলেন, "তবে তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট নও?"

রাজা মাথা নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

যক্ষরাজ বলিলেন, "বল, তুমি কিসে সন্তুষ্ট হও, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া নির্ণয় করিলেন যে, যক্ষরাজ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। এখন সম্ভব ও অসম্ভব যে কোন দ্রব্যই হউক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং রাজা তাঁহার কল্পনা-রাজ্যে পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় সুবর্ণরাশির উপর সুবর্ণরাশি পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার মনোমধ্যে একটি আশাপ্রদ কল্পনার উদয় হইল। বোধ হইল যেন এই কল্পনাটী তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণরাশির ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি ঊর্দ্ধনেত্রে যক্ষরাজের প্রতি চাহিলেন। যক্ষরাজ বলিলেন—"তুমি আর কি তৃপ্তিপ্রদ পদার্থ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে বল।" রাজা বলিলেন – "এই ধনরাশি সংগ্রহ করিতে আমাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এবং আমার শত চেষ্টার পরেও আমি ইহা অল্প বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমি ইচ্ছা করি যে, আমার স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দ্রব্য সুবর্ণ হয়"।

যক্ষরাজ বলিলেন, "তুমি কি স্পর্শ-মণির শক্তি প্রার্থনা করিতেছ? কিন্তু ঠিক করিয়া বল, ইহাতে তুমি কি আশানুরূপ সন্তোষ লাভ করিবে?"

রাজা উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়ই করিব।" যক্ষরাজ বলিলেন, "দেখ, ইহা প্রাপ্ত হইয়া তুমি তো কখন অনুতাপ করিবে না?"

রাজা বলিলেন,"কেন অনুতাপ করিব? আমাকে সম্পূর্ণ সুখী করিবার জিনিস ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।"

যক্ষরাজ বলিলেন, "তবে তথাস্তু"; কল্য প্রাতে সূর্য্যোদয় হইলে তুমি স্পর্শমণির ঐশী শক্তি লাভ করিবে।" এই বলিয়া যক্ষরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, এই গল্পটীর নাম 'পরশ-মণি' রাখিবার কারণ এই যে, স্পর্শমণির দ্বারা যেমন অন্য কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে তাহা সোণা হইয়া যায়, সেইরূপ কুবেরের বরে রাজা রত্নদাস যে জিনিস স্পর্শ করিবেন, তাহাই সোণা হইবে। স্পর্শমণি ও পরশমণি একই কথা।

কুবেরের বর পাইয়া রাজার রাত্রিতে ঘুম হইল কি না, আমরা জানি না। তবে তাঁহার মন নিতান্তই চঞ্চল হইল। প্রাতে উঠিয়া পুতুল পাইবার লোভে বালকের মন যেরূপ ব্যগ্র হয়, তাঁহার মনও স্পর্শমণির অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। দিনমণি উদয়শৈলশিখরে উদিত হইবার পূর্ব্বেই রাজা জাগ্রত হইলেন, এবং শয্যামধ্য হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া সমীপস্থ জিনিসগুলি স্পর্শ করিয়া স্পর্শ-মণির শক্তি তাঁহার হস্তগত হইল কি না পরীক্ষা করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র হইলেন।

নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ার এবং অন্যান্য অনেক দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখিলেন ঐ সকল দ্রব্য পূর্ব্বের ন্যায় রহিল, তখন তিনি বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, তিনি যক্ষরাজকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন, অথবা ঐ দিব্যমূর্ত্তি তাঁহাকে ছলনা করিয়াছে। পরে যখন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দুরাশা দূরীভূত হইয়া আশার উজ্জ্বল রশ্মি প্রতিভাত হইল, তখন তিনি আনন্দে অভিভূত হইলেন। যক্ষরাজের কৃপায় তিনি অভিমত দৈবশক্তি-সম্পন্ন হইলেন। তখন তিনি যে যে দ্রব্য স্পর্শ করিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণে পরিণত হইল। দেখিলেন, শয্যার আস্তরণ বিচিত্র স্বর্ণজালে জড়িত হইয়া উজ্জ্বল-আভাসম্পন্ন হইয়াছে। মশারির ঝালরগুলি স্বর্ণময় হইয়া রবি-কিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। তখন তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং গৃহস্থিত যে যে দ্রব্য স্পর্শ করিলেন, তাহা অচিরাৎ স্বর্ণময় দেখিলেন। টেবিলের উপরিস্থিত পুস্তকখানি স্পর্শ করিবামাত্র উহা সোণা হওয়ায় অক্ষরগুলি পড়িতে পারিলেন না। ব্যস্ত হইয়া পোষাক পরিধান করিতে করিতেই তিনি বহুমূল্য স্বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। পকেট হইতে চশমাখানি বাহির করিয়া নাকে বসাইয়া দেখিলেন যে, আর উহার ভিতর দিয়া কিছুই দেখা যায় না। কেমন করিয়াই বা যাইবে, চশমার স্বচ্ছ স্ফটিক এখন পীতাভ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, কোন বিশেষ বড় রকমের লাভ করিতে গেলে সামান্য একটু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। চশমা দিয়া না হয় নাই দেখিলাম, নিজের চক্ষু দিয়া যা দেখিতে পাই, তাহাতেই এক রকম চলিবে, আর চাঁপাও বড় হইয়া উঠিতেছে, ও আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারিবে।

মূঢ় রত্নদাস সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়া ভাবিলেন, আর গৃহের মধ্যে সঙ্কোচভাবে থাকিব না। এই ভাবিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দেখিলেন যে রেলীং স্পর্শ করিবামাত্র উহা উজ্জ্বল কাঞ্চনরূপ ধারণ করিল। ইহাতে তিনি অপার আনন্দ সাগরে ভাসিলেন। দ্রুতপদে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া গোলাপ, টগর, মল্লিকা, গন্ধরাজ, প্রভৃতি যে যে কুসুম, প্রস্ফুটিতই হউক আর কোরকই হউক, দেখিতে পাইলেন, তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্পর্শমাত্র কুসুম সকল রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। তাহাদের সুরভি গন্ধ বিনষ্ট হইল, এমন কি পুষ্পমধ্যে লুক্কায়িত মৌমাছি, কীট, পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত স্বর্ণকায় ধারণ করিল। তবুও রত্নদাস ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অনবরত ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া মনের সাধে পরশমণির শক্তি প্রয়োগ করিয়া অগাধ স্বর্ণরাশি সংগ্রহ করিলেন এবং ঐশ্বর্য্যে কুবেরকে পরাস্ত করিলাম ভাবিয়া মনে মনে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মধ্যাহ্নকাল

পর্য্যন্ত বিপুল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, তিনি প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ভৃত্যকে অবিলম্বে কিঞ্চিৎ আহার্য্য ও পানীয় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। সন্নিকটে রাজযোগ্য উপাদেয় সুখাদ্য দ্রব্য আনীত হইলে, তিনি চাঁপাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূর হইতে চাঁপা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে, শুনিয়া তাহাকে সুখী করিবার জন্য তিনি পরশমণির শক্তি প্রভাবে বাসনগুলি স্বর্ণময় করিয়া রাখিলেন। তৎপরে চাঁপা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে একটি সোণার গোলাপফুল দেখাইয়া রাজাকে কহিল, "বাবা দেখ, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বাগানের ফুলগুলি সব কেমন হইয়া গিয়াছে। এই দেখ গোলাপের আর সুগন্ধ নাই, ইহার শক্ত পাপড়ী কাঁটার মত আমার নাকে ফুটিতেছে। রাজা নিজে যে এ কাজটি করিয়াছেন, পাছে চাঁপা আরও দুঃখিত হয়, এই ভয়ে তাহা খুলিয়া বলিতে সাহস করিলেন না। পরে তিনি চাঁপাকে বলিলেন,"লক্ষ্মী মা,তুমি সামান্য ফুলের বদলে সোণার ফুল পাইলে, ইহাতে সুখী না হইয়া কাঁদিতেছ কেন। এস, দুইজনে মিলিয়া সোণার থালায় আহার করি।" এই বলিয়া দুগ্ধপান করিতে গেলেন, ওষ্ঠে লাগিবামাত্রই উহা অমনি তরল গলিত সোণা হইয়া গেল, তৎপরে শীঘ্রই ডেলা ডেলা হইয়া শক্ত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজা মহাভাবনায় পড়িলেন। চাঁপাও তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং পরীক্ষা করিবার জন্য একটি মিষ্টান্ন তুলিয়া যেই পিতার মুখের ভিতর দিতে গেল, অমনি তাঁহার ওষ্ঠস্পর্শমাত্রেই নিশ্চল সুবর্ণপ্রতিমায় পরিণত হইল। আর মুখে কথা নাই, যে ভাবে পিতার মুখের দিকে তাকাইয়াছিল, সেই ভাবেই রহিল। চোখে পলক নাই, অশ্রুবিন্দু সেই ভাবেই নেত্রকোণে সংলগ্ন রহিয়াছে। রত্নদাস ভয়ে ও দুঃখে কম্পিত হইয়া কন্যাকে ডাকিলেন "চাঁপা কথা কও"। সে চাঁপা নাই, উত্তর কে দিবে? তখন রাজা উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

রাজার আর্ত্তনাদ শ্রবণে অনুচরবর্গ চতুর্দ্দিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিল। রাজা তখন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। নিজের দুর্ব্বুদ্ধিজনিত ঘোর অনর্থপাত দর্শনে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হায় হতভাগ্য রত্নদাস! তুমি অর্থলুব্ধ হইয়া কি কুকর্ম্ম করিলে, তোমার যাবতীয় স্বর্ণ বিনিময়ে তুমি একগ্রাস অন্নও গলাধঃকরণ করিতে পারিলে না। তোমার একমাত্র স্নেহের ধন অন্ধের যষ্টি, জীবনের সম্বল প্রিয়তমা কন্যাটীও স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া নির্জীব নিঃস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, তুমি আর তাহার দিকে তাকাইতেও পারিতেছ না। এরূপভাবে তুমি আর কদিন বাঁচিবে? তোমার সেই অসংযত অর্থলালসার বিষময় ফল ফলিল। এইরূপ প্রবল শোকাবহ দুশ্চিন্তার তাড়নে তিনি মোহ প্রাপ্ত

হইলেন। তখন স্বপ্নাবেশে যক্ষরাজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অনিন্দ্য দিব্যমূর্ত্তি মৃদুহাস্য সহকারে ওষ্ঠদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রত্নদাস, ঈপ্সিত স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে তো?"

রত্নদাস কহিলেন, "হায়, আমি বড় মন্দভাগ্য।" যক্ষরাজ কহিলেন, "সে কি! আমি কি কথা রক্ষা করি নাই, তুমি যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা কি পাও নাই? জানিতে ইচ্ছা করি, পরশমণির শক্তিলাভে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছ।"

রত্নদাস কহিলেন, "হায়, সোণাই আমার কাল হইয়াছে, আমার যাহা আদরের ধন তাহাই হারাইয়াছি।"

যক্ষরাজ কহিলেন, "তাই তো, তবে তুমি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছ, এখন বল দেখি, এক গণ্ডূষ জল ভাল, কি পরশমণির শক্তি ভাল।"

রত্নদাস,—"হায়, এক বিন্দু জল পাইলে আমি সকল স্নুবর্ণ ত্যাগ করিতে পারি।"

যক্ষরাজ—"বৎস, তুমি যে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ, ইহাতে সুখী হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে তোমার হৃদয় এখনও রক্তমাংসে পূর্ণ রহিয়াছে, কঠিন জড়পিণ্ড-বৎ স্নুবর্ণে সম্পূর্ণ পরিণত হয় নাই। তাহা না হইলে তোমার অবস্থা অতি শোচনীয় হইত। তুমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, মানুষ যে সকল ধন রত্ন লাভের জন্য লালায়িত হয়, তদপেক্ষা সর্ব্বলোক-সুলভ জলমৃত্তিকাদি সামান্য দ্রব্যের মূল্য অধিক। এখন বল, তুমি কি সত্য সত্যই পরশ-মণির ঐন্দ্রজালিক শক্তি পরিহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।"

রত্নদাস বলিল "প্রভো! আমায় রক্ষা করুন, আর আমি মায়াজালের বশীভূত হইতে চাহি না, আমি এখন উহা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি।"

তখন যক্ষরাজ বলিলেন, "শুন রাজন্! তোমার উদ্যানের বহির্ভাগে যে স্বচ্ছসলিলা তটিনী বহিয়া যাইতেছে, অবিলম্বে তাহার জলে অবগাহন করিয়া, একটি পাত্র ঐ জলে পূর্ণ করিয়া আন। যে যে দ্রব্যে ঐ জল সিঞ্চন করিবে, তাহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যদি অকপটচিত্তে ও লোভশূন্য হইয়া এইরূপ করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

রাজা ইহা শুনিয়া গদ্‌গদ্‌চিত্তে যেমন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন, ঝটিতি একটি মৃৎকুম্ভ হস্তে লইয়া নদীর দিকে ধাবমান হইলেন।

কলসীটি ধরিবামাত্রই তাহা সোণার কলসী হইয়া গেল। পথিমধ্যে পদ-দলিত পত্রগুলি স্নুবর্ণ হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু রাজার আর সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি ব্যস্ত হইয়া সলিলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। পদযুগল হইতে পাদুকা উন্মোচন

করিতেও অপেক্ষা করিলেন না, তখনই সুশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। কলসটি জলপূর্ণ করিতে গিয়া দেখিলেন, উহা তখনই পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকায় পরিণত হইল। তদ্দর্শনে রাজা প্রীত হইয়া ভাবিলেন, "যক্ষরাজের কথা সফল হইল দেখিতেছি, আর ভাবনা নাই। এইবার চাঁপাকে বাঁচাইতে পারিব। তিনি নিজেরও পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন। বোধ হইল যেন বক্ষঃস্থল হইতে একটি কঠিন ও শীতল ভারি বোঝা নামিয়া গেল। তখন তিনি জলকুম্ভ হস্তে লইয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া চাঁপার সুবর্ণময়ী মূর্ত্তিতে জলসিঞ্চন করিবামাত্র তাহার চৈতন্য হইল। সে পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবা, এতক্ষণ কোথায় ছিলাম? একি! তুমি যে আমার কাপড় ভিজাইয়া দিলে।" বালিকা জানে না এত-ক্ষণ তাহার কি দশা হইয়াছিল। রাজা আর সে কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি চাঁপাকে সুখী করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া বাগানে লইয়া গেলেন। সেখানে সেই কলসের জল সেচন করিবামাত্র পুষ্পগুলি পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। তখন চাঁপার মুখে আর হাসি ধরে না, সে ফুল তুলিতে ব্যস্ত হইল।

এইরূপে রাজা রত্নদাস পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি সুখাদ্য রাজভোগ উদরস্থ করিয়া ক্ষুধার জ্বালা দূর করিলেন, এবং সুশীতল বারিপানে তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। সমস্ত দ্রব্য আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইল।

ক্রমে রাজা রত্নদাস স্বপ্নের ন্যায় এই গল্পের আশ্চর্য্য কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন। কেবল দুইটী চিহ্ন দেখিলে পরশমণির কথা তাঁহার মনে পড়িত। নদীসৈকতে বেড়াইতে গেলে বালুকা-রাশি স্বর্ণের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিত। আর চাঁপার কেশরাজি স্বর্ণাভ হইয়াছিল। পরশমণির প্রভাবে চাঁপার স্বর্ণমূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাহার কেশের এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল না।

কালক্রমে রাজা রত্নদাস বৃদ্ধ হইয়া চাঁপার ছেলে মেয়েদের কোলে লইয়া পরশমণির গল্প করিতে বড়ই ভাল-বাসিতেন। তাহাদের কোমল চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেন, "দেখ মায়ের মতন তোমাদেরও চুলের রং সোণালী হইয়াছে।—বাস্তবিক, তোমাদের এই সোণার চুল ছাড়া আর কোন সোণাই আমার ভাল লাগে না।"

শ্রীযুক্তা প্রমিলাবালা দেবী,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব।

দুগ্ধ—দুগ্ধ একটী প্রধান আহারীয় দ্রব্য। ইহার ৯ ভাগ জল ও এক ভাগ সার পদার্থ। দুগ্ধে সার পদার্থ যাহা আছে তাহা স্বভাবতঃ এরূপে মিশ্রিত যে, অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে কেবল দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করা যায়।

অপরিমিত আহার—অপরিমিত আহার রোগের একটী প্রধান কারণ। যত আহার করিতে পারা যায়, তত আহার করা উচিত নহে—কিছু কম করিয়া খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ। তাহা হইলে পরিপাক-ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। পরিপাক না হইলে অধিক আহারে শরীর পুষ্ট না হইয়া বরং ক্ষীণ হয়। যাহার যে পরিমাণে আহার সহ্য হয় তাহার বিবেচনাপূর্ব্বক তদ্রূপ আহার করা উচিত।

স্থূলকায় হইবার উপায়—স্থূলকায় হইবার বাসনা করিলে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, সর, রুটি, আলু, ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করা শ্রেয়ঃ।

স্থূলতা হ্রাসের উপায়—অনেকে এরূপ স্থূলকায় যে, স্থূলতা তাহাদের পক্ষে একটী রোগ বিশেষ। ইহারা উপরি-উক্ত আহারীয় দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া মাংস, ডিম্ব, পাকা ফল, শাক ও অল্প পরিমাণে দুগ্ধ আহার করিবে। উহা মস্তিষ্কের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি উপকারী।

প্রাতঃকালের বায়ু।—প্রাতঃকালের বায়ু অতি বিশুদ্ধ এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ বোধ হয় অনেকের বিদিত নাই। সর্ব্ববিধ প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে সমস্ত রাত্রি অধিক পরিমাণে কার্ব্বন বা যবক্ষারজান নামক দূষিত বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বৃক্ষলতাদি হইতে অক্সিজেন বা অম্লজান নামক বিশুদ্ধ বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বহির্গত হইতে থাকে। উদ্ভিদ সকল সমস্ত দিবসই অম্লজান ত্যাগ করে, কিন্তু প্রাতঃকালে যে পরিমাণে করে, দিবার অন্য কোন সময়ে সে পরিমাণে করে না। এই জন্য প্রাতঃকালের বায়ু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কুচবিহারের মহারাণী ও ময়ুরভঞ্জের মহারাণীর বিশেষ উদ্যোগে লণ্ডনপ্রবাসী ভারতবাসী ব্রাহ্মদের ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের অনুশীলনের সুবিধার নিমিত্ত উক্ত নগরে কেশব-নিকেতন নামে একটী ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক ৺মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা। এই মন্দির স্থাপন করিয়া মহারাণীদ্বয় পিতার উপযুক্ত কন্যার কার্য্যই করিয়াছেন।

২। শুনা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সম্রাটের জননী আলেকজেন্দ্রা স্বর্গগত স্বামীর জীবনচরিত লিখিতেছেন। পতিশোকাতুরা মহারাণী এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার শোকাবেগ কতক পরিমাণে প্রশমিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

৩। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ২৬শে জুন এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় ছয় সহস্র হইয়াছে।

৪। লণ্ডন নগরে একটী শিখ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পাতিয়ালার মহারাজা সওয়া লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৫। কুচবিহার কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়, বিলাতে যে সর্ব্বজাতীয় কংগ্রেসের (Universal Congress of Races) অধিবেশন হইবে তাহার ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ২৬শে জুলাই এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। তিনি উক্ত সভার উদ্বোধনসময়ে, জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

বামারচনা।

বর্ষ-বিদায়।

বসন্তের শেষে ডুবিল বরষ,
মোহিয়া সবার হৃদয় মন।
তাই ত কোকিলা ঘন ঘন বোলে,
করিছে ক্রন্দন বিদারিয়া বন।
লতিকা, পাদপ নবীন পল্লবে
ভূষিত হইল যাহার পরশে।
আশার প্রদীপ জ্বালিয়া সেদিন.
অন্তর্হিত বর্ষ দ্বাদশ মাসে।
সুখের রজনী চকিতে ফুরায়,
দামিনী ঝলসে মেঘের মাঝে।
মরমের স্মৃতি হয় না বিলোপ,
জীবনে জীবন বহে যে সাজে।
নূতন জনম লইয়া আবার,
প্রকৃতির ক্রোড়ে উদিল বরষ।
শৈশব জীবনে কতই উত্থান,
প্রখর বৈশাখে সতেজ সরস।
সুখী হেরে কত আশার আলোক,
দুঃখীর অন্তরে তমসার রাশ।
অতীতের স্মৃতি রাখে জাগাইয়া,
গলায় পরায় শোকেরি ফাঁস।

বর্ষে বর্ষে তার সোণার স্বপন,
প্রকৃতি ঘর্ষণে মুছিয়া যে যায়।
পরাণের কোণে ম্লান ছায়াটুকু
রহে শুকাইয়া নির্জীব প্রায়।
বর্ষে বর্ষে কত নব নব আশা,
আসে তার পাশে সিঞ্চিতে অমিয়।

তবু সে হতাশ, পীড়ায় ব্যথায়
চিররুগ্নমত পতিত।
বর্ষ আসে যায় ঘুরিয়া অবনী,
স্বরগের বার্ত্তা আনেনাত হায়।
যার তরে প্রাণ উধাও এমন,
তিলে তিলে সে যে পালাতে চায়।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী

বৈশাখী।

নাথ!
সুখের বৈশাখে পুজিতে তোমায়,
সবাই হরষে মেতেছে।
অর্পিতে তোমারে বৈশাখীর ডালা,
যতনে গুছায়ে এনেছে।
সিন্ধু, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী,
যমুনা, সরস্বতী, গঙ্গে ;—
তোমার পূজার কোষা পূর্ণ করি,
বহে সবে নবীন রঙ্গে।
কুসুমিত তরু রেখেছে সাজায়ে,
ফুলের সাজি সে ভরিয়া।
বেলা, যূথী, জাতী, চম্পক, মল্লিকা,
বীথি বীথি বীথি করিয়া।
সারি সারি সারি ফলিত পাদপ,
ভোগের থালি সে পুরিয়া,—
কত কত কত সুরসাল ফল,
দিয়াছে ঢালিয়া ঢালিয়া।

রবি, শশি, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ,
পঞ্চ দীপ্ত দীপ জ্বেলেছে।
করিতে হে দেব! আরতি তোমার,
নবীন ভাবেতে মজেছে।
কোকিল, দোয়েল বিহগ যতেক,
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি করিবে।
পবন তোমারে চামর ঢুলায়ে,
মৃদু মৃদু এবে বহিছে।
ঘুমে অচেতন ছিনু গো! সহসা,
বৈশাখের সাড়া পাইয়া,
চকিতে উঠিয়া আইনু ছুটিয়া,
বৈশাখী দিব গো বলিয়া।
হয়নি আমার কোন আয়োজন,
পূজিব তোমারে কি দিয়া?
শুধুই পরাণ দিলাম সখা হে!
বৈশাখে বৈশাখী বলিয়া।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার রাজবাটী।

একটী সাধ।

জীবনে মরণে, সাধনে ভজনে,
শুধু এক আশা জাগে ;
ব্যর্থ জীবন কুসুম যেন গো
তোমার সেবায় লাগে।
আমার প্রাণের অস্ফুট বাসনা
তোমাতে মিশা'য়ে নিয়ো

মাঝে মাঝে শুধু আঁখিটী তুলিয়া
মোর মুখপানে চেয়ো।
আর কিছু মোর আশা নাহি ওগো
বিপুল জীবনপটে,
শুধু টেনে নিয়ো চরণপদ্মে
রবি যবে বসে পাটে।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী।

তুমিতো আমার।

(১)

তুমি তো আমার, হরি! তুমিতো আমার!
তবে আর ভয় কেন,
কেন প্রাণ করে হেন?
কেন বা নিরখি বিশ্বে অকূল আঁধার?
তুমি নাথ পূর্ণ জ্যোতি,
তুমি মম প্রেম প্রীতি
তুমি যে গো একমাত্র মোর আপনার।

(২)

সংসার উপেক্ষা করে চাহে না আমায়।
সকলের অযত্নেয়,
তুচ্ছ আমি অতি হেয়,
আমারে গো ক্ষুদ্র বলি সবে দলে পায়।
কাঁদিলে পায় না ব্যথা,
হাসিলে কয় না কথা,
পড়ে আছি এক পাশে ধূলিকণা প্রায়।

(৩)

এ বিশাল বিশ্বমাঝে সবে মোর পর।
হৃদয় চিরিয়া দিলে,
তবু স্নেহ নাহি মিলে
সাধিয়া নিকটে গেলে বলে "সর" "সর"।
অঙ্গের বাতাস মোর,
যেন দাবানল ঘোর
কেহ তো নিকটে আসি করে না আদর।

(৪)

তুমি হরি! অভাগীর প্রাণে দাও বল।
সংসারের উপেক্ষায়,
কাতর না হই তায়,
অনাদরে চ'খে যেন আসে নাক জল!
তোমার অমৃত নাম,
হোক সুখ মোক্ষধাম
এ হৃদয়ে রাখ তব শ্রীপদকমল।

(২)

ভাবিয়া ভাবিয়া এই বুঝিয়াছি সার।
হয় হোক পর সবে,
তুমি তো আমারি রবে
প্রাণ ভরি কব, নাথ! তুমি তো আমার!
বাহিরে গরজে বিশ্ব,
হেরি সে ভীষণ দৃশ্য
আতঙ্কে শিহরি কভু উঠিব না আর।

(৩)

সংসার সৈকতে একা আছি দাঁড়াইয়া
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি,
তুমি কর কার্য্যসিদ্ধি,
ভাসিব অনন্ত স্রোতে তব নাম নিয়া
তুমি নাথ কূল দিও,
অভাগীরে কোলে নিও
কাতর কিঙ্করী প্রতি কৃপা বিতরিয়া,
শোক তাপ দুঃখ অশ্রু দিও মুছাইয়া।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকিঞ্চন।

দুখ-পারাবারে রাখ গো ডুবায়ে
না দিও হেরিতে সুখের মুখ,
ভীষণ অশনি আঘাতে প্রভু গো!
জ্বলিতে দাওহে সতত বুক।
সুখ সহচরী হয় যবে সাথী
তোমারে ভুলিয়া যাই,
ভাবিতে তোমারে বারেক তখন
নাহি যে সময় পাই।
দগধ-হৃদয় বিষাদ পাথারে
ভাসিলে দিবসে নিশিতে, হরি,
জড়ায়ে চরণ ধরিব তোমার
রহিবে তুমিও করুণা করি।

সুখেরে তলাসে তরল চিত
সুখ যে নিমেষে যায়,
অসার অনিত্যে কেন এত রত,
কেন প্রাণ তারে চায়?
জীবনে মরণে তুমি যে কেবল
ছাড়িয়া না রহ কখনো, স্বামী!
তোমা হেন ধনে ভুলিয়া হৃদয়
তবু যে নিয়ত কুপথগামী।
বাঁধ প্রভু! তব জ্ঞান-প্রেম-ডোরে
মলিন হৃদয় মোর।
এই বাঁধা কভু দিওনা টুটিয়া
করিয়া মোহেতে ভোর।

"শিশির" রচয়িত্রী, ছনহয়া।

কেন এসে চলে গেল?

কেন এসে চলে গেল? কি দারুণ তাপ!
সে ত চিনিতনা কভু,
তারেও চিনিনি কভু,
তার সাথে কারো হয়ে ছিল না আলাপ।
অপূর্ব্ব, অপরিচিত,
সহসা সে উপনীত,

উজ্জ্বল দেবের বেশে,
আপনি আসিয়া হেসে,
আঁধারি কুটীর মম,চলিল সে ফেলে মোরে,
রাখিয়া অজস্র ব্যথা, আর অশ্রুতাপ ॥
হেথা অতিথির বেশে, আপনি আসিল সে,
দিলাম আশ্রয় তারে, কত যে আদরে।
মাতৃবক্ষ পূর্ণ-স্নেহ, আনন্দ পূরিত দেহ,
সবারি সস্নেহ দৃষ্টি তাহারি উপরে ॥
তবু রহিল না হেথা, দিয়ে যে দারুণ ব্যথা,
কোথায় চলিয়া গেল দূর দেশান্তরে!
কেন সে চলিয়া গেল আর ফিরে নাহি এল,
স্তনে ক্ষীর আজো ঝরে তাহারই তরে।
ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র দেহ, এত কি নিষ্ঠুর কেহ,
এত দুঃখ দিতে পারে মায়ের পরাণে!
কি অভাব হ'ল তার, জানাল না একবার,
কি তার মরমব্যথা জানিব কেমনে?
কি জাগ্রতে কি স্বপনে, করি নাই অযতন,
মুহূর্ত্তের তরে,
তবে কি কারণে,
এ সব আপনার জনে,
পরিতাপ দিয়া প্রাণে,
চলি গেল অকস্মাৎ আপন ভবনে!
হায় শিশু!
কি নির্দ্দয় হয়ে আজ, করিলি শত্রুর কাজ,
মায়ের বুকেতে শেল তুইত বিঁধিলি;
মাতৃস্নেহ গুরুভার, একি প্রতিদান তার,
কেন এসেছিলি, এসে পুন চলে গেলি।
আজিও এখনো যে রে, আমি যে চাহিরে তোরে,
এ সুখ, আনন্দ, শান্তি কেমনে হরিলি?
আপনি হাসিয়া এসে, কেন এ নির্দ্দয়-বেশে,
ত্যজিলি এ গৃহ হায়, কার কাছে গেলি?
সন্ধ্যার আঁধার ছায়া, কোথায় চলিলি হায়,
আয় যাদু ফিরে আয়, কোথায় রহিলি?
উতরিণু ক্লেশসিন্ধু, প্রাণে এল আশাবিন্দু,
আশায় নিরাশ করি কি ফল লভিলি?
বুঝেছি, বুঝেছি আমি, এসেছিলে কেন তুমি,
কি বার্ত্তা জানিয়ে গেলে বিভুর আজ্ঞায়।
সংসার অনিত্য ধাম, অনিত্য মানবপ্রেম,
নিত্য এক বিভুপ্রেম দেখালে ধরায় ॥

শ্রীমতী রাজকুমারী রায়।

১৬।৪ মধু রায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টিনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।